প্রবাহ

শিক্ষাসত্র : বিশ্বভারতী
২০০৩

প্রবাহ

শিক্ষাসত্র : বিশ্বভারতী

২০০৩

দ্বিতীয় প্রকাশ

২২ শ্রাবণ ১৪১০

৮ আগস্ট ২০০৩

প্রচ্ছদ

শিক্ষাসত্রের বিজ্ঞান ক্লাসে প্রেমচাঁদ লাল (১৯২৮)

পরিকল্পনা

অম্বুজানন্দ রায়

সংকলন ও সম্পাদনা

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার বাজারী, তীর্থসলিল দে, অম্বুজানন্দ রায় (আহ্বায়ক)

প্রকাশক

কর্মসচিব, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মুদ্রক

শান্তিনিকেতন প্রেস, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

দাম : ষাট টাকা

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

MESSAGE

I am happy to learn that the Visva-Bharati is bringing out its science journal 'PRABAHA' containing articles by eminent personalities on various topics and issues of interest to young readers.

In our mission to transform India into a developed country, a crucial role will be played by the young generation of India. I am sure that your journal will ignite minds and satisfy their quest for knowledge.

I extend my warm greetings and felicitations to all those associated with the Visva Bharati and send my best wishes for the success of the publication.

(A.P.J. Abdul Kalam)

New Delhi
24 January, 2003

আচার্য
অটলবিহারী বাজপেয়ী

উপাচার্য
ড. সুজিতকুমার বসু

বিশ্বভারতী

প্রতিষ্ঠাতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দূরভাষ : (০৩৪৬৩) ২৬২-৭৫১,
২৬২-৭৫৬ (৬টি লাইন)
ফ্যাক্স : ৯১-০৩৪৬৩/২৬২৬৭২
ই. মেল : root@vbharat.ernet.in
ওয়েবসাইট : www.visva-bharati.ac.in

নং..................................

তারিখ ২১-০৪-২০০৩

প্রাক্‌কথন

আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পল্লীবাসীদের যোগস্থাপন ঘটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি শিক্ষিত সর্বসাধারণের মধ্যেও বিজ্ঞানের সংস্কৃতি ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

পল্লীবাসী স্কুলপড়ুয়া কিশোরদের তথা জনপ্রিয় এবং সর্বজনবোধ্য লোকশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার কাজে শিক্ষাসত্র নিজেকে নিযুক্ত করেছে। বিজ্ঞান চেতনার এই কাজ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত হোক। আমরা প্রবাহের সাফল্য কামনা করি।

উপাচার্য
সুজিতকুমার বসু

ভূমিকা

১৯০১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে পরীক্ষামূলকভাবে যে আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ১৯২৪ সালে সেই শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটা সংস্কারসাধন ক'রে শান্তিনিকেতনের পরীক্ষাটিকে আরো একটি অনুকূল ভূমিতে পুনঃরোপণ ক'রলেন। তিনি অনুভব ক'রেছিলেন, যে আদর্শ নিয়ে তাঁর আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তা যেন তাঁর শিক্ষাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে সার্থক ক'রতে অক্ষম আর তাই শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি বলেন, "...আমি এই অপর ইস্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা ক'রেছি।" পল্লী-উন্নয়নের অঙ্গরূপে তাঁর প্রবর্তিত এই শিক্ষাসত্রের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ছাত্রদের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের কথায় : "একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না— গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষ ফলিত বিজ্ঞান।" শ্রীনিকেতনের সার্থক রূপকার লেনার্ড নাইট এল্‌মহার্স্ট শিক্ষাসত্রের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "ছয় থেকে বারো বছরের শিশু হাত দিয়ে যা নাড়াচাড়া করে, নিজের হাতকে সে যেভাবে ব্যবহার করে, তা তার মনে সবচেয়ে বেশী দাগ কাটে। শিশুরা যাতে বুঝতে পারে তাদের নিজেদের দক্ষতার দ্বারা তারা ভবিষ্যতে জীবনধারণের একটা ক্ষমতা অর্জন ক'রে চ'লেছে। শিক্ষাসত্রের পাঠ শেষ ক'রে ছাত্ররা গ্রামে ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহ ক'রতে পারবে।" বর্তমান শতাব্দীতে পৌঁছেও আমরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সামনে রেখে শিক্ষাসত্রকে তার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্রতী।

ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ভিতরে বিজ্ঞান-ভাবনার জাগরণ ঘটাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া দরকার। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে যে, এ বিষয়ে শিক্ষাসত্রের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছেন। সাহিত্যসভার মত মাসে একটি ক'রে বিজ্ঞানসভা ক'রে তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান জানার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং উৎসাহকে বাড়িয়ে তুলেছেন। তাদের সেই নিত্যজাগরূক শিক্ষার্থী মনের ভাবনারই ফসল হ'ল আমাদের এই 'প্রবাহ' পত্রিকা। ১৯৮৩ সালে 'প্রবাহে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর নানান অসুবিধার কারণে দীর্ঘদিন তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। ২০০৩ সালে পুনরায় তা প্রকাশ ক'রতে পেরে আমরা যারপরনাই আনন্দিত। আমি আশা করি বিশ্বভারতীর সকল ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকসমাজকে অনুপ্রাণিত ক'রবে।

শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছাড়াও বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবনামূলক রচনা 'প্রবাহে'র এই সংকলনটিকে তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ ক'রেছে। আমরা ঐ সমস্ত গুণী ব্যক্তির কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শিক্ষাভবন এবং পল্লীশিক্ষাভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে নানান মূল্যবান উপদেশ ও তথ্য দিয়ে এবং প্রয়োজনে তাঁদের পরীক্ষাগার ব্যবহার ক'রতে

দিয়ে হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, এই প্রকাশনার কাজ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীবন্ধুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না। এঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে যথেষ্ট বলা হয় না। আমাদের প্রত্যেকটি প্রকাশনার কাজের মত এবারও শান্তিনিকেতন প্রেস, বিশ্বভারতীর সকল কর্মীর সর্বতোভাবে সহযোগিতার কথা দু'একটি বাক্যে জানিয়ে ঋণশোধ করা যাবে না।

এছাড়া যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'প্রবাহ' প্রকাশ করা সম্ভব হ'য়েছে তাঁরা হলেন : অধ্যাপক অম্বুজানন্দ রায়, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার বাজারী এবং তীর্থসলিল দে। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এরই সঙ্গে এই সংকলন 'প্রবাহ' যাতে নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে পারে সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছি এবং তাঁদের কাছ থেকে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা ক'রছি।

পরিশেষে, কবি-শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে তাঁর কথাতেই বলি : "আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র এই শ্রীনিকেতন... শিক্ষাসত্রকে সকল দিক পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে।"

শিক্ষাসত্র
১.৬.২০০৩

ড: স্মরজিৎ রায়
অধ্যক্ষ, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

নিবেদন

শিক্ষাচার্য রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত সেদিনের বিশ্বভারতীতে শিক্ষকদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল শিশুকালেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়ার। কবি উপলব্ধি ক'রেছিলেন বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত, মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। এজন্য চাই সুখপাঠ্য সর্বজনবোধ্য যথেষ্ট বিজ্ঞান গ্রন্থ। অথচ আমাদের দেশে তা আজও অপ্রতুল এবং রচয়িতারও অভাব। সেই অনটন দূর করতে সেদিনের শিক্ষাযজ্ঞের কর্মশালায় শিক্ষকদের দিয়ে প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং বই লিখিয়েছিলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে যাতে কঠিন বস্তুও মাতৃভাষায় সহজে অনুধাবন করা যায় এবং তা যেন শিক্ষার্থীর আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছয়।

সেই কর্তব্যবোধ থেকেই ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কবি-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসত্র থেকে জন্ম হয়েছিল 'প্রবাহে'র। দীর্ঘ দু'দশক ধ'রে প্রবাহের গতি ছিল রুদ্ধ, অর্থাভাবে। কেবলমাত্র প্রাণশক্তি নিয়ে শীতঘুমে থাকার মধ্যেও 'প্রবাহ' প্রকাশনার চাহিদা বাড়ছিল স্কুল পড়ুয়াদের তরফ থেকে। সেইসঙ্গে ছিল স্কুল পড়ুয়া কিশোর বিজ্ঞানীদের নিজস্ব গবেষণালব্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করার উপযুক্ত বিজ্ঞান পত্রিকার অভাব।

স্বয়ং উপাচার্য, অধ্যাপক সুজিতকুমার বসু মহাশয়ের সক্রিয় সহায়তায় সেই অবরুদ্ধ 'প্রবাহ' পুনরায় গতি পেল, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যিকতা উপলব্ধি ক'রে, শিক্ষাসত্র তার প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকেই প্রকৃতিপাঠ, বিজ্ঞানসভা, হাতেকলমে বিজ্ঞানচর্চার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে, কবির নির্দেশিত পথেই। বাধা হ'ল জনপ্রিয় লোকবিজ্ঞান পাঠ্যের সহজলভ্যতা। তাই এই বিশেষ জ্ঞান পরিবেশনের কাজে যথাসাধ্য পাণ্ডিত্য বর্জন ক'রে, মাতৃভাষার সাহায্য নিয়ে, বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার কাজে, প্রতিষ্ঠার নির্দেশিত পথেই আমাদের চলা।

বর্তমান গ্রন্থের দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি কতকগুলি জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে বিশ্বভারতী তথা বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচিত। তাঁরা যথাসময়ে তাঁদের লেখা পাঠিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রধানতঃ স্কুল পড়ুয়াদের লেখা নিয়ে সংকলিত। মূলতঃ তাদের নিজস্ব রচনাই এতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও দশম শ্রেণীর শ্বেতা মুখোপাধ্যায়, দীপান্বিতা ঘোষ এবং নবম শ্রেণীর রৌনক ঘোষ ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী মিলে বিজ্ঞানসভায় প্রদত্ত ভাষণগুলির অনুলিখন ক'রেছে টেপ রেকর্ডারের সাহায্য নিয়ে। সংশ্লিষ্ট বক্তাকে দিয়ে তা পরীক্ষা ক'রিয়ে, পাণ্ডুলিপি তৈরি ক'রতে তাবা অনেক পরিশ্রম ক'রেছে দৈনন্দিন লেখাপড়ার বাইরে। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ততাকে শুভেচ্ছা জানাই। বিজ্ঞানসভার বক্তাদের সহৃদয় সাড়া না পেলে সভায় আলোচিত বিষয়গুলি ভাবী শিক্ষার্থীরা পাঠ্যাকারে পেত না। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের ঋণ পরিশোধ্য নয়।

গ্রন্থের শেষাংশে মুদ্রিত হ'য়েছে গত পাঁচ বছরের কিছু নির্বাচিত নিবন্ধ, যেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব গবেষণালব্ধ প্রয়াস। তাদের নিবন্ধগুলিকে গুরুপাক ক'রে, পেশাগত বিজ্ঞানপত্রিকার মতো ক'রে তুলতে সংস্কার করা হয়নি এই ভেবে, যাতে পরবর্তী শিক্ষার্থীদের এবং আশপাশের পল্লীঅঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির কিশোরদের 'প্রবাহ' পত্রিকাটি ইন্ধন যোগায়।

ঘরে-বাইরে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রয়াস ছাড়া এ কাজ সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ বন্ধুবর প্রদীপ মুখোপাধ্যায় (অধীক্ষক, কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও সীমা শুল্ক বিভাগ) তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় ক'রে অতি যত্নের সঙ্গে উপাচার্য মহাশয়ের ইংরেজিতে লেখা মূল প্রবন্ধটিকে কিশোরদের উপযোগী বাঙলায় অনুবাদ ক'রে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক সৌরব্রত মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটির যাবতীয় বৈজ্ঞানিক চিত্র এবং অলংকরণে সাহায্য করায় প্রবাহের এই সংকলনটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে তা'র যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। বিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং কর্মীবন্ধু নানাভাবে এই প্রকাশনায় সামিল হ'য়েছেন। এদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রবাহের উদ্যোগে সংগৃহীত শ্রদ্ধেয় গুণীজনদের এবং স্কুল পড়ুয়া বন্ধুদের অনেক প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। পরবর্তী প্রকাশে সেগুলি মুদ্রণের ইচ্ছে রইল। সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন রবীন্দ্রনাথের ছবি ও পাণ্ডুলিপিগুলির প্রকাশের সুযোগ ক'রে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মেজাজের দূর্লভ মুহূর্তগুলির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা জানাবার সীমা কোথায়?

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থটি অবশেষে আত্মপ্রকাশ ক'রল তারা হ'লেন শান্তিনিকেতন প্রেস, বিশ্বভারতীর সহকর্মিবৃন্দ। সর্বক্ষণের সক্রিয় সহযোগিতা ও তৎপরতা না থাকলে স্বল্প সময়ে এই প্রকাশ সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেই যথেষ্ট হয় না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির প্রকাশে যে সমস্ত নানান ত্রুটি রয়ে গেল, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। সেগুলির সংস্কারে হাত দেওয়া গেল না সময়াভাবে। আগামী সংখ্যায় তা শুধ্‌রে নেব।

অম্বুজানন্দ রায়
আহ্বায়ক, প্রকাশনা উপসমিতি
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

শ্রীনিকেতন
২৫ জুন, ২০০৩

রবীন্দ্রনাথ ও আমি যখন সর্ব্বপ্রথম সৌহার্দ্দ্যের সুনিবিড় বন্ধনে পরস্পর আকৃষ্ট হই তাহার পর প্রায় সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল কাটিয়া গেল। জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে-তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য্য দান করিয়াছেন। সহস্র-সহস্র বৎসের মৌনতা ভাঙিয়া বাণীহীন তরুলতা অবশেষে একদিন যেন কথা কহিয়া উঠিল, আপন অন্তরজীবন সুখ-দুঃখ পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী সে আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিল। এই স্বরচিত ইতিহাসের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত নিখিল জীবলোকে একই প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে, একই প্রাণধারা সর্ব্বত্রই বহমান। যে-বাধা একদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবনধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরমরহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়তর হইয়াই উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অবিনির্ণীত-দিক্ মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়-যাত্রায় আপনার চিত্ত-তরণী ভাসাইয়া দিল একি কম কথা? যে অবর্ণনীয় রহস্য তাহার দৃষ্টির অগোচর ছিল, এই অভিযান পথে অকস্মাৎ এক-একদিন সে-রহস্য মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে এবং যে-আত্মসর্ব্বস্বতা এতকাল তাহাকে বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমূখচিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাহার মন হইতে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।

বিশ্বজগতের এই ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির নিকটে ধরা দিয়াছে এবং তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় এই ঐক্যধারাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রতিদিন তাঁহার দৃষ্টি উদার হইতে উদারতর হোক্ এবং তাঁহার বাণী নিখিলের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হোক্, এই কামনা করি।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

সূচিপত্র

প্রবাহ

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাসত্র : বিশ্বভারতী
২০০৩

১

প্রসঙ্গ : বৈজ্ঞানিক মেজাজে রবীন্দ্রনাথ

আইনস্টাইন পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ (কাপুথ-এর বাড়িতে ১৪ই জুলাই ১৯৩০) পিছনের সারিতে অমিয় চক্রবর্তী

"...আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয় দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে, জল ফুটতে থাকার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারি বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে। যে-ঘটনাকে স্বতই সহজ ব'লে বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা সহজ নয় এই কথাটা সেই বোধ হয় প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রং-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা ব'লে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম ব'লেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরো বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্রতার উপর দিয়েই মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে না। জলস্থল বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়োবয়সের পাঠ্য-সাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিইনি, হিসাবের বাইরেও তারা একরকম ক'রে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিল মার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এই রকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যর রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস, ফ্লামরিঁ প্রভৃতির অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি— গলাধঃকরণ করেছি শাঁস সুদ্ধ বীজ সুদ্ধ। তারপরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলেকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।

আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃততত্ত্বে— বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝিনি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।— মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথা লাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম ক'রে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয়নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে— এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে এ'কে হাল্‌কা করা কর্তব্য বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মতো এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনিই ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই ব'লে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা ক'রে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে দুধ যখন ভালবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্য দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হোতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলিনি।...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন, ১৩৪৪

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উদ্দেশে লিখিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকার অংশবিশেষ

জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ

অবশেষে 'বিশ্বপরিচয়' নিজেই লেখেন। তাঁর নিজের হাতের লেখা 'পরমাণুলোক' একটি পৃষ্ঠা

২

প্রসঙ্গ : বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ
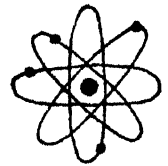
ভারতে বৈদ্যুতিন প্রশাসন : একনজরে

অধ্যাপক সুজিতকুমার বসু
উপাচার্য, বিশ্বভারতী।

যে-কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, সক্রিয় প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি আজকের বিশ্বে এক শক্তিশালী অনুঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সত্যি কথা ব'লতে কি কম্প্যুটার সভ্যতার মঞ্চে নবাগত হওয়া সত্ত্বেও তথ্য-প্রযুক্তি তথা কম্প্যুটারের সাহায্য ছাড়াই এতদিন আমরা কি ভাবে জীবনযাপন ক'রছিলাম তা ভাবতেও অবাক লাগে।

ভেবে দেখো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর ফল দ্রুত প্রকাশ করা, ব্যাঙ্কে বছরের পর বছর ধ'রে অসংখ্য আমানতকারীর জমা-খরচের হিসাব রাখার মত বিপুলায়তন কাজগুলোর কথা। কম্প্যুটার-কৃত মার্কশীট এখন পরীক্ষার পর প্রয়োজনে হাতে-হাতেই পাওয়া যেতে পারে। ইদানীং লক্ষ্য ক'রেছ নিশ্চয় হোটেল বা হাসপাতাল ছাড়ার সময় চোখের পলক ফেলার আগেই বিল তৈরী। লাইব্রেরীতে বই দেওয়া-নেওয়াও আজ আর ঘামে-ভেজা বিরক্তিকর অপেক্ষার অভিজ্ঞতা নয়। আরও অনেক-অনেক উদাহরণের মধ্যে এগুলো মাত্র কয়েকটি। এর কোনওটাই কি সম্ভব হ'ত তথ্য-প্রযুক্তি ছাড়া?

আধুনিক জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির অনুপ্রবেশের ফলে উপকৃত হয়েছেন কিন্তু আসলে উপভোক্তারাই (ক্রেতা)। যেমন ধরো 'শাখা নিরপেক্ষ' ব্যাঙ্কিং সুবিধার ফলে আমানতকারীকে কোনও-একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের শাখায় আটকে থাকতে হ'চ্ছে না। অথবা ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল ব্যবহার ক'রে 'সাইবার শপিং' বা 'বৈদ্যুতিন-কেনাকাটা' করা যাচ্ছে বিশ্বের যে-কোনও বাজারে। এইসব ঘটনা যা কিনা এই সেদিনও ছিল কল্পনার স্তরে, তা নেমে এসেছে সাধারণের নাগালের মধ্যে। এসব কিছুই তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফসল। সেই বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার ঘূর্ণাবর্ত-শক্তি এক ধাক্কায় বিশ্বকে ঠেলে দিয়েছে আধুনিক জগতে।

এই তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবেরই এক গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ববৈশিষ্ট্য 'বৈদ্যুতিন প্রশাসনব্যবস্থা' বা ই-গভর্নেন্স। বে-সরকারী ও সরকারী ক্ষেত্রের কাজকর্মের তথ্য-সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহারই হ'ল বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থার মূল কথা।

একটা ব্যাপারে আমরা সবাই নিশ্চয়ই একমত যে, প্রশাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হ'ল নাগরিক জীবনের মানোন্নয়ন। সেই প্রশাসন-ব্যবস্থার ধারক অবশ্যই গণতন্ত্র। বৈদ্যুতিন-প্রশাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও প্রয়োগে অবশ্যই প্রয়োজন বর্তমান পরিবেশ ও বৃহত্তর মূল্যবোধের প্রতিফলন। আমি এখানে পরিবেশ ব'লতে বোঝাতে চাইছি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রাবন্ধিক, আইনি, শিক্ষাগত পরিবেশ এবং একজন নাগরিকের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সবরকম পরিবেশ।

সন্দেহ নেই মানুষের জীবনযাত্রা আরও সরল, সহজ ও সুখপ্রদ ক'রতে তথ্য-প্রযুক্তি আধারিত বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থা অত্যন্ত উপযোগী হবে। ভেবে দেখো তো কেমন হবে ব্যাপারটা যদি

আমরা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে থানায় এফ.আই.আর. ক'রতে পারি, রেশন কার্ড পেতে পারি বা জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্ত ক'রতে পারি, স্কুল-কলেজে নিবন্ধীকরণ ক'রতে পারি; এমনকি এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতেও পারি।

প্রসঙ্গত বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থায় যে-সমস্ত পরিষেবা উন্নততর হ'তে পারে সেগুলো হ'ল: (ক) সরকারী কাজে দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, (খ) প্রয়োজনীয় তথ্য মানুষের কাছে আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়া, (গ) প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য দ্রুত তথ্য-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (ঘ) অত্যাবশ্যক পরিষেবা যথা, পরিবহন, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল, নিরাপত্তা, নাগরিক পরিষেবা ইত্যাদি।

উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে সাধারণ মানুষকে 'টেলিমেডিসিন' বা দূর-চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠনের কাজ চ'লছে দ্রুতগতিতে। এর ফলে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংখ্যায়িত (ডিজিট্যাল) ছবি এস.টি.ডি. লাইন মারফত পাঠান যাবে কলকাতায়। কলকাতার স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে বিশেষজ্ঞরা বসে দূর-দূরান্তের রোগীদের ই.সি.জি দেখবেন। রোগীকে এজন্য আর সশরীরে কলকাতায় হাজির হবার প্রয়োজন হবে না। কিছুদিন আগেই আমরা কাগজে প'ড়েছি যে মহাকরণ ও সমস্ত জেলা সদর দপ্তরের মধ্যে দূরেক্ষণ-মন্ত্রণাসভা বা ভিডিও-কনফারেন্স করার ব্যবস্থা চালু হ'য়েছে। কয়েক বছর আগেও এ ছিল স্বপ্নের অতীত।

সত্যি কথা ব'লতে কি আমার ছোটবেলায় পড়া এক কল্পকাহিনীর কথা মনে পড়ে— সম্ভবতঃ স্যার আর্থার সি. ক্লার্কের লেখা। সেই গল্পের শহরে কাউকে ফুটপাথে হাঁটতে হ'ত না— ফুটপাথটাই কনভেয়ার বেল্টের মত একটা কিছুর উপর দিয়ে চ'লত।

চলাচলের প্রয়োজন কমে যাওয়ার এই কল্পনা আজ দূরেক্ষণ-সভার প্রচলনে বাস্তবায়িত হ'য়েছে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আজ আর সশরীরে তাঁদের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই - বরং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিজের-নিজের বৈঠকখানায় আরামে বসে তাঁরা একে অপরকে দেখতে ও অপরের কথা শুনতে পারেন এবং সভার কাজ চালাতে পারেন। অনতিদূর ভবিষ্যতে আমরা সেই প্রযুক্তি পেতে চ'লেছি যার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে থেকেও তোমরা তোমাদের বাড়ির বাগানের সব চাইতে সুন্দর গন্ধের ফুলটার গন্ধ উপভোগ ক'রতে পারবে। এই প্রযুক্তির আরও উন্নত রূপ সম্ভবতঃ এমন হবে যে বাড়ির তৈরী সুখাদ্যের স্বাদ হাজার-হাজার মাইল দূরে থেকেও পাবে।

প্রযুক্তির কী দাপট!

প্রযুক্তির এই ধরনের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি প্রাক্-তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বের সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিতে বসেছে। এই পরিবর্তন শুধু অর্থনীতি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়। সাইবার-অপরাধের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সীমারেখার কোনও গুরুত্ব আজ আর আছে কি? মনে পড়ে গতবছর এই গ্রহের লক্ষ লক্ষ যন্ত্রগণককে 'আই লাভ ইউ' ভাইরাস কিভাবে অকেজো ক'রে দিয়েছিল। ম্যানিলার এক তরুণের মস্তিষ্ক এর উৎপত্তিস্থল। কিন্তু এই ব্যাপক ক্ষতি কিন্তু ম্যানিলায় সীমাবদ্ধ ছিল না— এই ভাইরাস পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে প্রভাব

ফেলেছিল। দু-এক বছর আগে এই খোদ কলকাতাতেই ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠান (আই.এস.আই.)-এর তথ্য-ভাণ্ডারে অনধিকার অনুপ্রবেশ করে কে বা কারা বেশ কিছু তথ্য নষ্ট ক'রতে সমর্থ হয়। বলা হয় এই অপকর্মের পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই .এস.আই-এর হাত ছিল।

সে যাই হোক, মোদ্দা কথাটা হ'ল বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থার রূপরেখায় যে বিশাল সম্ভাবনার সাম্ভাব্য ছবি দেখতে পাই, তাতে দেখি আজকের পৃথিবী যেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পরিণত হ'চ্ছে একটি ছোট্ট গ্রামে। আমরা আদর ক'রে যার নাম দিয়েছি— 'বিশ্ব গ্রাম' বা 'গ্লোবাল ভিলেজ'। অন্যভাবে ব'লতে গেলে অর্থনীতি ও আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীভূত যাবতীয় বিষয়গুলির বিশ্বায়ন এখন আর কারও নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়। অমোঘ নিয়তির মত তা অপ্রতিরোধ্য।

অন্যান্য দেশগুলির মত ভারতেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে সংযোগ-সাধনের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হ'চ্ছে। এখন থেকে পরবর্তী পাঁচ বৎসর সময়কালে অর্থাৎ দশম পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে দু হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ভাবা হ'য়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-সংক্রান্ত সরকারী ভাষ্য এইরকম:

"পদ্ধতির সরলীকরণ, গতিময়তা, সুবিধাপ্রদানের জন্য ভারত সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তর এবং বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র (সেণ্টার ফর ই-গভর্নেন্স) গঠন ক'রেছে নয়া দিল্লীতে। এই কেন্দ্র বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাধান ও পরিষেবা দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন বৃহৎ সংস্থা যেমন সি-ড্যাক, সি.এম.সি., আই-কিউ ভারচুয়্যাল্স, মাইক্রোসফ্ট, এন.আই .সি. ওরাক্ল্ ইত্যাদির বিভিন্ন প্রয়োগ দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নিয়ে আসছে...কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে আছেন তাঁদের অবগতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হ'চ্ছে। রীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা ও প্রায়োগিক পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।"

তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হ'লে আমাদের চাই ক্ষিপ্রতর পরিষেবা এবং সরকারী কাজে স্বচ্ছতা। শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চালিকা-শক্তি বা প্রয়োজনীয়তা লুকিয়ে আছে উপরোক্ত অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলির সঙ্গে। প্রত্যাশার এই চাপ বেড়েই চ'লবে। দেশের নাগরিকের সঙ্গে আনুভূমিক স্তরে না মিশে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে, অবিশ্বাস-এর ভিত্তিভূমিতে তৈরী আইন ও পদ্ধতির 'লাল-ফিতের ফাঁসের' সাহায্যে শাসনের দিন শেষ হ'য়েছে। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে সরকারী অনুশাসকের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও লাভ নজরে আসে না।

বিশ্ব বাজারের বিবর্তনের ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের পরিবেশে বর্তমান সময়ের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনগুলি হ'ল :

(ক) দক্ষতর ও দ্রুততর পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা,

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তির অতি দ্রুত উন্নতি,

(গ) সামাজিক, বাণিজ্যিক ও সরকারী শাসনব্যবস্থার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চতর স্বচ্ছতা ও যুক্তিগ্রাহ্যতা;

এইগুলিই সামগ্রিকভাবে সামাজিক, ব্যবসা ও সরকারি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন আনতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে বৈদ্যুতিন প্রশাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা, শুধুমাত্র অফিসে বসে একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন যন্ত্রগণক নিয়ে নাড়াচাড়া করার চাইতে অনেকটাই বেশী। নূতন এই শাসনব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সরকারী ক্রিয়াকর্মের ধারার মৌলিক পরিবর্তন; প্রশাসক, আইন-প্রণেতা এবং সাধারণ নাগরিকের জন্য নূতন ক'রে রচিত 'দায়িত্ব পঞ্জিকা'। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে সামাজিক শোধন। এই শোধন হ'তে হবে বোধগম্যতা, সামঞ্জস্যতা ও পরিকল্পনার ঐকতানে। শুরুটা সম্ভবতঃ ক'রতে হবে সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তর বিলোপের গতিশীলতার মধ্য দিয়ে।

বৈদ্যুতিন প্রশাসন প্রবর্তনের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক কিছু। শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার বা সফ্‌ট্‌ওয়্যারের উন্নতির সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিষয়গুলিই নয়। প্রয়োজন রাজনৈতিক, আইনগত, মানব-সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়গুলির সুষ্ঠু পরিচালন। বৈদ্যুতীন মাধ্যমের সাহায্যে সরকারী পরিষেবা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সরকারী পরিষেবাগুলির কার্যপ্রণালী, পদ্ধতি ও প্রকরণের পরিবর্তন। সরকারী কর্মচারীর মুখোমুখি হবার প্রয়োজন আর থাকবে না। অবশ্য কোন্ পরিষেবার জন্য সরকারের কোন্ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে হবে সে বিষয়ে উপভোক্তার সঠিক ধারণা থাকতে হবে।

এতে অবশ্য অন্য আরও কিছু সমস্যা দেখা দেবে। প্রথমেই মোকাবিলা ক'রতে হবে যে সাধারণ সমস্যাটির তা হ'ল আমাদের মত দেশে, যেখানে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত কম, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটান সেখানে এই ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার। এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে দেশবাসীর সাক্ষরতার বিষয়টি লঘু ক'রে দেখার কোনও অবকাশ নেই। অতএব, কৃষি বা টেলিমেডিসিন- দ্বারা রোগ-নির্ণয়োত্তর চিকিৎসার জন্য বেশীর ভাগ মানুষকে অন্যের সহায়তার উপরই নির্ভর ক'রে থাকতে হবে।

সম্ভবতঃ সেই কারণেই বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত পরিষেবাগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা 'হিতে বিপরীত' ঘটাতে পারে। কায়েমী স্বার্থগুলিকে প্রতিরোধ করা শক্ত হ'তে পারে। আগামীকালের দক্ষতার মাপকাঠি আজ থেকে ভিন্নতর হ'তে বাধ্য। সেইজন্য বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থায় পরিষেবা প্রদানের জন্য দক্ষ কর্মী সৃষ্টি ক'রে চ'লতে হবে নিরলসভাবে।

এই কাজটা যথেষ্ট কঠিন। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের দেশ থেকে তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত মস্তিষ্ক-রপ্তানী-র বিষয়টি। স্কুল-কলেজে নিয়মিত বিষয়ক্রমে তথ্য-প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে সব স্তরে কম্প্যুটার শিক্ষার ব্যবস্থা করার সঙ্গে-সঙ্গে মস্তিষ্ক-রপ্তানীর বিষয়টিও মোকাবিলা ক'রতে হবে। এর জন্য অবশ্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

তথ্য-প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির সঠিক ফল লাভ করার জন্যও পরিকাঠামো তৈরীতে অর্থ লগ্নীর প্রয়োজন। পরিস্থিতিটি বেশ জটিল। কারণ এই ধরনের কর্মকাণ্ডে পুরোনো অনেক কিছুই

সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে ফেলতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভুললে চ'লবে না ইতিমধ্যেই আমরা 'লো-ব্যাণ্ড উইড্‌থ্'-এর সমস্যায় ভুগতে শুরু ক'রেছি, যার ফলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হ'চ্ছে ট্রাফিক জ্যাম, এবং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অদক্ষ বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থা আমাদের প্রশাসনিক পদ্ধতির উপর একটা বোঝা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

এইসব সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অর্থের আর সেটাই আবার আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। অবশ্য উন্নত দেশগুলি, যাদের কাছে বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রায় পুরোনো হ'তে চ'লল, তাদের কাছ থেকে আমাদের শেখার সুযোগ থাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপব্যয় এড়ানো সম্ভব। এ ব্যাপারে আমাদের গর্বের শিক্ষায়তনগুলি— আই.আই.এম., আই.আই.এস.সি. বা আই.আই.টি. খুব সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। পরিষেবা প্রদানের সঠিক প্রকরণ ও পদ্ধতি-নির্ধারণে আমাদের বাণিজ্যিক বিদ্যালয়গুলিও এগিয়ে আসতে পারে।

তথ্যের এত সহজলভ্যতা আবার সাধারণ মানুষের পক্ষে হতবুদ্ধি হ'য়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই কারণে উদ্ভুত সংশয় মানুষকে উত্তরোত্তর পীড়ন ক'রবে। মানুষকে তার জীবনযাত্রা পরিবর্তন ক'রতে হবে, পরিবর্তন ক'রতে হবে মানসিকতারও। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আইন, শাসনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। প্রায় বছর দুই আগে ভারতে তথ্য-প্রযুক্তি আইন, ২০০০ (আই.টি অ্যাক্ট, ২০০০) প্রণীত হয়। আমি আইন বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আমার আইনজ্ঞ বন্ধুদের কাছে শুনেছি এই নিয়ে আরও অনেক কিছুই এখনও করা বাকী আছে। উদাহরণস্বরূপ এই আইনের বলে পুলিশ বিনা ওয়ারেণ্টে বা পরওয়ানা ছাড়াই তল্লাশী ক'রতে পারবে ও সাইবার অপরাধে জড়িত সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারবে। আইনের অপব্যবহারের এই ধরনের আশঙ্কা বা সমালোচনায় ব্যক্তিগতভাবে আমি নিরুৎসাহিত বোধ ক'রছি না। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, আইন প্রযুক্তিকে অনুসরণ ক'রে নিজেকে পরিবর্তিত ক'রে নেয়। এবং এটা সত্যি যে, এই আইনকে একটু তাড়াতাড়ি প্রযুক্তির পিছনে ছুটতে হবে এবং এটি একটি চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে ই সীমানার বাইরে থেকে যেসমস্ত সাইবার অপরাধ আমাদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানতে চাইবে, তারও মোকাবিলার ব্যবস্থাও এই আইনে রাখতে হবে।

বৈদ্যুতিন প্রশাসন-ব্যবস্থা নিয়ে এতসব সমস্যা-সত্ত্বেও আমি নিশ্চিত যে যুগের এই দাবীর মুখোমুখি আমাদের হ'তেই হবে, এ নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। আমাদের যেমন সমান্তরালভাবে হার্ডওয়্যার ও সফ্‌ট্‌ওয়্যার প্রস্তুত ক'রে যেতে হবে মানব-সম্পদ উন্নয়নের জন্য, তেমনি অপরদিকে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার জন্যে। আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, বৈদ্যুতিন শাসন-ব্যবস্থা ক্ষণিকের অতিথি নয়, এর আছে মৌরসী পাট্টা আর আছে আমাদের সকলের জীবন আরও সুন্দর ক'রে তোলার প্রতিশ্রুতি। এখন আমাদের কাজ প্রযুক্তির এই আশীর্বাদের সুযোগ নিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দরতর ক'রে তোলা।

বিজ্ঞান ও সংগীত : ঐকতানিক সম্পর্ক

পার্থ ঘোষ

প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সংগীত ও আওয়াজের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে তা মানুষমাত্রই বুঝতে পারে। সংগীত আমাদের আনন্দ দান করে, আওয়াজ আমাদের কাছে বিরক্তিকর। এমনটি কেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া শক্ত। হয় তো মনস্তত্ত্ব একদিন এই উত্তর খুঁজে পাবে। কিন্তু আওয়াজ ও সংগীতের মধ্যে বস্তুভিত্তিক একটা পার্থক্য পদার্থবিদরা দেখতে পেয়েছেন। সেটা একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি।

যে কোনও শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় যে সেটি সাধারণত একাধিক মৌলিক শব্দের সংমিশ্রণ। প্রতিটি মৌলিক শব্দের উৎপত্তি হয় হাওয়ার নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক থেকে। হাওয়ার এই কম্পন নানাভাবে ঘটতে পারে, যেমন আমাদের গলা থেকে, বাদ্যযন্ত্র থেকে বা অন্য কোনও ভাবে। এই কম্পাঙ্ক যত বেশি, শব্দের তীক্ষ্ণতা (pitch) তত বেশি। এখন, নানান কম্পাঙ্কের শব্দকে যদি এলোমেলোভাবে মেশানো হয়, তাহ'লে সেটা আওয়াজের মতো শোনায়। কিন্তু এই মূল শব্দ বা কম্পাঙ্কগুলি যদি বিশেষভাবে বেছে নেওয়া যায়, তাহ'লে শব্দ শ্রুতিমধুর হ'তে পারে. যেমন সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা। এই মৌলিক শব্দগুলির কম্পাঙ্কগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গাণিতিক সম্পর্ক আছে, যার জন্যে এই শব্দগুলি পরপর শুনলে আমরা আনন্দ উপভোগ করি। এই শব্দগুলি যখন একটি বাদ্যযন্ত্র বা মার্জিত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়, তখন কিন্তু মৌলিক কম্পাঙ্কের সঙ্গে আরও কিছু কম্পাঙ্ক মিশে থাকে, যাদের harmonics বলা হয়। এদের কম্পাঙ্ক মৌলিক কম্পাঙ্কের গুণিতক, অর্থাৎ দুই, তিন, চার, পাঁচ... গুণ। এই harmonicsগুলি থাকার জন্যেই একটি শব্দ শ্রুতিমধুর হয়। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, আওয়াজ হ'ল বিশৃঙ্খল শব্দ, সংগীত সুশৃঙ্খল শব্দ। এই সুশৃঙ্খলতার একটি গাণিতিক ও নান্দনিক ভিত্তি আছে।

প্রাচীন গ্রীকরা, বিশেষ ক'রে পিথাগোরাস, সংগীতের এই গাণিতিক ভিত্তি উপলব্ধি ক'রে সমস্ত বিশ্বের একটি সাংগীতিক গঠনের কথা চিন্তা ক'রেছিলেন। তাঁরা মনে ক'রেছিলেন যে গ্রহগুলি যেসব কক্ষে ঘোরে সেগুলির দূরত্বের মধ্যেও harmonic বা ঐকতানিক একটা সম্পর্ক আছে। তাই তাঁরা music of the spheres-এর কথা ব'লেছিলেন। পরে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এই কল্পনাকে অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হ'লেও আজও বিজ্ঞানীরা বিশ্বপ্রকৃতির মূলে গাণিতিক নন্দনের সন্ধান ক'রে চ'লেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন যে. আধুনিক বিজ্ঞানের 'নব্য মায়াবাদ' তাঁকে আকৃষ্ট ক'রেছিল। এই 'নব্য মায়াবাদ' কী? মানুষ আজন্ম দেখে এসেছে যে গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে। আকাশে উড়ে যায় না। কিন্তু এই আটপৌরে ঘটনার অন্তরালে যে বিশ্বব্যাপী একটি নিয়ম কাজ ক'রে চ'লেছে, যা চাঁদকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাচ্ছে. পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের

সূর্য প্রদক্ষিণ করাচ্ছে, তা কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। আমরা আপাতদৃষ্টিতে তা দেখতে পাই না। সেই বিশ্বব্যাপী অগোচর সহজ নিয়মটি প্রথম ধরা প'ড়েছিল নিউটনের অন্তর্দৃষ্টির কাছে। সেই নিয়মকে তিনি একটি গাণিতিক সূত্রের মধ্যে ধ'রে ফেলেছিলেন। এই ধরনের সর্বজনীন নিয়ম ও তাদের তাৎপর্য কিন্তু মানুষের সাধারণ ভাষা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বোঝানো যায় না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনাবলির অন্তরালে যে সর্বজনীন সত্য কাজ ক'রছে তা বিমূর্ত, তাকে সাধারণ ভাষায় ধরা যায় না। এই হ'ল 'নব্য মায়াবাদ'। বিজ্ঞানী তাকে গণিতের ভাষায় ধরবার চেষ্টা ক'রছেন, কবি কাব্যের ছন্দে। এই কাব্যও সীমিত, কারণ সে সাধারণ ভাষার ওপর নির্ভরশীল। সংগীত তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ ব'লতেন যে, কথা যেখানে তাঁকে নিয়ে যেতে পারে না, সুর তাঁকে সেখানে পৌঁছে দেয়।

'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান।।

এই কথাগুলি যখন সুরে গাওয়া হয়, তখন আমরা তাদের নিহিত অর্থ গভীরভাবে অনুভব ক'রতে পারি।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালের সেই অগোচর সত্য তাই সুদূর, বিপুল সুদূর। সে আমাদের ব্যাকুল বাঁশরি বাজিয়ে টানে। কিন্তু "মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি।" এই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এক অরূপ সুন্দরীর সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন, যার বাসা এই জগৎসিন্ধুর পরপারে। তাই তিনি বিদেশিনী। তাকে কখনও শারদপ্রাতে, কখনও মাধবী রাতে দেখা যায়, কখনও বা হৃদি মাঝারে অনুভব করা যায়। সেই সুন্দরীর সাধনা করেন কবি, শিল্পী, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী সকলে। তফাৎ তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র পদ্ধতিতে, মূল লক্ষ্যে নয়।

সত্যের সঙ্গে নান্দনিক অনুভূতির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আবার সত্যের মধ্যে একটি সহজ স্বাভাবিকতাও আছে। কোনও তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা সহজ ও স্বাভাবিক না হ'লে তাকে আমাদের মন মানতে চায় না। এই সহজ স্বাভাবিকতা ও আমাদের নান্দনিক অনুভূতির মধ্যেও তাই নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই সহজ স্বাভাবিক নান্দনিক অনুভূতি কিন্তু সহজসাধ্য নয়। একে অনুভব ক'রতে গেলে শিক্ষার ও সাধনার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান ও সংগীত সেই সাধনারই দুই পরিপূরক পন্থা।

এক বিকল্পের সন্ধানে

অধ্যাপক সমর বাগচী
প্রাক্তন অধিকর্তা, বিড়লা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড
টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, কোলকাতা।

ভূমিকা : 'দেশ' পত্রিকার 1997 সালের 8ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় "বিপন্ন মানব-অস্তিত্ব" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে দেখিয়েছিলাম যে, শিল্প-বিপ্লবের পর গত দেড়শো বছরে যে শিল্পসমাজ গড়ে উঠল পৃথিবীতে তাতে কিভাবে সমাজ ও প্রকৃতি ভেঙ্গে প'ড়ছে এবং মানব-অস্তিত্ব বিপন্ন হ'চ্ছে। আজ যখন পৃথিবী এবং আমাদের এই ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফেরাই তখন সেক্সপীয়ারের পংক্তি মনে আসে "Time is out of joint"—সময়ের গ্রন্থি খুলে গেছে। সদ্যপ্রয়াত কবি চিত্ত ঘোষের ভাষায় "আমাদের চতুর্দিকে সমুজ্জ্বল অষ্টধাতু বিগ্রহের ভাঙ্গা হাত পা, পতনের দিকে গতি সঞ্চারিত হয় লাফে লাফে"। বড়-বড় অট্টালিকা ধ্বসে প'ড়ছে, দেশের পর দেশ বোমায় বিদ্ধস্ত হ'চ্ছে, ভারতে ধর্মীয় উন্মাদনায় মৌলবাদের বর্বরতা শত শত মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, জাত-পাতের লড়াই, আঞ্চলিকতাবাদ বাড়ছে। অন্যদিকে উন্নত রাষ্ট্রগুলির বিশ্ব অর্থনীতির খেলা সারা পৃথিবীকে "গ্লোবাল ভিলেজ" করার নামে সমস্ত বিশ্বের অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে নিজের কবজায় এনে দেশের পর দেশকে এবং নিজেদের দেশকেও সর্বনাশের চরম সীমায় নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবন্ধে বিশ্ব অর্থনীতি ও সমাজের আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে এই অবস্থার কোনও বিকল্প আছে কিনা তার আলোচনা করা হবে।

কিসের বিকল্প : উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার এবং শিল্প-বিপ্লব (1760—1830) সম্পন্ন হওয়ার আগে আজ যাদের তৃতীয় বিশ্ব বলি তাদের অবস্থা আজকের তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর চেয়ে ভালো ছিল। পলাশীর যুদ্ধের আগে 1750 সালে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মাথাপিছু বছরে গড় আয় ছিল $ 190, যেখানে আজকের প্রথম বিশ্বের ছিল $ 180। আজ এই পৃথিবীর কি অবস্থা তা নিচের সারণি-১ ও সারণি-২-এ বোঝা যাবে।

দেশ	বিশ্বজনসংখ্যার %	বিশ্বআয়ের %
ভারত	16.10	1.14
43টি সবচেয়ে অনুন্নত দেশ	58.00	4.00
24টি উচ্চ আয়ের দেশ	15.45	82.11

সারণি-১. বিশ্ব আয়ের বন্টন (বিশ্বব্যাঙ্কের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-1992)

দেশ	1970 সালে	1990 সালে	2000 সালে
আমেরিকা	4922	21790	34260
জার্মানি	3049	22320	25050
জাপান	1930	25430	34210
চিন	120	370	840
ভারত	100	350	460

সারণি-২. প্রতি বছরে মাথাপিছু গড় জাতীয় উৎপাদন (GDP) : ডলারে

পৃথিবীর সমস্ত দেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আয়ের পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে। 1960 সালে বিশ্বের 20 শতাংশ সবচেয়ে ধনী এবং 20 শতাংশ সবচেয়ে দরিদ্রের আয়ের অনুপাত ছিল 30 : 1। এই অনুপাত 1991 সালে 60 : 1 হয়। 2001 সালে এই অনুপাত আরও বেড়েছে। উন্নত দেশগুলোতেও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আয়ের পার্থক্য বেড়েছে।

উপনিবেশে পরিণত হওয়ার আগে তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা মোটামুটি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর সামাজিক অবস্থায় বাস ক'রত। তারা চাল, গম, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি খাদ্যশস্য চাষ ক'রত, মাছ ধ'রত, শিকার ক'রত, অরণ্য-সম্পদ টেকসইভাবে (sustainably) ব্যবহার ক'রত। তারা তাদের বাসস্থান, বস্ত্র এবং অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী স্থানীয় জিনিস ব্যবহার ক'রে ক্ষুদ্র কারিগরী ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ কতর। যাকিছু বাড়তি উৎপাদন হ'ত তা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে যেত। কিন্তু উৎপাদন মূলত হ'ত স্থানীয় মানুষের ব্যবহারের জন্য। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বেশির ভাগ মানুষের জীবন-প্রণালী প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চ'লত।

এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হ'য়ে গেল ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার পর। তৃতীয় বিশ্ব কাঁচা মালের জোগানদার হ'য়ে গেল এবং পশ্চিমী শিল্পদ্রব্যের আমদানি শুরু ক'রল। এক নূতন অর্থনীতি, নূতন-নূতন শস্য এইসব দেশের ওপর চাপান হ'ল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন হ'য়ে গেল। 1878 সালে ভারতের মত দেশে যেখানে মাথাপিছু দৈনিক 674 গ্রাম খাদ্যশস্য উৎপাদিত হ'ত, স্বাধীনতা পাবার পরে 1951 সালে তা 337 গ্রামে এসে দাঁড়াল। দুর্ভিক্ষ চিরসঙ্গী হ'য়েছিল। আমাদের দেশের যে কারিগরী শিল্পব্যবস্থা ছিল, যেমন, লৌহ, ইস্পাত, দস্তা, বস্ত্র ইত্যাদি, তা ধ্বংস হ'য়ে গেল পশ্চিমী উৎপাদিত দ্রব্যের আমদানির চাপে। এইসব কারিগররা ক্রমে-ক্রমে কর্মহীন হ'য়ে গ্রামের জমির ওপর চাপ বাড়িয়ে দিল। এই নূতন আর্থ-ব্যবস্থা, ভোগ্যবস্তুর চাহিদা, কারিগরী ব্যবস্থা, পশ্চিমী সংস্কৃতির আগ্রাসন তৃতীয় বিশ্বের উচ্চকোটি মানুষের উপর এমনভাবে চেপে বসল যে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরও সেই পশ্চিমী মূল্যবোধ, ভোগ্যবস্তু-সম্ভার, প্রযুক্তি, শিল্পব্যবস্থা এবং পুঁজির ব্যবহার পশ্চিমী

ধাঁচেই চ'লতে শুরু ক'রল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বেশি-বেশি ক'রে আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্য, আর্থব্যবস্থা এবং বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে প'ড়ল। ক্রমে-ক্রমে বড়-বড় বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা উৎপাদিত বস্তুসম্ভারের উৎপাদন ও ব্যবসার কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়াল। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য, যেমন রাস্তা, বাঁধ, খালব্যবস্থা, যোগাযোগ ইত্যাদি এবং নানারকম শিল্পকেন্দ্র-স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (আই. এম. এফ), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং উন্নত দেশগুলোর সরকারের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণ ঋণ নিতে লাগল। বিদেশী গবেষণা-সংস্থা, বিজ্ঞানী এবং ফাউনডেশন নূতন কৃষি, প্রযুক্তির উপর গবেষণা ক'রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে "আধুনিক" ক'রে পশ্চিমী প্রযুক্তি ও আর্থব্যবস্থার অধীন ক'রে ফেলল। বহু দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ল। ঘানা 1980-এর দশকের প্রথমে আফ্রিকার মধ্যে অন্যতম ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল। আজ তা একটি দরিদ্রতম দেশে পরিণত হ'য়েছে তথাকথিত "উন্নয়নের" চাপে। 1950 সালে ভারতে যেখানে মাথাপিছু বিদেশী ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র 89 পয়সা, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 8000 টাকা। বিদেশী ঋণ শোধ ক'রতে বাজেটের একটা বড় অংশ চলে যায় এবং বিদেশ থেকে আরও ঋণ নিতে হয়। এক ঋণজালে জড়িয়ে পড়ছে ভারত যেমন পড়েছিল ব্রাজিল, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশ। 1970-এর দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বর্ণযুগ শেষ হ'য়ে যায় এক পুঁজিবাদ এবং দীর্ঘস্থায়ী সংকটের যুগে প্রবেশ করে। 1980-এর দশক থেকে আমেরিকার 'নিও লিবারেল' অর্থনীতি ব্যবস্থার চাপে আই. এম. এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এবং উন্নত দেশেও যে পরিকাঠামোগত সংশোধন প্রোগ্রাম (Structural Adjustment Programme) চালু ক'রে বিশ্বায়নের পরিকল্পনা নেয় তাতে বহু দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ অতি উৎপাদন এবং মূলধন বা পুঁজির অতি সঞ্চয়নের এক গভীর সংকটে ভুগছে।

পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন : পুঁজিবাদ একটা বিশ্বব্যবস্থা। এই বিশ্বব্যবস্থা বারে-বারে গভীর সংকটের সম্মুখীন হ'য়েছে। প্রথমবার, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, দ্বিতীয়বার, 1930 সালের আন্তর্জাতিক মন্দার সময় এবং তৃতীয়বার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। পুঁজিবাদের যত বিশ্বায়ন ঘটেছে তত বেশী সংকটেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। 1997 সালের জুলাই মাসে এই সংকট আরেকবার নাটকীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ মাসে আমেরিকার দুটি প্রভাবশালী পত্রিকা পুঁজিবাদী সংকট-চক্রের অবসান ঘোষণা করে। তথ্যবিপ্লব নাকি এক অনন্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনবে। আমেরিকার বৈদেশিক নীতি-সংক্রান্ত পত্রিকা Foreign Affairs "The end of business cycle" নামে এক প্রবন্ধে লেখে "globalisation of production and consumption have reduced the volatility of economic activity in the industrial world।" তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার আশাবাদ প্রকাশ করে Wired নামে এক পত্রিকা "The long boom : a history of the future" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখে, "transition to a networked economy and global society।" ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে বাণিজ্যচক্রের অবসান ঘোষণা করা হয় যে জুলাই মাসের 2

তারিখে সেদিনই থাইল্যাণ্ড তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে। পূর্ব এশিয়ার "ব্যাঘ্র অর্থনীতি"-এর সংকট এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া কেঁপে ওঠে। পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং তাইওয়ানের অর্থনীতি যেভাবে নাড়া খেল তাতে বিশ্বায়নের যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের দাবীর অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হ'ল। 1994 সাল অব্দি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুঁজির যে লগ্নী হ'য়েছিল তার অর্ধেক হ'য়েছিল পূর্ব এশিয়াতে। একমাত্র পূর্ব এশিয়ার 'টাইগার ইকনমি"-গুলোকেই বিশ্বায়নের সাফল্যের নিদর্শন হিসাবে দেখান হ'ত। কিন্তু 1997-98 সালের পূর্ব এশিয়ার ঐ সংকট বিশ্ব পুঁজিবাদের কাছে এক বিরাট বিপদ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। Business পত্রিকা ব'লছে যে ঐ সংকট "the biggest threat to global prosperity"। "Prosperity" অবশ্য সমগ্র বিশ্বের নয়, ধনী-বিশ্বের। ঐ যে সংকট তা কিন্তু ঐসব দেশগুলোতে দুর্নীতি বা বাজারের অধিক নিয়ন্ত্রণের ফল নয়। এর মূল কারণ পুঁজির পুঞ্জিভবনের আধিক্য যা লাভকে সঙ্কুচিত করে। পূর্ব এশিয়াতে পুজির বিরাট লগ্নীর ফলে সেখানে উৎপাদন ক্ষমতা বিরাট বেড়ে যায়। তাকে আর মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা যত বেড়ে যাচ্ছিল ততই নূতন-নূতন কারখানা, খনি, বড়-বড় চাষের খামার, পরিকাঠামো নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি স্থাপিত হচ্ছিল। যখন অতি উৎপাদন এসে যায় তখন নূতন-নূতন উৎপাদন ক্ষমতা যোগ করা অযৌক্তিক মনে হ'তে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে একটা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের এছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল না। যাদের উৎপাদন খরচ কম, নতুন প্রযুক্তি আছে, শ্রমিক-শৃঙ্খলা আছে, মজুরী কম এবং বাজার আছে তারাই টিকবে। তাই লগ্নী ও উৎপাদন ক্রমাগত বেড়ে যায়। মোটরগাড়ী, ইস্পাত, ইলেকট্রনিকস্, কমপিউটার চিপস্, ফাইবার অপটিকস্ ইত্যাদি শিল্পের এক বিরাট প্রসার ঘটে পূর্ব এশিয়াতে। এর ফলে অতি উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয় এবং লাভ কমে যায়। 1998 সালে মোটরগাড়ির উৎপাদন ছিল চাহিদার চেয়ে 2.10 কোটি থেকে 2.20 কোটির মত বেশি গাড়ি। বিশ্ব বাজারের প্রয়োজনের তুলনায় তা 36 শতাংশ বেশি। এসত্ত্বেও বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থারা পাগলের মত পূর্ব এশিয়াতে গাড়ির কারখানা স্থাপন ক'রতে শুরু করে। 1997-98 সালের সংকটের আগে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান বাদ দিলে, যেখানে তখনই উৎপাদনের আধিক্য ছিল, এশিয়ার অন্যান্য দেশে মোটরগাড়ির উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। একই জিনিস ঘটল কমপিউটার চিপস, সেমি কণ্ডাকটার, অপটিকাল ফাইবার, রাসায়নিক পদার্থ, ইস্পাত ইত্যাদি শিল্পে। Dynamic Random Access Memory Chips (DRAMS)-এর জোগান প্রায় 18% বেশি ছিল। 1995 সালে -Drams-এর কোনও অতি-উৎপাদনের সমস্যা ছিল না। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় (যা Drams-এর বাজার 40% নিয়ন্ত্রণ করে) Drams-এর দাম মারাত্মকভাবে প'ড়ে যেতে শুরু করে। 64 মেগাবাইট Drams-এর দাম 1997 সালের গোড়ায় ছিল $60, 1997 সালের শেষে তা হ'ল $20, এবং 1998 সালে তা মাত্র 4 ডলারে নেমে আসে (Wall Street Journal, 4th June, 1998)। পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের মূলে বিশ্বপুঁজির পুঞ্জীভবন। এরই ফলে দ্রব্যের দাম ও লাভ দ্রুত পড়ে যাওয়া।

1997 সালে থাইল্যাণ্ডের মুদ্রার ধ্বসে যাওয়ার পরও আই. এম. এফ এবং বেশ কিছু বিদেশী ব্যাঙ্ক ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তার কথা ঘোষণা করে। থাইল্যাণ্ডের মত ইন্দোনেশিয়ায় কোনও মন্দার সম্ভাবনার কথা তাঁরা বলেননি। কিন্তু ঐ ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়া থেকে পুঁজির পলায়ন শুরু হয়। ইন্দোনেশিয়ার বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল $4000 কোটি। আন্তর্জাতিক পুঁজির পলায়ন এমন এক পর্যয়ে আসে যে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে এক বিপর্যয় আসে। বিদেশী ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের সন্দ্বে GDP-এর অনুপাত 35% থেকে বেড়ে 140 শতাংশে দাঁড়ায় (Economist, March 19, 1998)। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে একই ঘটনা ঘটতে থাকে এবং “এশিয়ান টাইগার”-রা “এশিয়ান মাউস”-এ পরিণত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর “ঠাণ্ডা যুদ্ধ” শেষ হ’য়ে যায়। বিভিন্ন শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের যে অস্ত্রব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটাল না। প্রতিরক্ষার বাজেট বিভিন্ন দেশে সমানই থাকে বা বেড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাই অস্ত্র বিক্রি ও ব্যবসা বজায় রাখা ঐসব দেশের একান্তই প্রয়োজন। তাই চাই ছোটো-বড়ো, স্থানীয় যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসের অবস্থা। তাই আজ আমেরিকা থেকে “clash of civilisation” বা “axis of evil”-কে ধ্বংস করার হুঙ্কার।

বিপজ্জনক প্রযুক্তি ও পদার্থের চালান : 1960 সালের দশক থেকে শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে পরিবেশ সচেতনতা বাড়তে থাকে এবং নতুন-নতুন পরিবেশ আইন আসতে থাকে। তাই বড়-বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের দূষণকারী বিপজ্জনক প্রযুক্তিনির্ভর কারখানাগুলো তৃতীয় বিশ্বে চালান করা শুরু করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তখনও কোনও পরিবেশ সংক্রান্ত আইনই বলবৎ হয় নি বা খুবই কম ছিল এবং আইন ফাঁকি দেওয়াও সহজ ছিল। তাছাড়া বাজারে মন্দা আসার সঙ্গে-সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের বাজার সম্পূর্ণ দখল করার প্রচেষ্টাও শুরু হ’য়ে যায় গ্যাটচুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে।

এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খুবই বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক প্রযুক্তির চারণক্ষেত্র হ’য়ে গেল। ভুপাল গ্যাস দুর্ঘটনা তার একটা বড় প্রমাণ। ভুপাল দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে বহুজাতিক সংস্থারা যখন তৃতীয় বিশ্বে কারখানা স্থাপন করে তখন তাদের নিজেদের দেশের নিরাপত্তার মান লাঘু করে না। নিজের দেশের স্বাস্থ্য এবং দূষণ-সংক্রান্ত নিয়ম এড়াবার জন্য বহুজাতিক সংস্থারা এইরকম শত-শত নিম্নমানের সব কারখানা ও প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বে চালান ক’রছে। ফিলিপাইনের বেটুন পারমাণবিক কেন্দ্র এইরকম আরেকটা উদাহরণ।

এছাড়া নানারকম বিপজ্জনক বস্তুসামগ্রী তৃতীয় বিশ্বে চালান হ’চ্ছে। যেসমস্ত ওষুধ, গর্ভনিরোধক সামগ্রী, কীটনাশক বহুবছর আগে ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানে নিষিদ্ধ হ’য়ে গেছে তা ঐসব কোম্পানী তৃতীয় বিশ্বে চালান দিচ্ছে। চেরনোবিল দুর্ঘটনার পরে তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত দুগ্ধজাত দ্রব্য তৃতীয় বিশ্বে পাঠান হ’য়েছে। হিসেব করা হ’য়েছে যে প্রতি বৎসর তৃতীয় বিশ্বে প্রায় 40000 লোক কীটনাশক বিষে মারা যায়।

এই যেসমস্ত বিপজ্জনক প্রযুক্তি ও বস্তুসামগ্রী শিল্পপ্রধান দেশগুলো থেকে আমদানী করা

হয় তা ধীরে-ধারে স্থানীয় প্রযুক্তি এবং দ্রব্যসামগ্রীকে সরিয়ে দেয়। সেইসব স্থানীয় প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে অনেক বেশি উপযুক্ত। কারণ এগুলো শ্রমশক্তি-নির্ভর, প্রচুর মানুষকে কাজ দেয় এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, সাবেকি মাছধরার পদ্ধতি। এইসব প্রযুক্তিকে সরিয়ে দিয়ে প্রচুর পুঁজিভিত্তিক আধুনিক অ-টেকসই প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি হ'চ্ছে যাতে তৃতীয় বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রে এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনে সর্বনাশ আসছে। আলো ঝলমল বিজ্ঞাপন এবং বাজার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মাতার বুকের দুধের পরিবর্তে আধুনিক সব অপ্রয়োজনীয় শিশুখাদ্য মানুষের উপর চাপানো হ'চ্ছে। এইসব কারণে তথাকথিত আধুনিক বিশ্বের চাপে তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা তাদের সাবেকি জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দ্রব্যসামগ্রী হারিয়ে ফেলছে।

সবুজ-বিপ্লব : আধুনিক প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের কৃষিকে পাল্টে দিয়েছে। বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশের জমিতে আজ দেশজ খাদ্যশস্যের পরিবর্তে রপ্তানীযোগ্য নগদ শস্যের চাষ বাড়ছে। যখন রপ্তানীমূল্য বেশি থাকে তখন চাষীরা বেশি আয় করে। কিন্তু যখন কৃষিপণ্যের দাম পড়ে যায় তখন বহু কৃষি-কর্মী কাজ হারায় এবং বাঁচবার জন্য খাদ্য কিনতে পারে না।

সবুজ-বিপ্লব এমন এক প্রযুক্তি যার দ্বারা বছরে একটার বেশি শস্য চাষ করা সম্ভব হয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন হয় উচ্চফলনশীল বীজ, প্রচুর জল, সার ও কীটনাশক বিষ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং পুঁজি। যদিও খাদ্যশস্য উৎপাদন-বৃদ্ধিই সবুজ-বিপ্লবের ঘোষিত লক্ষ্য, কিন্তু আসলে তা আমেরিকার রাসায়নিক শিল্পসামগ্রীর বাজার প্রসারের এক পরিকল্পনা যার জন্য আমেরিকা অর্থ সাহায্য দিতে শুরু করে। এই সবুজ-বিপ্লবের বিপদ আজ তৃতীয় বিশ্বের চাষীরা বুঝতে পারছে। জমি জলমগ্ন ও লবণাক্ত হ'চ্ছে, উর্বরতা হারাচ্ছে। মাটির নিচে থেকে প্রচুর জল তোলার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হ'চ্ছে। কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি বিষ ব্যবহারের ফলে জমি ও জল বিষাক্ত হ'চ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য নষ্ট হ'চ্ছে। চাষের খরচ যত বাড়ছে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা তত সর্বস্বান্ত হ'চ্ছে। কীটরা কীটনাশকের প্রতিরোধক্ষম হ'চ্ছে। 1965 সালের দশকের মধ্যভাগ থেকে উচ্চফলনশীল বীজ প্রয়োগ শুরু হওয়ার পরে হাজার-হাজার ধরনের দেশজ ধানের বীজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। সেইসব বীজ এখন সংরক্ষিত হ'চ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগরে যা ধনী দেশের আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কর্পোরেশনের অধীনে। তৃতীয় বিশ্বের চাষী এবং সরকার ক্রমে-ক্রমে আন্তর্জাতিক খাদ্য কোম্পানী এবং গবেষণাগারের অধীনে চলে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের শস্যের জিন এবং জার্মপ্লাজম পেটেন্ট ক'রছে।

জৈব প্রযুক্তি; এক নতুন অস্ত্র : তৃতীয় বিশ্বের চাষ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বহুজাতিক সংস্থা ও বিদেশী সরকারের অধীনে আনার জন্য আজ জৈব প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হ'চ্ছে। তৃতীয় বিশ্ব, যা মূলত কৃষিপ্রধান, তার অর্থনীতিকে পুরোপুরি নিজের কব্জায় নিয়ে আসার এবং সাবেকি কৃষিকে ধ্বংস করার এক নতুন পরিকল্পনা জিন-প্রযুক্তি।

জিন-প্রযুক্তি-দ্বারা সৃষ্ট 'ফ্রুকটোজ' আজ চিনির বাজারের 10 শতাংশ কব্জা ক'রেছে। এর ফলে বাজারে চিনির দাম প'ড়ে যাচ্ছে এবং হাজার-হাজার চিনি চাষী বেকার হ'চ্ছে। আমেরিকার

টেক্সাসের একটা 'বায়োটেক' কোম্পানীর বীজ ব্যবহার করে মাদাগাসকারের 70000 ভ্যানিলা চাষী সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেছে। নিউইয়র্কের এক কোম্পানীর গঁদের আঠা 1986 সালে সুদানের তৈরি আঠার রপ্তানীর বাজার ধ্বংস ক'রে দেয়। সম্প্রতি ভারতের জমিতে আমেরিকার বহুজাতিক দৈত্য কোম্পানী মনসাণ্টোর জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (GM) তুলোর বীজ ব্যবহারের অনুমতি ভারত সরকার দিয়েছে। এই বীজ সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানী বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। সারা পৃথিবী জুড়েই GM শস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিরোধ আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশে GM খাদ্যশস্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হ'য়েছে। হিসেব করা হ'য়েছে যে জৈব প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের 1400 কোটি ডলারের মত রপ্তানীযোগ্য কৃষিজাত পণ্যের বিকল্প বার ক'রতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে।

আধুনিক মৎস্য-প্রযুক্তি : তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে মাছ হ'চ্ছে পশু প্রোটিনের প্রধান উৎস এবং জীবিকা। সাবেকি মাছ ধরার প্রক্রিয়া ছিল খুবই সহজ এবং তা বাস্তুতন্ত্রের নিয়মকানুন মেনে চ'লত। যে জাল তারা ব্যবহার ক'রত তার ফুটো ছিল অপেক্ষাকৃত বড়-বড় যাতে মাছের চারা ধরা না পড়ে। মাছের ব্রীডিং গ্রাউণ্ড নষ্ট হ'ত না। মাছের বংশবৃদ্ধি হ'ত। স্থানীয় সব পদার্থ দিয়েই জাল, নৌকো ইত্যাদি সবরকম জিনিস তৈরি হ'ত। জেলেরা স্বাবলম্বী ছিল এবং গ্রামসমাজের সমস্ত মানুষ মাছ ধরার বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকত।

আধুনিক 'ট্রলার' মৎস্য ব্যবসায়ের এক বিরাট প্রসার ঘটে গত কয়েক দশকে। এই নূতন মাছ ধরার কাজ জেলেরা করে না, করে বাইরের ব্যবসায়ীরা। এর ফলে ঘটছে অতি অত্যধিক মাছ তোলা যাতে ধরা প'ড়ছে ছোট-ছোট মাছ যা মানুষের খাদ্য-প্রয়োজন মেটায় না। পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ট্রলার ফিসিংয়ের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে বেশি ক'রে মাছ ধরা এবং খুব শীঘ্র অতি মুনাফা অর্জন করা। এই পদ্ধতিতে জালের ফুটো ছোট-ছোট হয় যাতে চারা মাছ ধরা পড়ে। যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তাতে সমুদ্রের মাছের ব্রীডিং গ্রাউণ্ড নষ্ট হয়। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে মাছের ঝাঁক কমে আসছে যার ফলে সাবেকি জেলেরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'চ্ছে।

আধুনিক রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং শিল্পব্যবসাজাত বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের জন্য নদী, পুকুর, জলাভূমি দূষিত হ'য়ে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হ'চ্ছে। ধানের জমিতে যেসব মাছ, শামুক, গুগলি ইত্যাদি গ্রামের গরীব ও প্রান্তিক মানুষকে পশু-প্রেটিন জোগাত কীটনাশক প্রয়োগের ফলে তা অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তাই চাষ-ব্যবস্থা, মাছ-ধরা ইত্যাদির যান্ত্রিকীকরণের ফলে তৃতীয় বিশ্বে লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছে। এছাড়া ফুল, ফল, চিংড়ি মাছের চাষ ক'রে উন্নত দেশে রপ্তানী ক'রে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করার প্রবণতায় জমির ব্যবহারের দ্রুত পরিবর্তন হ'চ্ছে যাতে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে প'ড়বে।

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র ভেঙ্গে প'ড়ছে : পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাস করে। ক্রান্তীয় অরণ্যের জীববৈচিত্র্যকে ব্যবহার ক'রে বেঁচে আছে বহু আদিবাসী, স্থানীয় মানুষ। সেই ক্রান্তীয়

অরণ্য দ্রুত অপসারিত হ'চ্ছে যার পরিমাণ বছরে প্রায় 1 কোটি 54 লক্ষ হেক্টর। এইসব অরণ্যের কাঠ চালান হ'চ্ছে শিল্পোন্নত দেশে অথবা ঐসব অরণ্য-অঞ্চলকে চারণভূমিতে পরিণত ক'রে আমেরিকার হ্যামবার্গার শিল্পকে মাংসের জোগান দিতে। শুধু জার্মানীকে কাঠ জোগাতে প্রতি বছরে তৃতীয় বিশ্বের 2 লক্ষ হেক্টরের মত অরণ্য কেটে ফেলা হ'চ্ছে। 1900 থেকে 1965 সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের অর্ধেক অরণ্য অপসারিত হ'য়েছে এবং 1965 সালের পর এই অপসারণ দ্রুততর হ'য়েছে।

এই যে বিরাট অরণ্য অপসারণ বাস্তুতন্ত্রের ও সমাজের উপর তার প্রভাব বিরাট। তৃতীয় বিশ্বের লক্ষ-লক্ষ প্রান্তিক মানুষ তার জীবন ও জীবিকা হারাচ্ছে। যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হ'চ্ছে আদিবাসী মানুষ। অরণ্য অপসারণ ও অন্যান্য কারণে প্রতি বছরে পৃথিবীর 2500 কোটি টন মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে। নদী ও সমুদ্রতলে জমা হ'চ্ছে। ভারতে সেই ক্ষয়ের পরিমাণ বছরে 600 কোটি টন। এই মাটি তৈরি ক'রতে প্রকৃতির হাজার-হাজার বছর সময় লাগে। অরণ্য অপসারণের ফলে জলবিভাজিকা অঞ্চলে মাটি আর জল ধ'রে রাখতে পারে না। নদীর নিম্ন অঞ্চলের গ্রাম ও শহর প্রতি বছর বন্যায় ভুগছে।

পৃথিবীর দিকে-দিকে মরুভূমির প্রসার ঘটছে, পার্বত্য বাস্তুতন্ত্র ভেঙ্গে প'ড়ছে, ওজন গহ্বর সৃষ্টি হ'চ্ছে, পৃথিবী উত্তপ্ত হ'য়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রস্ফীতি ঘটছে, হিমবাহ গলে পিছিয়ে যাচ্ছে, এন্টারটিকার বরফের স্তূপ ভেঙ্গে পড়ছে, জল দূষিত ও বিষাক্ত হ'চ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ-লক্ষ টন ভয়ঙ্কর পারমাণবিক বর্জ্যপদার্থ এবং মারাত্মক তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম জমা হ'চ্ছে। বাস্তুতন্ত্র ধ্বসে পড়ছে।

আধুনিক শিল্পব্যবস্থা : আধুনিক শিল্পব্যবস্থা ভূরি-ভূরি দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করে। শিল্প-বিপ্লবের মধ্যভাগে 1800 সালে আমেরিকায় একজন 300 রকমের জিনিস কিনতে পারত 1500 বর্গফুটের মত জায়গার দোকানে। আজ যখন এক লক্ষ লোক বাস করে এমন এক শহরে একজন আমেরিকান বাজার ক'রতে যায় তখন সে প্রায় 10 লক্ষ রকমের জিনিস কিনতে পায়। বাজারের জায়গা পায় 1 কোটি 50 লক্ষ বর্গফুট। এই যে বিরাট শিল্পব্যবস্থা পশ্চিমী দুনিয়া তৈরি ক'রল আজ তা তৃতীয় বিশ্বেও চাপিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এইসমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে না। ভারতে ঐসব মানুষের সংখ্যা প্রায় 80-85%। আগেকার দিনে দেশের ছোট-ছোট শিল্প যেসমস্ত জিনিস তৈরি ক'রত তা মানুষের দৈনদিন প্রয়োজন মেটাত সহজ, সরল জীবনযাপন করার জন্য। যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হ'ত তাও ছিল খুব সরল ও শ্রম-নির্ভর। আজকের বিশ্বব্যবস্থায় ঐসব সাধারণ জিনিসকে ঝলমলে বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রচারিত সব বস্তুসম্ভার বাজার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ঐসব পুরোনো জিনিস ব্যবহারকে মানুষ আজ মর্যাদাহীন ব'লে মনে ক'রতে শুরু ক'রেছে। ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি ব'লে বিজ্ঞাপন শিশুকাল থেকে মানুষের মনে এক কৃত্রিম অভাববোধ সৃষ্টি ক'রছে। একেই বলা হয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি।

তৃতীয় বিশ্বের এই ভোগবাদী জীবনযাপন করার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নকল ক'রে

পরিকাঠামো ও শিল্পব্যবস্থা স্থাপন ক'রতে শুরু করে। আধুনিক বস্তুসম্ভার বাজারের শেয়ারের দামকে চড়িয়ে দেয়। আদুনিক পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্প-কারখানা, যার বেশির ভাগই বিদেশী কোম্পানী, তৃতীয় বিশ্বে তাদের শিল্প স্থাপন ক'রতে শুরু করে এবং দেশজ শিল্পব্যবস্থাকে ধ্বংস ক'রে দেয়।

এইসব দেশ পশ্চিমী দেশগুলোকে নকল ক'রে বড়-বড় বাঁধ, লৌহ ইস্পাত কারখানা, সিমেন্ট ও রাসায়নিক কারখানা, বড়-বড় রাস্তা, ব্রীজ, গাড়ির কারখানা, ফ্লাইওভার, বহুতল অট্টালিকা, বড়-বড় শহর তৈরি ক'রতে শুরু করে। ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে তৃতীয় বিশ্বের "এলিট" নেতৃত্ব মনে করে পশ্চিমী ঢঙেই তারা দেশকে উন্নত ক'রতে পারবে। তা ক'রতে গিয়ে কোটি-কোটি মানুষ বাস্তুহারা হ'য়েছে, জীবন ও জীবিকা হারিয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই আদিবাসী ও দলিত।

এইসব বড়-বড় শিল্প স্থাপন ক'রতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক আই. এম. এফ, অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম বিশ্বের সরকারগুলোর কাছ থেকে ধার নেওয়া শুরু করে এবং তৃতীয় বিশ্ব ঋণের জালে জড়িয়ে প'ড়তে থাকে। উন্নত দেশগুলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গরীব দক্ষিণ দেশগুলো থেকে রপ্তানীদ্রব্যের উপর যে শুল্ক আরোপ করে তার মূল্য $10000 কোটি যা অনুন্নত দেশগুলোকে দেওয়া তথাকথিত সাহায্যের চেয়ে বেশি। আজকের বিশ্বায়নের যুগে শিল্পোন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের অরণ্য, খনিজ সম্পদকে শুষে নিচ্ছে এবং তার শ্রম এবং জমিকে ব্যবহার ক'রছে তাদের কলকারখানা ও শিল্পব্যবস্থাকে চালু রাখতে। এটা মনে রাখতে হবে যে শিল্পোন্নত দেশে পৃথিবীর মাত্র 25 % মানুষ বাস করে। কিন্তু তারাই পৃথিবীর সম্পদের ৪০ শতাংশের বেশি ভোগ করে। কিন্তু এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে প্রধানত অকিঞ্চিৎকর সব বিলাসদ্রব্য উৎপাদিত হয়। উন্নত বিশ্বের কয়েকটি দেশের ঐরকম সব বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের খরচ নিচে দেওয়া হ'ল (সারণি-৩) :

দেশ	অকিঞ্চিৎকর বিলাসদ্রব্য	খরচ
ইউরোপ	অ্যালকহলিক ড্রিঙ্কস	10500
ইউরোপ	সিগারেট	5000
পৃথিবীতে	মাদক দ্রব্য	40000
পৃথিবীতে	মিলিটারির খরচ	78000
ইউরোপ ও আমেরিকা	পোষা প্রাণীর জন্য খাদ্য	1700
জাপান	ব্যবসার জন্য আমোদ-প্রমোদ	3500
ইউরোপ	আইসক্রীম	400
আমেরিকা	প্রসাধন সামগ্রী	800
আমেরিকা ও ইউরোপ	পারফিউমস	1200

সারণি-৩. অকিঞ্চিৎকর বিলাসদ্রব্যের খরচ (কোটি ডলারে)

UNDP-এর ওয়ার্লড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট; 1998 মোট $1,41,100 কোটি

যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত উপরে বর্ণিত বিলাসদ্রব্যের দাম কষা হ'ত তবে তা আকাশচুম্বী হ'ত। এইসব অপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে জমি, জল, শক্তি, মানুষের শ্রমশক্তি এবং আরও কত কী প্রাকৃতিক সম্পদ লাগে। অরণ্য ধ্বংস হ'চ্ছে, জল, বাতাস ও মাটি দূষিত হ'চ্ছে। মানুষের রোগ বাড়ছে। প্রকৃতি নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে। অথচ ঐ অর্থের এক সামান্যতম অংশ দিয়ে আমরা পৃথিবীর প্রান্তিক মানুষের কত কী সমস্যার সমাধান ক'রতে পারতাম তার একটা হিসেব নিচে দেওয়া হ'ল (সারণি-4) :

পৃথিবীর সবাইকার প্রাথমিক শিক্ষা	—	$600 কোটি
সবারই জন্য জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা	—	$900 কোটি
সমস্ত নারীর জন্য মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা	—	$1200 কোটি
প্রত্যেকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পুষ্টি	—	$1300 কোটি
মোট	—	$4000 কোটি

সারণি-৪

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সদ্যস্বাধীনতা-প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নিল তা হ'ল ঐ প্রথম বিশ্বের পরিবেশ বিধ্বংসী মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগসম্ভার তৈরি করার জন্য কল-কারখানা নিয়ে এক শিল্পব্যবস্থা। ভারতের মত দেশে যে অর্থনীতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু হ'ল তার সঙ্গে বেশির ভাগ মানুষের কোনও সম্বন্ধ নেই। বরং ঐ সমস্ত মানুষের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে। আজকে পুঁজিভিত্তিক শিল্পসভ্যতা এক গভীর সংকটে ভুগছে—অতি-উৎপাদন এবং অত্যধিক পুঁজি সঞ্চয়ের। উৎপাদনে পুঁজি লগ্নীর আর জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। পুঁজিবাদ আজ 'ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজম'-এর রূপ নিয়েছে যেখানে দৈনিক বৈদেশিক পুঁজির বাজারের লেনদেন হ'চ্ছে $180000 কোটি সেখানে দৈনিক আমদানী-রপ্তানী ঐ লেনদেনের মাত্র 18%। সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশ্বায়নের বজ্জাতি চালাচ্ছে উন্নত দেশগুলো। এই বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির ধ্বংসকে তরান্বিত ক'রছে। পৃথিবীর ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ত্বরান্বিত হ'চ্ছে। 1960 সালে ধনী দেশগুলোর বাজার যেখানে গরীব দেশগুলোর তুলনায় 37 গুণ বেশি ছিল সেখানে আজ তা হ'য়েছে 74 গুণ। অবস্থা এমনই যে মাত্র তিনজন সবচেয়ে ধনী লোকের সম্পদ 48টি গরীব দেশের GDP-এর সমান। 2001 সালে পৃথিবীর ৪2.6 কোটি মানুষ অভুক্ত থাকছে। বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা 48.4 কোটি এবং 32.5 কোটি শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। 20 কোটি মানুষের কোনও সস্তা ওষুধের সংস্থান নেই এবং 240 কোটি লোকের কোনও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই। আফ্রিকার সাহারা প্রান্তের দেশের মানুষের আয়ুষ্কাল উন্নত দেশের চেয়ে প্রায় 30 বছর কম। এ প্রায় ব্যাপক গণহত্যার (genocide) বিশ্বায়ন।

গ্যাট, মেধাসত্ত্ব আইন, বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদির দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখলের বিশ্ব-পরিকল্পনা শুরু হ'য়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের ভ্রষ্ট সমাজব্যবস্থা বজায়

রাখতে বিশ্ব-বাণিজ্য-সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে দেশের আর্থিক পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ক'রছে। ভারতে এই পরিবর্তন পুরোদমে চালু হয় 1991 সালে। সমাজকল্যাণমূলক কাজ যেমন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের বন্দোবস্ত হ'চ্ছে। জলকেও বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হ'চ্ছে ভারতের নূতন জল-নীতিতে। মুক্ত বাণিজ্য এবং উদারীকরণের নামে সরকারী কল-কারখানা, উৎপাদন-সংস্থাকে বেসরকারীকরণ করা হ'চ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার শর্ত অনুসারে পণ্যের আমদানীর জন্য দেশের দরজা খুলে দেওয়া হ'য়েছে। ধান গম ইত্যাদি খাদ্যশস্য দেশে উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও (তার অর্থ এই নয় যে দেশের সমস্ত মানুষ দুধে-ভাতে আছে) বিদেশ থেকে কৃষিজ দ্রব্য আমদানী হ'চ্ছে। কৃষিপণ্যের দাম ভীষণভাবে পড়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য এবং শিল্পপণ্যের দামের অনুপাত দ্রুত ক'মে যাচ্ছে। সমস্ত কৃষিপণ্যের দাম 50% ধ্বসে প'ড়েছে। 1930 সালের আন্তর্জাতিক মন্দার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য (ভ্রষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য) জমির ব্যবহারকে ব্যপকভাবে বদলে ফেলা হ'চ্ছে। এর সঙ্গে আছে বিজ্ঞানের প্রয়োগের নামে বৃহৎ-বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার সবুজ-বিপ্লব এবং জৈব-প্রযুক্তির আক্রমণ। ভারতের মত দেশে খাদ্য-সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে প'ড়বে।

ভারতের চাষীরা ঋণগ্রস্ত হ'য়ে সর্বস্বান্ত হ'চ্ছে, আত্মহত্যা ক'রছে। আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাগুলো ভারতের মত দেশে চাষে, বিদ্যুতে ভর্তুকী উঠিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। অথচ, ইউরোপ, আমেরিকা কৃষিতে বিরাট ভর্তুকী দিচ্ছে। OECD দেশগুলো 2001 সালে কৃষিতেও 2700 কোটি ডলার ভর্তুকী দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে আমেরিকাতে একটা বিল আসছে যাতে আমেরিকার চাষীদের আগামী দশ বছরে 7000 কোটি ডলার ভর্তুকী বাড়ানো হবে। পশ্চিমী দেশগুলোতে কৃষিতে ভর্তুকীর পরিমাণ দিনে $100 কোটি।

বিশ্বপুঁজি আজ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সঙ্গে-সঙ্গে এক সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নও শুরু ক'রেছে। মানসিকতার "হেজমনাইজেসন।" মনকে জয় করা হ'চ্ছে। আমরা কি খাব, পরব, দেখব, ভাবব সবেরই "মনোকালচারাইজেসন" চলছে। প্রকৃতিজগতে "মনোকালচার" জীব-জগতের ধ্বংস ডেকে আনে। এই যে "নব উদারীকরণ", বাজারকে নূতন ধর্মে রূপান্তরিত করা, তার বিরুদ্ধে দিকে-দিকে মানুষের প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। পশ্চিমী জগতেও সিয়াটেল থেকে ওয়াশিংটনে হাজার- হাজার মানুষ বিশ্ববাণিজ্য, সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদি সংস্থার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছে। 11ই সেপ্টেম্বর 2001 যেদিন নিউইয়র্কে "ওয়ার্লড ট্রেড সেণ্টার" ভেঙ্গে প'ড়ল সেদিনই কানাডার টরাণ্টোর সবথেকে উঁচু অট্টালিকায় গ্রাফিটি বেরোল "Down with capital, Down with dollar।" "নব্য লিবারেল" অর্থনীতির ধাক্কা পশ্চিম জগতের সাধারণ মানুষের জীবনকেও দূর্বিষহ ক'রে তুলছে। আজ আমেরিকার উপরতলার 1% মানুষের আয় সবচেয়ে নিচের তলার 40% মানুষের আয়ের চেয়ে বেশি। গত 20 বছরে ইংল্যাণ্ডে দারিদ্র্যে বাস করে এমন শিশুর সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। 1989 সালে হল্যাণ্ডের হাগ শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-মিউজিয়ম কংগ্রেসে আমেরিকান চিন্তাবিদ নীল পোস্টম্যান তাঁর মূল প্রারম্ভিক ভাষণে আমেরিকান সমাজের এক সার্বিক ধ্বংসের রূপ চিত্রিত

করেন। তিনি বলেন, "আমরা প্রযুক্তিগত সবরকম উদ্ভাবনকে আমাদের সমাজে প্রয়োগ ক'রেছি। আমরা পাগলের মত, ইচ্ছে ক'রে, কোনরকম চিন্তা না ক'রে এর পরিণাম কি হ'তে পারে তাকে অগ্রাহ্য ক'রেছি। যেহেতু প্রযুক্তি এটা দাবী করে তাই আমরা ধর্ম, পরিবার, শিশু, ইতিহাস এবং শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়েছি। আমরা যা ক'রেছি তার ফলে আমেরিকান সভ্যতা ভেঙ্গে প'ড়ছে। সবাই জানে এটা সত্যি, কিন্তু তারা শক্তিহীন।" তাহ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তৃতীয় বিশ্ব এবং প্রথম বিশ্বের সমাজ ও প্রকৃতি এক সার্বিক ধ্বংসের কিনারে। যদিও দুই ধ্বংসের রূপ ও প্রকৃতি আলাদা। প্রশ্ন হ'চ্ছে, এই যে প্রায় 150 বছরের শিল্প-সভ্যতা এর কোনও বিকল্প আছে কি? অনেকে বলেন "There is no alternative" অর্থাৎ TINA। কিন্তু পৃথিবীর দিক্‌বিদিক্ থেকে আজ আওয়াজ উঠেছে, হ্যাঁ, There is an alternative অর্থাৎ TIAA।

কেন এই বিকল্প পরিকল্পনা : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এই যে প্রযুক্তি-নির্ভর ভোগবাদী শিল্পসমাজ তা টিকবে না। 1924 সালে চিনদেশ ভ্রমনকালে এক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এক শতাব্দীর বেশি উন্নত পশ্চিমের রথের পিছনে আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে, তারই ধুলোয় দম বন্ধ হ'য়েছে, চীৎকারে কানে তালা লেগেছে এবং নিজেদের অসহায়তা আমাদের হীনমন্য ক'রেছে এবং তার গতির দ্রুততা আমাদের আচ্ছন্ন ক'রেছে। আমরা স্বীকার ক'রেছিলাম যে ঐ রথযাত্রাই হ'চ্ছে অগ্রগতি এবং ঐ অগ্রগতিই হ'চ্ছে সভ্যতা। যদি কখনও আমরা প্রশ্ন করবার চেষ্টা ক'রতাম 'কিসের জন্য অগ্রগতি এবং কার জন্য অগ্রগতি' তাহ'লে ঐ অগ্রগতির সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করাকে অদ্ভুত এবং হাস্যকরভাবে প্রাচ্য-দেশীয় ব'লে গণ্য করা হ'ত। আজ এক কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি যা আমাদের শুধু রথের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ তা নয়, সেই রথের চলার পথে খানাখন্দের হিসেব নিতে ব'লছে।" রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত দ্রুতগামী রথ হ'চ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং খানাখন্দ হ'চ্ছে সমাজ ও প্রকৃতির সার্বিক বিনাশ।

আমাদের বুঝতে হবে যে পৃথিবীতে তিন রকমের অর্থনীতি কাজ করছে। এক, প্রকৃতির অর্থনীতি। দুই, দরিদ্রের জীবনধারণের অর্থনীতি এবং তিন, বাজারী অর্থনীতি। প্রকৃতিতে বিভিন্ন চক্র আছে। যেমন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জল, কার্বন, মাটি ইত্যাদির চক্র। এইসব চক্র স্বতঃ -উৎপাদনকারী এবং স্বশাসিত। প্রকৃতি নিজেই এইসব চক্রের সৃষ্টি করে যা পৃথিবীতে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। বাজারী অর্থনীতি ও ভোগবাদ এইসব চক্রে সর্বনাশ আনছে।

গরীবের বাঁচার অর্থনীতি হ'চ্ছে পরিবেশগত দিক থেকে যারা কম সুবিধাপ্রাপ্ত সেইসব প্রান্তিক মানুষদের অর্থনীতি। এই অর্থনীতির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের প্রধান নীতি হ'চ্ছে মানুষের প্রাথমিক বা বুনিয়াদী প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি। সারা তৃতীয় বিশ্ব জুড়েই প্রযুক্তি ও বাজারী অর্থনীতি গরীবদের এই বাচবার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত ক'রছে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সহজ হবে। যুগ-যুগ ধ'রে গুজরাতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের গরীব মানুষেরা, যেহেতু ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম, তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান থেকে প্রকৃতিকে বুঝে তাদের জমিতে পুকুর, কুয়ো খুঁড়ে বৃষ্টির জল সঞ্চয় ক'রে জোয়ার, বাজরা, সবজি ইত্যাদি শস্য চাষ ক'রে খেত ও

বাঁচত। কিন্তু ষাটের দশকে যখন সবুজ-বিপ্লব প্রযুক্তি ঐ অঞ্চলে এল এবং নগদ শস্যের চাষ বাড়ল তখন ন'শোর জায়গায় সাড়ে চার লাখ বৈদ্যুতিক টিউবওয়েল এসে গেল। জলের স্তর নেমে গিয়ে পুকুর, কুয়ো শুকিয়ে গেল, গরীব মানুষেরা পরিবেশ বাস্তুহারা হ'ল আর প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত হ'য়ে বন্ধ্যা হ'য়ে গেল। বাজারী অর্থনীতি ও আধুনিক প্রযুক্তি গরীবের বাঁচবার অর্থনীতিকে ধ্বংস ক'রে দিল। আধুনিক উন্নয়নের যে বাজারী অর্থনীতি তা সমাজ ও প্রকৃতির এই ধ্বংসকে খরচের হিসেবে ধরে না।

বাজারী অর্থনীতির প্রাধান ধর্ম হ'চ্ছে লাভ এবং পুঁজির পুঞ্জীভবন। এই অর্থনীতিতে যেসমস্ত সম্পদের বাজারে কোনও দাম নেই সেইসব সম্পদের মূল্যকে পণ্য উৎপাদনের খরচে আনা হয় না। যেমন বায়ু, জল, মাটি, অরণ্য, জীববৈচিত্র্য, মানুষের জীবন ও সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। তাই সারা পৃথিবী জুড়েই এই বাজারী অর্থনীতি ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে এবং জীবজগতের অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রছে। 'দেশ' পত্রিকায় 1997 সালের প্রবন্ধে প্রকৃতি ও সমাজের বিপর্যয়ের চেহারা তুলে ধরেছিলাম।

সত্য কথা ব'লতে কি উন্নত প্রযুক্তির বহুকথিত দক্ষতা (efficiency) মূলত ঠিক নয়। এইসব প্রযুক্তি খুবই দূষণ সৃষ্টি করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করে। একশ বছর আগে আমেরিকায় 1 ক্যালরী খাদ্য তৈরি ক'রতে এক ক্যালরী শক্তির এক ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হ'ত। আজ সেখানে প্রয়োজন হয় 10 ক্যালরী শক্তি। শক্তির এই যে ভর্তুকী তা পাওয়া যায় পুনর্নবীকরণীয় প্রকৃতির সম্পদকে ধ্বংস ক'রে যাকে খরচের হিসেবে আনা হয় না। এরই ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতাহীন পদ্ধতি বা প্রযুক্তিকে দক্ষ ব'লে মনে হয়। বাজারী অর্থনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে অধিকাংশের সর্বনাশ ক'রে লাভকে চরমে তোলা, প্রকৃতি কিম্বা সমাজ চুলোয় যাক। আধুনিক প্রযুক্তির বিশিষ্টতা হ'চ্ছে শ্রমশক্তি ব্যবহারের সংকোচন, শক্তির ব্যবহারের নয়। একজন নাইজেরিয়ানের চেয়ে একজন আমেরিকান 250 গুণ বেশি শক্তিদাস ব্যবহার করে।

বাজারী অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধিই হ'চ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি। আজ যদি ভারত, চিন, ইন্দোনেশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষেরা আমেরিকা যেভাবে সম্পদ ভোগ করে সেটাকেই আদর্শ ব'লে গণ্য করে, তাহ'লে আজকে তারা যে সম্পদ ব্যবহার ক'রছে তার প্রায় 250 গুণ বেশি ব্যবহার ক'রতে হবে। আমাদের সমস্ত অরণ্য, জমি, নদী, জীববৈচিত্র্য ঐ উন্নয়নকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। গান্ধীজি এটা খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন। তাই তিনি লেখেন, "ঈশ্বর করুন ভারত যেন পশ্চিমী ঢঙে শিল্পায়নের পথ বেছে না নেয়। একটা ছোট দ্বীপের রাজত্ব আজ সমস্ত বিশ্বকে শৃঙ্খলে বেঁধেছে। যদি ত্রিশ কোটি লোকের পুরো একটা দেশ ঐ রকমের অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করে তাহ'লে সমস্ত বিশ্ব পঙ্গপাল পড়ার মত নিঃস্ব হবে।"

এবার একটু দেখা যাক পৃথিবীর দেশজ অবং ঐতিহাসিক সমাজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্বচনের যুক্তিগ্রাহ্যতা কি ছিল। তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্বাচনের নীতি ও পদ্ধতি একেবারে ভিন্ন। তাই কোনও সমাজকে আদিম বা অবৈজ্ঞানিক বলা সমাজতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে

বোধহয় টেকে না। গুজরাতের যে উদাহরণ আগে দিয়েছি তাতে কাকে বেশি বৈজ্ঞানিক ব'লব? ঐ যে সাধারণ নিরক্ষর চাষীরা যারা তাদের ঐতিহ্যিক বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানকে ব্যবহার ক'রে হাজার-হাজার বছর বেঁচেছিল তারা বেশি বৈজ্ঞানিক (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত দিক থেকে), না, যারা বিজ্ঞানের অহমিকা নিয়ে এসে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ক'রে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বাস্তুহারা এবং লক্ষ-লক্ষ হেক্টর জমিকে বন্ধ্যা ক'রে দিল তারা?

খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী : বিজ্ঞানের যে প্রকৃতিকে দেখবার খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী তা সৃষ্টি হ'য়েছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হওয়ার সময় ফ্রান্সিস বেকন ও রনে দেকার্তের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কারে। বেকন "বিজ্ঞানের ফসল"কে আহরণের কথা, প্রকৃতির প্রভু হওয়ার কথা ব'লছেন। দেকার্ত ব'লছেন প্রকৃতি ও প্রকৃতির নিয়মকে বুঝতে হ'লে একটা বিষয়কে (phenomenon) ছোট-ছোট অংশে ভাগ ক'রে নিয়ে সেইসব ছোট অংশকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রতে হবে। এই যে প্রকৃতিকে খণ্ড-খণ্ড ক'রে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গী তা এক reductionist জ্ঞানতত্ত্ব সৃষ্টি ক'রে। এই বিশ্বদৃষ্টি একসময় প্রকৃতিকে বুঝতে খুবই সাহায্য ক'রেছে, কিন্তু ঐ দৃষ্টিভঙ্গী আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পৃথিবীর প্রকৃতি ও সমাজকে এক সর্বনাশের কিনারায় এনে ফেলেছে। এ যেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের 'negation of negation'। যে reductionism একদিন প্রকৃতিকে, প্রকৃতির নিয়মকে বুঝতে সাহায্য ক'রেছে, আজকে সেই খণ্ডদৃষ্টি সমগ্রের মধ্যে অন্তসম্পর্ককে ভুলে গিয়ে বাস্তুতন্ত্রে সর্বনাশ আনছে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাসকাল সতের শতাব্দীতে লেখেন, "Humankind is a small link in the immense web of Nature, but is only one that, through thought understands nature; it is the only species on earth to be responsible for the earth, and to be able to transform it, for better or worse!" কার্ল মার্কস তাঁর 1844 সালের "Economic & Philosophic Manuscript" গ্রন্থে লেখেন, "Nature is the inorganic body of man.... But no. Nature is not the inorganic body of man alone, but as well as that of the bee and the royal eagle. Paraphrasing Hugues de Saint Victor I would even say that he who loves mankind is only a tender neophyte; better is he who loves the other living species as his own. Only perfect is he who recognises in his own body the inorganic body of Nature".

মার্কস যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপিত করেন তা উপরে উল্লেখিত পাসকাল ও মার্কসের প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানব প্রজাতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী। মার্কস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে লিখেছেন যে কমিউনিস্ট সমাজ স্থাপিত হবার পর "The proletariat will use its political supremacy to wrest by degrees, all capital from the bourgeoisie, to centralise all instruments of production in the hands of the State, i.e., of the proletariat organised as the ruling class; and to increase the total of productive forces as rapidly as possible". জোসেফ স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে লিখিত তাঁর "Economic problems of socialism in the USSR" গ্রন্থে লেখেন : "The securing of the maximum satisfaction of the constantly rising material and cultural

requirements of the whole of society through the continuous expansion and perfection of socialist production on the basis of higher techniques!" দেখতে পাচ্ছি যে সাম্যবাদের প্রবক্তারাও "centralise all instruments of production" এবং "Productive forces"-এর "continuous expansion"-এর কথা ব'লছেন মানুষের "material & cultural requirements"-এর চূড়ান্ত পরিতৃপ্তির জন্য। এই চূড়ান্ত পরিতৃপ্তির কোনও শেষ আছে কি? সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিটি কংগ্রেসে স্বপ্ন দেখানো হ'চ্ছে তাঁরা খুব শীঘ্র আমেরিকাকে মাথাপিছু উৎপাদনে ছাড়িয়ে যাবে। শিল্প-সভ্যতার উৎপাদন বৃদ্ধির কি মারাত্মক ফল হয় তা আমরা আগেই দেখেছি।

বিকল্প পরিকল্পনা : রবীন্দ্রনাথ "progress" বা অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কাকে অগ্রগতি ব'লব? আজকে যাঁরা বিকল্প সমাজ-পরিকল্পনার কথা ব'লছেন তাঁরা অগ্রগতির এক নূতন সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টা ক'রছেন। তাঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে "progressive" কিন্তু "progressivist" নয়। নূতন পরিকল্পনার আদর্শে "উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতিই" অন্য সমস্ত অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা এগিয়ে নিয়ে যায় এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না এবং উৎপাদিকা শক্তির অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করে। উৎপাদিকা শক্তিকে সামাজিক সম্পর্ক এবং যে বিশ্বদৃষ্টি ঐ সম্পর্ককে সৃষ্টি করে তার অধীনে স্থাপিত করে। এই দর্শন মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ককে যাচাই করে মানুষ, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এমনকি অন্যান্য জীব-প্রজাতির ওপর আস্থা এবং শ্রদ্ধাকে মাপকাঠি করে। এই নূতন দর্শনের ইতিহাসবোধ উন্নয়নের একরৈখিক অগ্রগতির গল্প নয়। ইতিহাসের যদি নিজস্ব কোনও অন্তর্নিহিত গতিশীলতা থাকত তবে তা তাপগতিবিদ্যা দ্বারা চালিত হ'ত। অর্থাৎ তা এমন এক ইতিহাস যার ফলে "entropy" অপ্রতিহত গতিতে বেড়েই যাবে। তবে তা হ'ত এক ক্ষয়ের ইতিহাস। কেবল মাত্র এক আত্মসচেতন মানবচৈতন্য ঐ ক্ষয়কে রোধ ক'রতে বা উল্টে দিতে পারে। তাই রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্র অগ্রগতিকে সংজ্ঞা দেয় একটা প্রবণতা ব'লে। সেই প্রবণতাগুলোকে নৈতিকতা এবং নন্দনতত্ত্ব দিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যেমন, সাম্য, সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ, গণতন্ত্র, সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় (harmony), শান্তি ইত্যাদি মূল্যবোধ। বিকল্প পরিকল্পনার আদর্শ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরমকারণবাদ (telcology)-এর বিরুদ্ধে।

যে বিশ্লেষণ আগের পংক্তিগুলিতে করা হ'ল তার থেকে এটা পরিষ্কার যে সারা বিশ্বের অর্থনীতি ও আর্থিক বিন্যাসের এক মূলগত পরিবর্তন ক'রতে হবে যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সম্পদ এবং আয়ের এক সুষম বন্টন হয় এবং ধনী বিশ্বের, প্রথম ও তৃতীয় বিশ্বের উভয়েরই, অযৌক্তিক ভোগবাদের সংকোচন হয়। এটা হ'লে শিল্পোৎপাদন কমে যাবে এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করার জন্য শক্তি কাঁচা মাল ও প্রকৃতিক সম্পদের ব্যবহারও কমে যাবে। কিছুদিন আগে এক জার্মান অর্থনীতিবিদ ব'লেছেন যে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে এখনই শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন 90% এবং সমস্ত পৃথিবীর 50% কমাতে হবে। উন্নত বিশ্ব নিজের থেকে এটা ক'রবে না। ওদের এটা বাধ্য করাতে হ'লে হয় তৃতীয়

বিশ্বের গরীব দেশগুলোর এক নূতন ঐক্য স্থাপন ক'রতে হবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য নতুবা বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বসে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা।

টমাস মোরের 'ইউটোপিয়ার' মত আমিও নিশ্চিত যে "I'm quite convinced that you'll never get a fair distribution of goods or a satisfactory organizing of human life, until you abolish private property altogether". সারা পৃথিবী জুড়েই এক সাম্য এবং বিচারপূর্ণ সহজ-সরল এবং স্বাবলম্বী সমাজ তৈরি ক'রতে হবে যার আর্থিক ও সমাজনীতি হবে বিকেন্দ্রিক। সেই সমাজের আদর্শ হবে ভোগবাদের বিকল্পে মানুষের মনের সাংস্কৃতিক চাহিদার অপার বিকাশ যা মানুষকে জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতির থেকে আলাদা ক'রেছে। প্রয়োজনের সংজ্ঞা নিরূপণ ক'রতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর চাহিদাকে বর্জন ক'রতে হবে। গান্ধীজি ব'লেছেন "প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে দিয়েছে প্রচুর, কিন্তু লোভ মেটাতে নয়।"

তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক মানুষের জল, জঙ্গল ও জমির অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। শিল্পে যা উৎপাদিত হবে তা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবে। গরীবের হাতে সম্পদ সৃষ্টি হ'লে মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বস্তুসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। সমস্ত মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিশ্ব বাজার-ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের অবাস্তুতান্ত্রিক আহরণ ক্রমেই কমে আসবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রথম বিশ্বের অপ্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী, প্রযুক্তি, শিল্প এবং প্রকল্প যা বৃহত্তর মানবসমাজের মূলগত প্রয়োজন নয় এবং বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে টেকসই নয় তাকে বর্জন ক'রবে।

পরিকল্পনার ভিত্তি হবে টেকসই উন্নয়ন। যে উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নেবে তাকে বর্জন ক'রতে হবে। যথাসম্ভব কম অপূণর্নবীকরণীয় সম্পদ ব্যবহার ক'রতে হবে, পূণর্নবীকরণীয় বিকল্প সম্পদ, যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি জৈব সম্পদের প্রসার ঘটাতে হবে। এমন প্রযুক্তি, বস্তুসামগ্রী এবং তার ব্যবহার বার ক'রতে হবে যা টেকসই, নিরাপদ এবং মানুষের সত্যিকারের মূলগত প্রয়োজন মেটায়, অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যের নয়। এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় আমাদের আনতে হবে যে তৃতীয় বিশ্বেই বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে টেকসই অথচ সাংস্কৃতিক এবং নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে উন্নত এক সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব। এই তৃতীয় বিশ্বেই এখনও বহু মানুষ আছে যারা প্রকৃতির পাঁচটি প্রাথমিক সম্পদ— অরণ্য, মাটি জল, জীববৈচিত্র্য এবং বায়ু আর নিজের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে আছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহ অবস্থান ক'রছে। এদের চাহিদা খুবই কম। এইসব বাস্তুতান্ত্রিক মানুষদের ঐতিহ্যগত প্রজ্ঞাকে আমাদের পূর্ণ আবিষ্কার ক'রে তাদের কৃষি, বাসস্থান, জল, শিল্প এবং ঔষধের জ্ঞানকে স্বীকার ক'রে এক নূতন মাত্রা যোগ ক'রতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, ঐতিহ্য সম্বন্ধে এক অযৌক্তিক রোমান্টিক ধারণার বশবর্তী হওয়া। পুরোনো যুগের সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, শোষণকারী ব্যবস্থা তাকে আমূল পাল্টাতে হবে. কিন্তু এখনও অনেক সাবেকি জ্ঞান, প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং পদ্ধতি তৃতীয় বিশ্বে জীবিত আছে যা আজও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এইসব সাবেকি জ্ঞানকে স্বীকার ক'রতে হবে। তথাকথিত আধুনিকতার গ্রাস থেকে এদের রক্ষা ক'রতে হবে।

তৃতীয় বিশ্ব এবং উন্নত বিশ্বের সাঃ রণ মানুষদের আধুনিক জীবনযাত্রা ও প্রযুক্তির প্রতি এক অন্ধ সংস্কারকে ত্যাগ ক'রতে হবে যা অকিঞ্চিৎকর সব ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য বড়-বড় জল, তাপ ও পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, বৃহৎ-বৃহৎ শিল্পকারখানা, চওড়া রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করে। বড়-বড় বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক চালিত আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী সংস্থার হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে আজ এক বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে টেকসই এবং সামাজিক দিক থেকে সমতাপূর্ণ সমাজের জন্য সংগ্রাম ক'রতে হবে যাতে বৃহত্তর মানবসম্প্রদায়কে তাদের মূলগত প্রয়োজন যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি মেটানো যায়। আসলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আজ "হাইজ্যাক" ক'রেছে পুঁজি ও ভোগবাদ। এদের কবল থেকে মুক্ত ক'রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য এক সুস্থ, শান্তিপূর্ণ, সমতাপূর্ণ এবং টেকসই জীবনাচরণের জন্য ব্যবহার ক'রতে হবে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়ম ও গতিকে জানবার জন্য বিজ্ঞানের যে খোঁজ তা অব্যাহত থাকবে আরও বেশি-বেশি ক'রে। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে যখন প্রযুক্তিতে প্রয়োগ করা হবে তখন হাজারবার ভাবতে হবে ঐ প্রয়োগের কোনও বাস্তুতান্ত্রিক কুফল আছে কিনা। আমাদের এমন এক প্রযুক্তি বেছে নিতে হবে যা অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু উৎপাদন না ক'রে, বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস না ক'রে, বেশির ভাগ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটায়। আধুনিকতার যে মেকি মূল্যবোধ (stereotype) আজ মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজ-মানসে চাপিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে সেই সংস্কৃতির এবং বিকল্প সংস্কৃতি ও শিক্ষা শিশুকাল থেকে সমাজের মধ্যে চাষ ক'রতে হবে যা ভোগসর্বস্ব আধুনিকতাকে বর্জন ক'রবে। এই বিকল্প একদিনে আসবে না বা এমনি আসবে না। এর জন্য চাই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের একত্রিত করা এবং সংগ্রাম। তার সঙ্গে-সঙ্গে চাই বিকল্প সৃষ্টির জন্য সংগ্রাম অর্থাৎ নির্মাণের জন্য সংগ্রাম। বহু স্বয়ংসেবী সংস্থা আজ ভারতে বৃষ্টি জল-সংরক্ষণ, জলবিভাজিকা অঞ্চলের ম্যানেজমেন্ট, গৃহ-নির্মাণের বিকল্প প্রযুক্তি, গ্রামসমাজের তৃণমূল স্তর থেকে বিকেন্দ্রিক পরিকল্পনা, বিকল্প স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে কাজ ক'রছে। এইসব অভিজ্ঞতা থেকে গ্রাম-শহরে নির্মাণের কাজ শুরু ক'রতে হবে সমাজ-বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে। নির্মাণের সংগ্রামও নূতন সমাজ বিপ্লবের সংগ্রাম। তাই "সংঘর্ষ ও নির্মাণ" হবে ভবিষ্যৎ বিকল্প সমাজ পরিকল্পনার কর্মসূচী।

উদ্ভিজ্জ-রসায়ন : কিছুকথা

কালীশংকর মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, রসায়ন-বিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

উদ্ভিজ্জ রসায়ন (Chemistry of Natural Products) এর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। শুধু জ্ঞানান্বেষণের জন্য নয়, মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্ভিজ্জ-রসায়ন চর্চা শুরু ক'রেছিল। সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই। এ কথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি যে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়া কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত ক'রতে হ'লে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিকমত কাজে লাগানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যে কোন দেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হ'চ্ছে তার উদ্ভিজ্জ সম্পদ। সুতরাং মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি যেমন, প্রসাধন দ্রব্য, জামাকাপড়ে রং করার জিনিস, বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ, কীটনাশক বস্তু, কৃষি-কাজের জন্য জমিতে ব্যবহার যোগ্য সার এবং নানান রোগ-নিরাময়ে ভেষজ সামগ্রীর আহরনের জন্য বিভিন্ন গাছ-গাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করে সেই প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত সামগ্রীগুলির প্রধান উপাদান হ'চ্ছে জৈব রাসায়নিক যৌগ এবং ঐ জৈব রাসায়নিক যৌগগুলির গুণাবলীচর্চা ও তাদের গঠন নির্ণয় থেকে সূত্রপাত হয় আধুনিক জৈব রসায়ন বিজ্ঞানের। সত্যি কথা বলতে কি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উদ্ভিজ্জ সম্পদই ছিল জৈব যৌগের একমাত্র উৎস এবং জৈব রসায়নের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কালক্রমে গাছ-গাছড়া থেকে জৈব যৌগের নিষ্কাশন প্রণালীর আধুনিকীকরণ, বিভিন্ন ধরণের যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতিসাধন ও তার সার্থক প্রয়োগ এবং নতুন নতুন ধ্যান-ধারনার উদ্ভাবনের ফলে উদ্ভিজ্জ রসায়নের বিস্তার এতটাই ব্যাপ্তিলাভ করে যে বর্তমানে এই রসায়ন একটি পরিপূর্ণ ও পৃথক বিজ্ঞান শাখায় পরিণত বয়েছে। উদ্ভিজ্জ জৈব যৌগগুলির প্রাচুর্য, তাদের বিভিন্নতা, গুণাবলী বৈচিত্র্য এবং গঠন-বিন্যাসের বিস্ময়কর জটিলতায় উৎসাহিত হ'য়ে নতুন নতুন জৈব যৌগের সন্ধানে বিশ্বের প্রেথিতযশা জৈব রসায়ন বিজ্ঞানীরা উদ্ভিজ্জ-রসায়নের গবেষণায় ব্রতী হন। তাদের আন্তরিক গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক জৈব রসায়নের মৌলিক তত্ত্বসমূহ। অপ্রচলিত কার্বোনিয়াম আয়ন এবং কনফরমেশন জনিত প্রভাব এর ধারণার প্রথম প্রকাশ তো উদ্ভিজ্জ-রসায়ন চর্চা থেকেই। এখানেই শেষ নয়; তারপিন জাতীয় একশ্রেণীর সহজলভ্য উদ্ভিজ্জ যৌগের গুণাবলী চর্চার মাধ্যমে জৈব রসায়নের যে কোন মৌলিক তত্ত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তো এখন অতিসাধারণ ঘটনা। একই গঠন-বিন্যাসের মধ্যে ভিন্ন ধরণের কার্যকরীপুঞ্জের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে কার্যকরীপুঞ্জগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মত সূক্ষ বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা এখন খুব সহজসাধ্য বিষয়।

আবার দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য গবেষণার সাহায্যে জটিল ও বৈচিত্র্যময় জৈব-যৌগগুলির সংশ্লেষ একদিকে যেমন নানান মৌলিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে, অন্যদিকে আবার জৈব রসায়নের

সংশ্লেষণী দিকটিকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ক'রেছে। যেমন বিশেষ ধরণের জৈব যৌগের উপর সঠিক রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে খুব সহজে শারীরবৃত্তীয় সক্রিয় হরমোনে রূপান্তর, হরমোন সংশ্লেষণের প্রচলিত জটিল পদ্ধতিকে সহজতর ক'রেছে। এই প্রসঙ্গে 'হলেরেনা ফ্লুরিবণ্ডা' উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত হলাফাইলিন নামক ষ্টেরয়েড উপক্ষারের গুরত্বপূর্ণ হরমোন— প্রোজেষ্টেরনে রূপান্তর, উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডাইক্লোপোমিথেন দ্রবণ এনক্লোরোসাকসিনিমাইড-এর সাহায্যে রাশিগের অবনমন প্রক্রিয়া
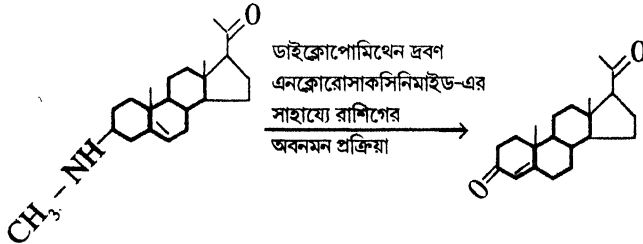
তবু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, রোগনিরাময় ও তার প্রতিরোধে উদ্ভিজ্জ-যৌগের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাসায়নিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ যৌগের কিছু না কিছু ভেষজগুণ আছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিজ্জ যৌগের উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। যেমন রাউলফিয়া গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদে যুগান্তকারী উত্তেজনা প্রশমক বেসারপিন, ইপিকা প্রজাতির গাছে আমাশয় নিবারণকারী এমেটিন, ভিনকারোজিয়ায় লিউকোমিয়ার মত দূরারোগ্য ব্যাধির প্রতিরোধক ভিনব্লাসটিন, ভিনক্রিশটিন ও ভিনকো-লিউকো-ব্লাসটিন, পাপাভার সামনিফেরামে খুবই ফলপ্রদ বেদনা নিরোধক মরফিন এবং প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া রোগে খুবই কার্যকরি ও অন্যতম প্রধান প্রতিষেধক কুইনিন এর সিনকোনা গাছ থেকে আবিষ্কার, বিশ্বজুড়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জৈবরসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে উদ্ভিজ্জ রসায়ন চর্চার একটি নতুন দিক উন্মুক্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা ভাল যে ইদানিং বেশ কিছু ওষুধ গবেষণাগারে তৈরী হ'চ্ছে। কিন্তু সেগুলি এতই ব্যয়বহুল যে, অধিকাংশ সময়েই এই ওষুধগুলি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এছাড়া এই ওষুধগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্যণীয়। এই কারণে যথেষ্ট যত্নসহকারে ও সার্থক সংশ্লেষণী পদ্ধতির প্রয়োগে তৈরী করা সত্ত্বেও গবেষণাগারে তৈরী ওষুধগুলি উদ্ভিজ্জ ভেষজগুলিকে পুরোপুরি স্থানচ্যুত ক'রতে পারেনি, যার ফলে উদ্ভিজ্জ ভেষজগুলির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আজও সমান গুরত্বপূর্ণ। এখনও বাজারে বিক্রয়যোগ্য ওষুধগুলির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ'চ্ছে উদ্ভিজ্জ ভেষজ।

রোগ নিরাময় ও তার প্রতিরোধে কার্যকারিতা ছাড়াও উদ্ভিজ্জ যৌগগুলির কীটনাশক গুণাবলীও সবিশেষ গুরত্বপূর্ণ। পোকামাকড় থেকে শস্যহানি রোধ ক'রতে ইদানিং উদ্ভিজ্জ যৌগগুলির ব্যবহার খুব বেশী ক'রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় শ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকারক এক শ্রেণীর পরাশ্রয়ী জীবাণু-নিমাটোড, বছরে প্রায় পনের লক্ষ টন শস্যহানি ক'রে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাজারে সহজলভ্য সংশ্লেষিত কীটনাশকগুলির ব্যবহার অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং পরিবেশ দূষণকারী তো বটেই। তাছাড়া

এই কীটনাশকগুলিকে নিমাটোড জাতীয় পরজীবী জীবাণুরা অনায়াসে প্রতিরোধ ক'রতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদজাত কীটনাশকগুলির পরিবেশ ও অন্যান্যক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব না থাকায় এবং নিমাটোড শ্রেণীর জীবাণু প্রতিরোধে কার্য্যকরি ভূমিকা পালন ক'রতে সক্ষম হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার খুব জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

এইভাবে উদ্ভিজ্জ রসায়ন নিত্য নতুন পথের সন্ধানে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। আজও জৈব রসায়নবিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ সমান আগ্রহে এই রসায়নে গবেষণা কার্যে যুক্ত আছেন। ইতিমধ্যে অসংখ্য গাছ-গাছড়া নিয়ে রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ করা হ'য়েছে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে উদ্ভিদজাত যৌগগুলির মধ্যে যে ধরণের জটিল ও বিচিত্র গঠন-বিন্যাসের সন্ধান মিলেছে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) ইহোম্বিনয়েড (২) অ্যাসপিডোস্পার্মিন (৩) পেন্টাসাইক্লিকট্রাইটারপিন

(৪) স্টেরয়েড (৫) ফ্ল্যাভোন (৬) ফিউরোকুমারিন

(৭) ক্রমিনোকুমারিন (৮) অ্যানথোসায়ানিন (৯) পিউরিন
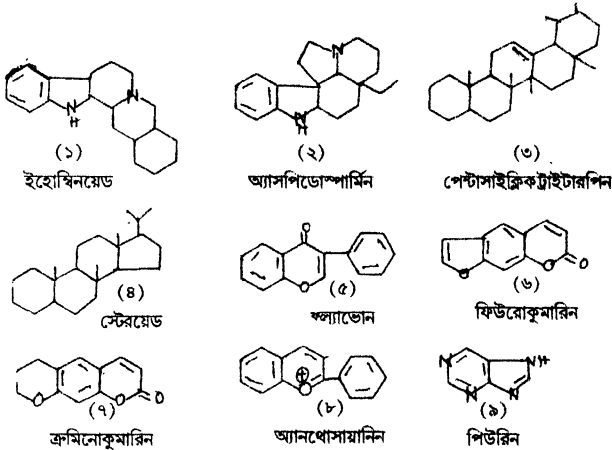
পরিশেষে শান্তিনিকেতনে অতিপরিচিত ও ঐতিহাসিক একটি গাছের রাসায়নিক পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ ক'রলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গাছটির প্রচলিত নাম 'সপ্তপর্ণী' বা 'ছাতিম' আর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যালস্টোনিয়া স্কলাবিস। এটি অ্যাপোসায়ানিসি পরিবারের অ্যালস্টোনিয়া প্রজাতির একটি বড়মাপের বৃক্ষ। দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট ও পরিধিতে আট ফুট এবং ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় জন্মায়। ভারতের পশ্চিম-উপকূলবর্ত্তী এলাকায় এই গাছটি বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ম্যালেশিয়া, বর্মা (বর্তমানে মায়ানামার), শ্রীলংকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং ফিলিপিনসেও বৃক্ষটি পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে ওই গাছটির প্রাচুর্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই এলাকার ছাতিম গাছ দেখে আকৃষ্ট হন এবং কোন একটি বিশেষ গাছের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন হন। আজও সেই ছাতিম বৃক্ষের পাদদেশটি স্বমহিমায় বিরাজমান এবং ঐতিহাসিক "ছাতিম-তলা" নামে পরিচিত। এই ছাতিমতলা ও শান্তিনিকেতন একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবাই যায় না। এই সেই ছাতিমতলা যেখানে প্রতিবছর ৭ই পৌষের প্রাতঃকালে উপাসনার মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবের শুভ সূচনা হয়। এছাড়া বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে কৃতী ছাত্র

ছাত্রীদের 'সপ্তপর্ণী'র পাতা দিয়ে ডিগ্রী প্রদান শান্তিনিকেতনের একটি ঐতিহ্য।

রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে এই বৃক্ষটির বিভিন্ন অংশের নির্য্যাসের ব্যবহারের অনেক তথ্য জানা গেছে। ছাতিম গাছের ছালের জ্বর নাশক গুণ থাকায় ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় স্থানীয় বাসিন্দারা এটি প্রায়শঃ ব্যবহার ক'রে থাকে। এ ছাড়া পেটের গণ্ডগোল, আমাশয়, বিশেষধরণের ক্যানসার এবং হৃদরোগের চিকিৎসাতে এই ছালের রস বেশ উপকারী। ছাতিম পাতার রস বেরিবেরি, যকৃতের গোলমাল, ও ঝিমুনিভাব দূর ক'রতে ফলপ্রদ। স্থানীয় অধিবাসীরা আলসার ও বাতজ ফোলাভাব সারাতে এই গাছের আঁঠা এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা প্রশমনে ফুলের রস ব্যবহার ক'রে থাকে।

রোগ নিরাময়ে উপরোক্ত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ছাতিমগাছ নিয়ে অনেক রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়েছে। পর্য্যবেক্ষণের ফলে এখনও অবধি ছাতিম গাছের বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত জৈব যৌগের সন্ধান মিলেছে, তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হ'লো।

১নং তালিকা : উপক্ষারীয় উপাদান

যৌগের নাম ও আণবিক সংকেত	গঠন-বিন্যাস	উৎস
১. এচিটামিন ক্লোরইড $C_{22}H_{29}N_2O_4Cl$		ছাল, শিকড় এবং শিকড়ের ছাল
২. এচিটামিডিন $C_{20}H_{24}N_2O_3$		ছাল
৩. পিক্রিনিন $C_{20}H_{22}N_2O_3$		পাতা
৪. অ্যাকুয়ামিডিন (র‍্যাজিন) $C_{21}H_{24}N_2O_3$		ফল ও ছাল
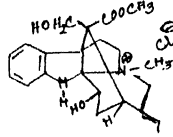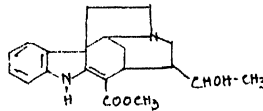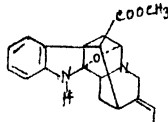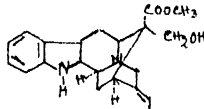
তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ছাতিমগাছে স্পষ্টতই দুটি ভিন্ন শ্রেণীর - (ক) উপক্ষার এবং (খ) টারপিন ও ভিন্ন গঠনের জৈব যৌগ পাওয়া যায়। তাহ'লে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন একটি গাছে যে যে শ্রেণীর ও যে রকম গঠন প্রকৃতির জৈব যৌগ পাওয়া যায়, সেগুলির গাছের অভ্যন্তরে প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব কি না? এ রকম সূক্ষ তাত্ত্বিক প্রশ্নের

যৌগের নাম ও আণবিক সংকেত	গঠন-বিন্যাস	উৎস
৫. পিক্রালিনাল $C_{21}H_{24}N_2O_3$		পাতা
৬. সিউডো-অ্যাকুয়ামিজিন $C_{22}H_{26}N_2O_3$		পাতা
৭. নারক্লিন $C_{20}H_{20}N_2O_4$		পাতা
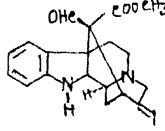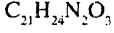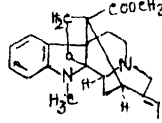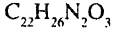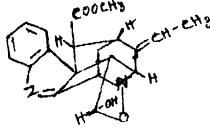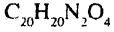
২নং তালিকা : টারপিন উপাদান

যৌগের নাম ও অণবিক সংকেত	গঠন-বিন্যাস	উৎস
১. আলফা-অ্যামাইরিন-অ্যাসিটেট $C_{32}H_{52}O_2$		ছাল
২. লুপিওল অ্যাসিটেট $C_{32}H_{52}O_2$		ছাল
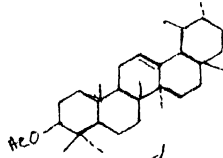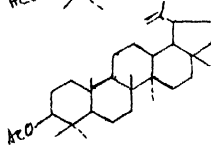
সদুত্তরও মিলেছে উদ্ভিজ্জ রসায়ন চর্চার মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে একটি অত্যাধুনিক তত্ত্বের, যেটা জৈবনিক (বায়োজেনেটিক) মতবাদ নামে পরিচিত। আর এই মতবাদকে অবলম্বন ক'রে উদ্ভিদ-বিদ্যার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - শ্রেণী বিভাজন (Taxonomy) সম্পর্কে। সেই প্রচলিত ধ্যানধারনার বাইরে একটি নতুন চিন্তা-ধারা— রাসায়নিক শ্রেণী বিভাজনে'র (Chemotaxonomy) আত্মপ্রকাশ ঘ'টেছে।

ব্যাক্টেরিয়া : আমাদের উপকারী বন্ধু

সুশীল পাল
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

ব্যাক্টেরিয়া একপ্রকার ক্ষুদ্র জীব। এত ছোট যে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এদের দেখার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যার নাম মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র, যে জন্য এদের মাইক্রো-অরগানিজনম্ বলা হয়। ব্যাক্টেরিয়া হ'ল আদি-জীব (প্রোক্যারিওটিক), এদের দেহকোষ খুবই সরল প্রকৃতির এবং এদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়।

'ব্যাক্টেরিয়া' নামটি মনে এলেই আমরা ভাবি এদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় কারণ এরা শুধু আমাদের অপকার করে, রোগ সৃষ্টি করে। আসলে আমাদের ধারণাটাই ভুল। আমাদের অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা জানি না যে ব্যাক্টেরিয়া আমাদের কত বড় বন্ধু, উপকারী জীব। এদের উপকারের কথা ব'লে শেষ করা যাবে না। সব কথা বলতে গেলে একটি মহাভারত লেখা হ'য়ে যাবে। এককথায়.বলা যায় এরা যদি পৃথিবীতে না থাকতো তাহ'লে অনেকদিন আগেই প্রাণীজগত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত।

ব্যাক্টেরিয়ার উপকারের মাত্র একটি দিক নিয়ে আলোচনা ক'রছি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি উপাদান হ'ল নাইট্রোজেন। প্রায় ৭৮ ভাগ। জীবজগতের জন্য এই নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের এই বিশাল নাইট্রোজেন ভাণ্ডার কোনও কাজেই লাগে না। এই নাইট্রোজেনকে যদি গাছের গ্রহণ করার মত রূপ দেওয়া যায় তবেই সেটা প্রয়োজনে লাগে। আর এই কাজটি ক'রতে পারে একমাত্র বিশেষ ধরনের কিছু ব্যাক্টেরিয়া। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজনকে এরা বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এ্যামানিয়ায় (NH_3) রূপান্তরিত করে এবং এই এ্যামোনিয়া গাছ গ্রহণ ক'রে প্রোটিন তৈরী করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেসন। রাইজোবিয়াম, ক্লস্ট্রিডিয়াম, এ্যাজোটোব্যাক্টর প্রভৃতি ব্যাক্টেরিয়া এই কাজটি খুব ভালভাবে ক'রতে পারে। এদের মধ্যে রাইজোবিয়াম শিমজাতীয় গাছের সাহায্যে নাইট্রোজন ফিক্সেসন করে এবং অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়ার তুলনায় এরা খুব বেশী পরিমাণে ক'রতে পারে। এই সমস্ত ব্যাকেরিয়ায় 'জিফ্ জিন' নামে একটি সক্রিয় জিন আছে, যা নাইট্রোজিনেজ নামে একটি বিশেষ ধরনের এন্‌জাইম তৈরী করে এবং এই এন্‌জাইমটি হ'ল নাইট্রোজেন ফিক্সেসনের আসল হোতা। রাইজোবিয়াম যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ফিক্সেসন করে তাকে বলা হয় সিম্‌বায়োটিক নাইট্রোজেন ফিক্সেসন। রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে বসবাস করে। কোন শিমগাছ যখন মাটিতে লাগানো হয় তখন সেই গাছ থেকে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হ'য়ে মাটিতে মেশে। এই রাসায়নিক পদার্থের আকর্ষণে রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া তখন সেই গাছের মূলরোমের অগ্রভাগের চারপাশে চলে আসে এবং তারা JAA নামক হরমোন নিঃসৃত করার ফলে মূলরোমের অগ্রভাগ দুর্বল হ'য়ে যায় এবং রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া মূলরোমের দুর্বল অংশের মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় এবং কোষ বিভাজনের মাধ্যমে 'infection thread' তৈরী ক'রে শেকড়ের Cortex এর কোষে প্রবেশ

করে। IAA সক্রিয়তায় মূলের কর্টেক্স কোষগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি **পায় এবং কোষের** সংখ্যা **বৃদ্ধির ফলে অর্বুদের (nodule) সৃষ্টি হয়। এই সময়ে** তাদের সাধারণ **গঠন ও বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যতা** দেখা যায়। **ব্যাক্টেরিয়ার এই** অবস্থাকে **'ব্যাক্‌টেরিয়ড'** বলা **হয়।**
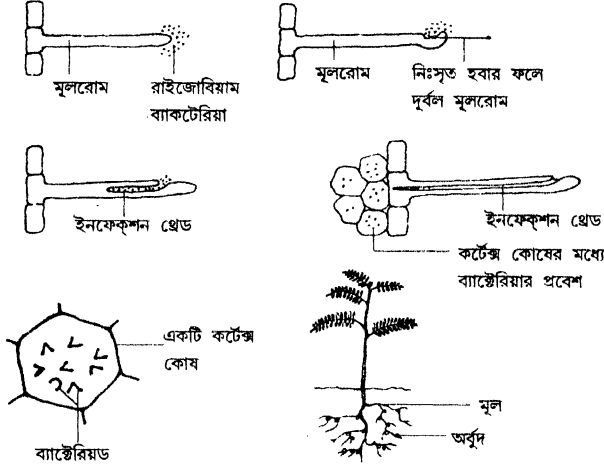
চিত্র ১. অর্বুদ তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়

শিম গোত্রীয় উদ্ভিদেরা ব্যাক্টেরিয়াকে কার্বন ঘটিত পদার্থ সরবরাহ করে। এই কার্বন-যৌগের জারণের ফলে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং ব্যাক্টেরিয়াগুলি ঐ ইলেকট্রন নাইট্রোজিনেজ এনজাইমের সহায়তায় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াম আয়নে বিজারিত করে। অ্যামোনিয়াম আয়ন পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রোজেন যৌগের কিয়দংশ পোষক-উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের উৎস এবং অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকায় নিঃসৃত হয় ফলেমাটি উর্বর হয়।

নাইট্রোজিনেজ এনজাইম অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কাজ ক'রতে পারে না অথচ রাইবোজিয়াম ব্যাকেরিয়ার অক্সিজেন প্রয়োজন। অর্বুদের মধ্যে 'লেগহিমোগ্লোবিন' নামে একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ তৈরী হয় যার কাজ হ'ল নাইট্রোজেন সংবন্ধনের স্থানে অক্সিজেনের উপস্থিতিকে রেগুলেট করা যার ফলে নাইট্রোজিনেজ উৎসেচক সুষ্ঠুভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঘটায়।

জমির উর্বরা শক্তি বাড়াবার জন্য এবং ফসলের অধিক উৎপাদনের জন্য আমরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করি। কিন্তু বহুল পরিমাণে এই সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরা শক্তি ধীরে ধীরে ক'মে যায় এবং প্রকৃতিতে দূষণের পরিমাণ বেড়ে যায়। আমরা যদি রাসায়নিক সারের পরিবর্তে এই সমস্ত ব্যাকেরিয়াকে 'জীবাণু সার' হিসাবে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহ'লে উভয় দিকে উপকৃত হব। জমি উর্বর হবে এবং প্রাকৃতিক দূষণ হবে না। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাক্টেরিয়াকে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ব'লে একে বলা হয় 'জৈব সার' (bio-fertilizer)।

বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই জৈব সারের প্রয়োগ বেড়ে গেছে। কারণ এই সার গবেষণাগারে খুব সহজেই উৎপন্ন করা যায়, রাসায়নিক সারের তুলনায় অনেক সস্তা, সহজেই জমিতে প্রয়োগ করা যায়, রোগ সংক্রমণের হাত থেকে গাছের শেকড়কে রক্ষা করে, মাটিকে দূষণমুক্ত করে।

জৈব সার তৈরী পদ্ধতি : বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে জৈব সারের বহুল প্রচলন হওয়াতে বড়-বড় বহুজাগতিক সংস্থা প্রচুর পরিমাণে এই সার তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'রছে। জৈব সার তৈরী করার প্রথম ধাপ হ'ল শিম-গোত্রীয় গাছের শিকড় থেকে সুস্থ সুগঠিত অর্বুদ যোগাড় করা। অর্বুদগুলি যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করে, গুঁড়িয়ে ভেতর থেকে রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া বের ক'রে 'পেট্রিডিসের' 'YEM-agar' medium-এ ইন্ওকুলেট ক'রে, এদের বৃদ্ধি ঘটানো হয়। এদের বলা হয় 'mother culture'.

পরবর্তী পর্যায়ে এই mother culture থেকে ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে কাঁচের ফ্লাস্কে তরল 'YEM' মিডিয়ামে ইনওকুলেট্ করা হয় এবং ইন্কিউবেটারের সাহায্যে এদের বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে এই ব্যাক্টেরিয়া উৎপাদন ক'রতে হ'লে ফ্লাস্কের তরল মিডিয়াম থেকে এদের তুলে নিয়ে বড় 'সিড্ ট্যাঙ্ক ফারমেণ্টারে' ইনওকুলেট্ ক'রে ৫ থেকে ৮ দিন ধ'রে এদের বৃদ্ধি ঘটানো হয়। এরপর তরল মিডিয়ামসহ ব্যাক্টেরিয়াগুলি উভসমান (neutral) পিট্ বা লিগনাইট বা চারকোল গুঁড়োর সাথে মেশানো হয়। এই গুঁড়োগুলোকে বলে বাহক। এই বাহক পদার্থগুলি ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে ছ' মাস পর্যন্ত কার্যক্ষম ক'রে রাখতে পারে। বাহকসহ ব্যাক্টেরিয়াগুলি পলিথিন থলিতে প্যাকেট ক'রে চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রেখে চাষীদের কাছে বিতরণ করা হয়।
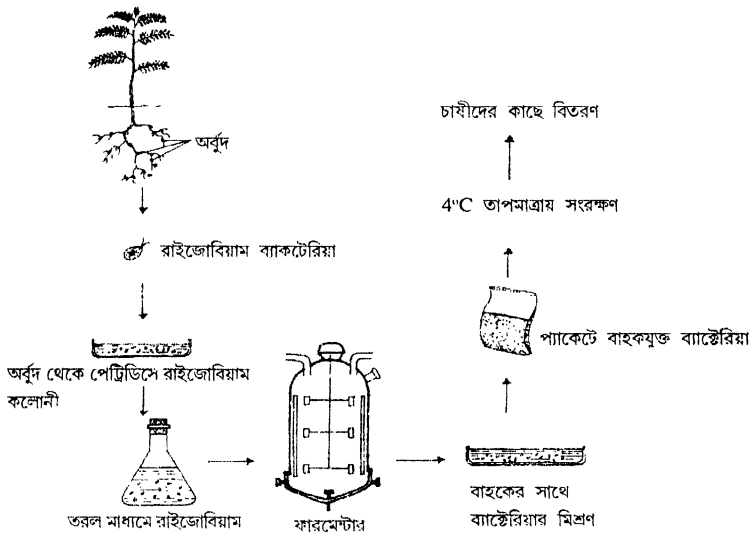
২. বৃহদাকারে জৈব-সার উৎপাদন পদ্ধতি

জৈব সার প্রস্তুতি পর্বে কতগুলি জিনিসের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। অর্বুদ থেকে যখন ব্যাক্টেরিয়া বের করা হয় তখন দেখতে হবে এরা কর্মক্ষম কিনা, নাইট্রোজেন সংবন্ধন করার ক্ষমতা আছে কিনা ইত্যাদি গুণগুলি গবেষণাগারে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রতে হবে। ফারমেণ্টারে বৃদ্ধি করার সময় নজর রাখতে হবে যাতে রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়ার সাথে অন্য ব্যাক্টেরিয়া যুক্ত না হয় তাহ'লে আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। বাহকের মাধ্যমে পলিথিন প্যাকেটের ব্যাক্টেরিয়া কর্মক্ষম আছে কিনা গবেষণাগারে তাও দেখতে হবে, অন্যথায় চাষীরা আশানুরূপ ফল না পেয়ে নিরাশ হ'য়ে যাবে। আসল কথা জৈব সার তৈরী ক'রতে হ'লে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা খুবই জরুরী।

এই পদ্ধতিতে শুধু রাইজোবিয়াম নয় অন্যান্য স্বাধীনজীবী ব্যাক্টেরিয়া যেমন অ্যাজোটোব্যাক্টার, ক্লসট্রিডিয়াম, অ্যাজোস্পিরিলাম ইত্যাদি জৈব সার হিসাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে। জৈব সার হিসাবে আর একটি ব্যাক্টেরিয়ার নাম না-ক'রলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নীলাভ-সবুজ শ্যাওলা (BGA) বা সায়ানোব্যাক্টর। ধানগাছ সাধারণতঃ জলাজমিতে জন্মায়, ধানগাছের গোড়ায় যে জল জমে থাকে তাতে এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এরা সালোক-সংশ্লেষ করে এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনও করে। তার ফলে ধানগাছকে এরা দু'ভাবেই উপকার করে। এরা সংবন্ধনকারী নাইট্রোজেনের কিছু পরিমাণ জৈব-যৌগরূপে মাটিতে মুক্ত করে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ফসলী জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সায়ানো-ব্যাক্টেরিয়ার কৃত্রিম কর্ষণ (culture) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শূন্য শূন্য নয়

আলোকনাথ সেনশর্মা
অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

সূচনা ও উদ্দেশ্য : বর্তমানে গণিতকে বিজ্ঞানের রাণী বলা হয়। "Mathematics is the queen of the sciences and number theory is the queen of mathematics" [C.F. Gauss 1777 AD-1855 AD]. গণিতের এই সম্মান যে শুধু এখন এসেছে এমন নয়, অতীতে ভারতবর্ষে আমরা এই ধরণের উক্তি দেখতে পাই:

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মনয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদান্দ্ব শাস্ত্রানাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্।।
[বেদাঙ্গ জ্যোতিষ— (C 1200 B.C.)]

অর্থাৎ ময়ূরের শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ শাস্ত্রগুলির শীর্ষদেশে গণিতের অবস্থিতি। গণিত তার যোগ্যতাবলে, মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধ করার, মানুষকে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতাবলে, দীর্ঘকাল ধ'রে সমাজে এই স্থান ক'রে নিয়েছে। আজ আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে গণিত এমনভাবে অনুপ্রবেশ ক'রেছে যে আমরা সদাসর্বদা তার ব্যবহার ক'রেও তার অস্তিত্ব ভুলে থাকি— অনেকটা শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌স্পন্দনের মত।

এই গণিতের বর্তমানে প্রধান উপাদান হ'ল— '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0' এই দশটি সংখ্যা (number)। এই দশটি অঙ্ক বা চিহ্নের (numeral) চেহারা বিভিন্ন, ভাষাভাষীদের কাছে বিভিন্ন কিন্তু সংখ্যা হিসাবে এদের ধারণা পৃথিবীর সকল সভ্যসমাজে একই রকম। এই সংখ্যাগুলির সাহায্যে 'স্থানীয় মান পদ্ধতি (place value system)' ব্যবহার ক'রে আমরা যে-কোনো বড় বা ছোট সংখ্যা বোঝাতে বা লিখতে পারি। এই সংখ্যাগুলির উপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া— যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, উদ্‌ঘাতন (involution), অবঘাতন (evolution) প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে সাধারণীকরণের (generalization) মাধ্যমে গণিত এগিয়ে চ'লেছে। এই দশটি সংখ্যার মধ্যে শূন্য (zero) সংখ্যাটি এসেছে সব থেকে শেষে। স্থানীয়মান ভিত্তিক সংখ্যা লিখন-পদ্ধতিতে শূন্য অপরিহার্য। শূন্যসহ এই পদ্ধতিকে আমরা বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। এই বিবর্তনের কিছু আভাস দেওয়া হ'ল, উপস্থিত রচনার উদ্দেশ্য।

বিবর্তন ব'লতে গেলে ইতিহাসকে এড়ান যায় না। আবার ইতিহাস মানেই কিছু সাল-তারিখ এসে পড়ে। কিন্তু গণিতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই সাল-তারিখের অনেকাংশই অনুমানভিত্তিক, সঠিক নয়। অনেক পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ ভারতের গণিতের প্রাচীনত্বকে স্বীকার ক'রতে চান না বরং তাঁদের দেশ থেকেই যে গণিত ভারতে এসেছে তা প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারলে খুশি হন। যেমন আজ প্রায় সকলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে শূন্যসহ দশভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতির (decimal place value system) দ্বারা সংখ্যা লিখন ভারতবর্ষে প্রথম উদ্ভব হয়। যদিও G.R. Kaye প্রমুখ গণিত ঐতিহাসিকগণ সেটা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অন্য দেশ থেকে

ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি এসেছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখনের নিদর্শন যথেষ্টভাবে প্রমাণিত। এমন কি অনেক ঐতিহাসিকের মতে 800 A.D-এর কাছাকাছি এই পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হ'য়েছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকাল নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। ম্যাক্সমূলার মনে করেন এটি 300 B.C.-তে রচিত, বেবর সাহেবের মতে 500 B.C.-তে, ডঃ মার্টন হৌগের মতে 1200 B.C. থেকে 600 B.C.-এর মধ্যে রচিত। ভারতবর্ষে লেখার বা লিপির ব্যবহারের শুরু সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। ওয়েবার, টেলর, বাবলার প্রভৃতির মতে পশ্চিম দেশ থেকে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিপির ব্যবহার ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতার আবিষ্কারের পর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতবর্ষে অন্ততপক্ষে 3000 B.C.-এর আগে লিপির ব্যবহার ছিল, পাশ্চাত্য দেশ থেকে আসেনি। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় কিছু-কিছু লিখিত সংখ্যার চিহ্নের প্রমাণ পাওয়ার ফলে বলা যায় যে ভারতে লিখিত সংখ্যার ব্যবহার তখন থেকেই, পশ্চিম দেশ থেকে প্রাপ্ত নয়। যদিও সেগুলির সঠিক অর্থ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি।

এই তো গেল ভারতবর্ষের অবদান এবং প্রাচীনত্ব নিয়ে ভারতকে হেয় করা প্রবণতার উদাহরণ। অনেক অত্যুৎসাহী ভারতীয় লেখকও আছেন যাঁরা ভারতবর্ষের অবদানের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য এমন কিছু অতিরঞ্জিত কথা বলেছেন যা ভারতবর্ষের গর্বের থেকে ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে বেশী। যেমন মিরাটের স্বামী প্রেস থেকে প্রকাশিত **সূর্য-সিদ্ধান্তের** প্রথম সংস্করণে এর রচনাকাল বলা হ'য়েছে 2165000 বছর আগে, অনুরূপে মনুসংহিতার রচনাকাল 6x71x4320000 বছর আগে। এই সময়ের হিসাবগুলি যে অতিরঞ্জিত তার জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নাই কারণ তখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবই হয়নি। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক গণিতজ্ঞরা স্থান ও পাত্রের প্রতি পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে প্রমাণসাপেক্ষে যাঁরা সত্য তথ্যটি রেখে গেছেন তাঁরাই ইতিহাসের ভরসা— ইতিহাস তাঁদের কাছেই ঋণী থাকবে যুগ যুগ ধ'রে।

আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে সংখ্যাই গণিতের প্রধান উপাদান। কিন্তু এটা সত্য যে গণিত মানেই সংখ্যা নয়। সংখ্যা না থাকলেও গণিত থাকতে পারে। তাই সংখ্যার বিবর্তনের আলোচনার আগে গণিতের সূচনাকাল সংক্রান্ত দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন— যা পরবর্তী কালে সময়ের সীমারেখা টানতে, অতিরঞ্জিত তথ্য থেকে গণিতকে বাঁচাতে এবং গণিতের অর্থ বুঝতে সাহায্য ক'রবে।

পটভূমি : এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র— তার জন্ম আনুমানিক 5×10^{12} বছর আগে। এই সূর্যের গ্রহগুলির মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ যার জন্ম আনুমানিক 5×10^{9} বছর আগে। এই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব আনুমানিক 10^{7} বছর আগে এবং মানুষের আবির্ভাব 5×10^{5} বছর আগে। যতদূর জানা যায় মানুষ আগুনের ব্যবহার শুরু করে আনুমানিক 3×10^{5} বছর আগে। আমরা সূর্যের জন্ম থেকে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়কে **অপ্রাণ-যুগ**, প্রাণের আবির্ভাব থেকে মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়কে **অমানুষিক-যুগ**, মানুষের আবির্ভাবের

সূর্য-সিদ্ধান্তকে আনুমানিক 300 AD-এর কাছাকাছি সময়ে রচিত ব'লে ধরা হয়।

পর থেকে **মানুষিক** এবং আগুনের ব্যবহারের শুরু থেকে **মানবসভ্যতা** শুরু ব'লে ধরতে পারি। কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্ট প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের শুরু প্রথম প্রস্তরযুগ থেকে, যার আরম্ভ সম্ভবত $5x10^4$ বছর আগে থেকে (আনুমানিক 3500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের শুরু থেকেই লিপির ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অঙ্কের শুরু কখন থেকে সেটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে প্রতিষ্ঠিত অঙ্কের সংজ্ঞাকে স্বীকার ক'রে নিলে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে অঙ্কের জন্ম মিলেটাসের থ্যালেস (Thales of Miltetus : C624 BC থেকে C 548 B.C.)-র আগে হয় নি। আমরা আজও দেখতে পাই পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে গাণিতিক নিয়মেই ঘোরে, ইউরেনিয়াম পরমাণু (পারমাণবিক ভর 238.07) গাণিতিক নিয়মই আজও ইউরেনিয়াম-সীসায় (Uranium lead পারমাণবিক ভর 206) রূপান্তরিত হয়; গাছের পাতাবিন্যাস ফিবোনাচ্চি (Fibonacci) শ্রেণী অনুসরণে চলে, গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার হার আলোর তীব্রতা (intensity) ও তাপমাত্রার সম্বন্ধ গাণিতিক নিয়মেই আবদ্ধ। মৌমাছিরা মৌচাকের খোপগুলি তৈরী করার সময় গাণিতিক নিয়মই অনুসরণ করে, দুটি বিন্দুর মধ্যে সরলরৈখিক দূরত্ব সব থেকে কম— এই নিয়ম মেনে গোরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীকে আজও মাঠ পারাপার হ'তে দেখা যায়, শিমপাঞ্জী পাঁচটি বস্তু যে চারটি বস্তুর থেকে বেশী সেটা বুঝতে পারে। আদিম মানুষ পাথরে দাগ কেটে বা নিজের হাতের আঙুলের সঙ্গে মিলিয়ে তার জিনিসের হিসাব রাখত। এইরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যার থেকে প্রমাণ করা যায় যে, প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের আগেও অঙ্কের অস্তিত্ব ছিল। এখন অঙ্কের ইতিহাস থেকে এইগুলিকে বাদ দিলে গণিত ও ইতিহাস উভয়ের উপরেই সুবিচার হবে ব'লে মনে হয় না। অতএব প্রকৃতিতে বিরাজমান ইতিহাসকে স্বীকার ক'রে নিলে গণিতের জন্মকে পৃথিবীর জন্মকাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

অঙ্কের শুরু যখন থেকেই হোক, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে সচেতনভাবে অঙ্কের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হ'য়েছে। চিত্রকলা যা পৃথিবীর সাধারণ ভাষা (universal language) হিসাবে ধরা হয় সেই চিত্রকলা থেকেই জ্যামিতির শুরু। ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ বস্তুর লেনদেন ইত্যাদির প্রয়োজনেই সংখ্যা ব্যবহারের শুরু ব'লে মনে করা হয়।

সৃষ্টিক্ষমতার আধিক্য মানুষকে অন্যসকল প্রাণী থেকে এই পৃথিবীতে পৃথক স্থান ক'রে নিতে সাহায্য ক'রেছে। আজও যেমন অঙ্কের সৃষ্টি হয় মানুষের প্রয়োজনে এবং সৃষ্টির আনন্দে, অতীতেও অঙ্কের জন্মলগ্ন থেকেই সেই একই ঘটনা ঘটে চ'লেছে। তখন সৃষ্টি-আনন্দ উপভোগের চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদেই অঙ্কের সৃষ্টি বেশী হ'য়েছে। ঐতিহাসিকরা বলেন পীথাগোরাস-সমাজ (Pythagoreans C540 B.C.) প্রথম বৌদ্ধিক বা জ্ঞানের আনন্দের জন্য গণিতের চর্চা শুরু ক'রেছিলেন।

আমাদের আলোচনার বিষয় যদিও শূন্যসহ দশ-ভিত্তিক সংখ্যাপ্রকাশ-পদ্ধতির বিবর্তন। তথাপি উপস্থিত আলোচনায় উপরের অংশটি যোগ করার কারণ হ'ল, যে পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনাকে বিচার ক'রতে হবে তার কিছুটা আভাস দেওয়া মাত্র।

সংখ্যার ধারণা : এটা সকলেরই জানা যে, প্রাচীনকালে (4700–1500 B.C.) চারটি নদীর তীরে চারটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নীলনদের তীরে ইজিপ্টিয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, হোয়াংহো নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা এবং সিন্ধু-গঙ্গা নদীর তীরে হিন্দু বা আর্যসভ্যতা। এদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে ঠিকই, তবে প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যে গণিতের ব্যবহারের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। আনুমানিক 4000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধাতুর আবিষ্কার হয়, তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে 3500 B.C. নাগাদ লেখার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সংখ্যার ধারণা ও গণনার উদ্ভব হ'য়েছে নথিভুক্ত ইতিহাস-কালের আগে। এই ধারণার উৎপত্তি সম্বন্ধে সকল ভাবনা-চিন্তা অনুমান-ভিত্তিক। অনুমান করা হয় যে. প্রথমে কম-বেশীর ধারণার উদ্ভব হয় তারপর এক-এক সম্পর্কের (One to one correspondence) উপর ভিত্তি ক'রে, আঙ্গুল, পাথরের টুকরো, কাঠিতে বা হাড়ে বা পাথরে দাগ কেটে, দড়িতে গিঁট প্রভৃতি দ্বারা গণনা কার্য চ'লত। তখন মানুষের প্রয়োজন কম ছিল। টাকা-পয়সার মাধ্যমে লেনদেন-প্রথা চ'লত না, বিনিময় প্রথাতে চ'লত। তাই বড় সংখ্যার ধারণার প্রয়োজন ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার ত্রিশটি আদিম ভাষা নিয়ে আলোচনা ক'রে গবেষকগণ দেখেছেন যে তাদের চারের বেশী সংখ্যার নাম বা চিহ্ন নাই। কোনো-কোনো ভাষায় দুই হ'ল সব থেকে বড় সংখ্যা তার পরই অনেক।

তারপর সম্ভবত: বিভিন্ন শব্দ (word) দ্বারা বিভিন্নসংখ্যক বস্তুকে বোঝান হ'ত। তারপর বিভিন্ন চিহ্ন (mark) দ্বারা বিভিন্ন সংখ্যক বস্তুকে বোঝান আরম্ভ হয়। এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সংখ্যার ধারণা আগে এসেছে, তারপর এসেছে শব্দ দ্বারা বা চিহ্ন দ্বারা সংখ্যার প্রকাশ-পদ্ধতি। যেহেতু ধারণা ও প্রকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই এদের আগে পরে থাকলেও তার মধ্যে সময়ের ব্যবধান টানা সম্ভব নয়।

শব্দ-সংখ্যা (word-number) ব্যবহারের আদিপর্বে একই সংখ্যক বিভিন্ন বস্তুকে বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হ'ত। যেমন দুটি আম, দুটি মানুষ, ইত্যাদির জন্য দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হ'ত, কিন্তু এদের মধ্যে 'দুই' এই সাধারণ ধর্মটি যে বস্তুনিরেপেক্ষ, যেটা বর্তমান সংখ্যা-ধারণার মূল ভিত্তি, সেই ধারণার উদ্ভব হঠাৎ হয়নি— হ'য়েছে ধীরে-ধীরে। এটা মানুষের আগুনের ব্যবহার-কালের সমসাময়িক অর্থাৎ এখন থেকে আনুমানিক 3000,00 বছর আগে ব'লে গবেষকগণ মনে করেন।

যে কতকগুলি অনুমানের কথা বলা হ'ল সেই অনুমানগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। এগুলি লোকালয় থেকে অনেক দূরে বসবাসকারী বর্তমান আদিবাসীদের উপর নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে গবেষণা ক'রে চ'লেছেন তার দ্বারা সমর্থিত।

দলভিত্তিক সংখ্যা গণনা : মানুষের প্রয়োজনে যখন গণনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'তে লাগল তখন সংখ্যা গণনা-পদ্ধতিও ধীরে-ধীরে নিয়মবদ্ধ হ'তে লাগল। ফলে সকল সংখ্যাকে একটি সুবিধাজনক 'মূল দলের (basic group)' ভিত্তিতে প্রকাশ করার চেষ্টা চ'লতে থাকে। 'মূল দল' টিকে নেওয়া হ'ত সুবিধাজনক বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য-করণের (matching) ভিত্তিতে। এই মূল দলটিকে বর্তমানে সংখ্যার 'ভিত্তি (base)' বলা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'দশ' ভিত্তিতে সংখ্যা গণনা করা

হয়। যেমন 21 কে আমরা বাংলায় দুই-দশ-এক বলি, আবার ইংরাজীতে twenty one অর্থাৎ two ten and one বলা হয়। দশ-ভিত্তিক সংখ্যা-গণনা পদ্ধতি পৃথিবীব্যাপী কোন্ সময়ে ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ সঠিক তথ্য এখনও দিতে পারেন নি। আবার এই দশ-ভিত্তিক সংখ্যাপ্রকাশ পদ্ধতির একদিনে উদ্ভব হয় নি। অনেকদিন ধ'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে ভিত্তিটিকে মানুষের সব থেকে সুবিধাজনক ব'লে মনে হ'য়েছে সেটিকে গ্রহণ ক'রেছে, অন্যগুলি কালস্রোতে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। এটা সৃজনশীলতা যা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, এবং প্রয়োজনীয়তার সহাবস্থানের মূল স্বতঃসিদ্ধ।

যাক, আমরা দলভিত্তিক সংখ্যা-গণনার আলোচনায় ফিরে আসি। প্রাচীনকালে দুই-ভিত্তিক, তিন-ভিত্তিক, চার-ভিত্তিক সংখ্যা-গণনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখনও কুইন্সল্যাণ্ড (Queensland)-এর আদিবাসীগণ "এক, দুই, দুই-এক, দুই-দুই এবং অনেক" এইভাবে সংখ্যা গণনা করে। এটি 'দুই ভিত্তিক' সংখ্যা গণনার অস্তিত্বের প্রমাণ। আফ্রিকার কিছু পিগ্‌মি (African Phgmies) এখনও 1,2,3,4,5,6 সংখ্যাগুলির বদলে "এ, ওএ, উএ, ওএ-ওএ, ওএ-ওএ-এ, ওএ-ওএ-ওএ" শব্দগুলি ব্যবহার ক'রে সংখ্যা গণনা করে। টাইয়েরা ডেল ফিউগো (Tierra del Fuego)-এর একদল আদিবাসীও 'তিন-ভিত্তিক' সংখ্যা গণনা করে। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু আদিবাসী 'চার-ভিত্তিক' সংখ্যা গণনা করে বলে সন্ধান পাওয়া গেছে।

'পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতি যে আগে বহুল ব্যবহৃত ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। চেকোস্লোভাকিয়া (Czechoslovakia)-তে বাঘের হাড়ের উপর 50টি দাগ পাওয়া গেছে। এই দাগগুলি পাঁচটি পাঁচটি দলে বিভক্ত। সেই হাড়ের বয়স অনুমান করা হ'চ্ছে প্রায় 30,000 বছর। এখনও দক্ষিণ আমেরিকার একদল আদিবাসী 'হাত' ভিত্তিক সংখ্যা গণনা করে। তারা 1,2,3,4,5,6কে বলে 'এক, দুই, তিন, চার, হাত, হাত-এক' ইত্যাদি। সাইবেরিয়ার যুকাগির (yukaghir) আদিবাসীরা 'মিশ্র-ভিত্তিক' সংখ্যা গণনা করে। যেমন, এক, দুই, তিন, তিন-এক, পাঁচ, তিন-তিন, এক বেশী, দুই-চার, দশে-এক-কম, দশ, দ্বারা আমাদের 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 কে বোঝায়। জার্মান কৃষক পঞ্জিকায় (German Peasant Calendar) 1800 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যা-গণনার পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এই পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতির উদ্ভবের কারণ হিসাবে মনে করা হয় মানুষের দুই হাতে ও দুই পায়ের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি ক'রে আঙ্গুল থাকায় ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য-করণের সুবিধা। পশ্চিম আফ্রিকার বোলান (Balan) এবং বুরামান (Buraman) উপজাতিদের মধ্যে ছয়-ভিত্তিক সংখ্যা-গণনার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ছয়, সাত, আট, নয় এগার ভিত্তিক সংখ্যা-গণনার নিদর্শন খুবই কম।

বারো-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতি (doudecimal system) প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে যে বহুল প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন আমরা এখনও পাই। 12 ইঞ্চিতে এক ফুট, ঘড়িতে ঘন্টার কাঁটার 12টি ঘর, ডজন (dozen) গ্রোস (gross) প্রভৃতি। আগে 12 আউন্সে এক পাউণ্ড, 12 পেন্সে এক শিলিং ইত্যাদি ধরা হ'ত। এই 'বারো-ভিত্তিক' সংখ্যা গণনার উৎপত্তির কারণ হিসাবে যা অনুমান করা হয় তা হ'ল— এক বছরে সাধারণভাবে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সংখ্যা বারটি ক'রে, অথবা 12টি বস্তুকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ অঙ্কের ভাষায় 12-এর অনেকগুলি

গুণনিয়ক যেমন 2, 3, 4, 6 (1 ও 12 বাদে) হ'তে পারে।

কুড়ি-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতিও (vigesimal system) আগে প্রচলিত ছিল, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায়। এখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে বয়স্কদের নিজেদের বয়সের পরিমাণ কুড়ির হিসাবে ব'লতে শোনা যায়, যেমন 62 বছর বয়সকে বলে 'তিন কুড়ি দু বছর'। গ্রীনল্যান্ডে 20কে 'একটি মানুষ', 40কে 'দুটি মানুষ' ইত্যাদি ভাবে বোঝান হয়। মানুষের হাত ও পায়ের মোট আঙুল সংখ্যা কুড়িটি। এটাই কুড়ি-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতির উদ্ভবের একটি কারণ হ'তে পারে। কারণ এখানেও ভিত্তিসংখ্যা (base number) ও কুড়িটি আঙুলের মধ্যে সাদৃশ্যকরণের সুবিধা আছে। অতীতে ব্যাবিলনের (Babylon) অধিবাসীদের মধ্যে '60-ভিত্তিক' সংখ্যা গণনা-পদ্ধতির (sexagesimal system) বহুল প্রচলনের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও সময়ের এবং কোণের পরিমাপের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

পুনরায় আমরা দশ-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতিতে ফিরে আসি। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দশ-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতি চ'লছে। আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে, এই পদ্ধতি পৃথিবীব্যাপী কোন্ সময়ে ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ সঠিক তথ্য এখনও দিতে পারেন নি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে দশ-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা-পদ্ধতি চলে আসছে। অন্য সংখ্যাভিত্তিক গণনা-পদ্ধতি ভারতবর্ষে খুবই কম প্রচলিত ছিল। যজুর্বেদ-সংহিতায় (C 3000 BC) দশের বিভিন্ন ঘাতের সংখ্যার নাম পাওয়া যায়, যেমন এক (10^0), দশ (10^1), শত (10^2), সহস্র (10^3), অযুত (10^4), নিযুত (10^5), প্রযুত (10^6), অর্বুদ (10^7), ন্যার্বুদ (10^8), সমুদ্র (10^9), মধ্য (10^{10}), অন্ত (10^{11}), পরার্ধ (10^{12})। প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ ললিত-বিস্তারে 10^{53} পর্যন্ত সংখ্যার নাম পাওয়া যায়। এই 10^{53} সংখ্যাটিকে 'টল্লকষণ' (Tallaks.an.a) বলা হ'ত। আবার শ্রীধরাচার্যের (750 A.D.) লেখায় দশের বিভিন্ন ঘাতের যে নামগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হ'ল— এক (10^0), দশ (10^1), শত (10^2), সহস্র (10^3), অযুত (10^4), লক্ষ (10^5), প্রযুত (10^6), কোটি (10^7), অর্বুদ (10^8), অব্জ (10^9), খর্ব (10^{10}), নিখর্ব (10^{11}), মহাসরোজ (10^{12}), শঙ্খ (10^{13}), সরিতাপাট (10^{14}), অন্ত্য (10^{15}), মধ্য (10^{16}), পরার্ধ (10^{17})। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এইসময়ে স্থানীয় মান-ভিত্তিক সংখ্যা লেখার পদ্ধতি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দশ ভিত্তিক সংখ্যা গণনার উল্লেখ অন্য দেশেও পাওয়া যায় তার কিছু-কিছু উল্লেখ পরে করা হ'য়েছে।

সংখ্যার প্রকাশ : ধারণা ও তার প্রকাশ প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে চলে। সংখ্যার ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। কিছু-কিছু প্রকাশের পদ্ধতির কথা আগে বলা হ'য়েছে-যেমন দাগ কেটে, শব্দের দ্বারা ইত্যাদি। এছাড়া আরও বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত হ'য়েছে এবং কালক্রমে সেগুলি অবলুপ্তও হ'য়েছে। এই বিবর্তনের মাধ্যমে আজ আমরা 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 এই দশটি অঙ্ক (numeral) দিয়ে স্থানীয়মান পদ্ধতিতে সকল সংখ্যাকে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে পেয়েছি। এই বিবর্তন-ধারার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হ'ল।

ক) আঙ্গুল-সংখ্যা প্রকাশপদ্ধতি :

মধ্যযুগে (C 1100 A.D.—1500 A.D.) মানুষের হাতের দশটি আঙ্গুল দিয়ে 10,000 পর্যন্ত সংখ্যা প্রকাশের পদ্ধতির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। 1,2,3,...9 এবং 10,20,30,...90 সংখ্যাগুলিকে বামহাতের আঙ্গুল দিয়ে এবং 100,200,...900 এবং 1000,2000,3000,...9000 সংখ্যাগুলিকে ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে প্রকাশ করা হ'ত। যেমন বাম হাতের কনিষ্ঠাকে (little finger) অল্প মুড়ে 1 (এক) সংখ্যাকে; অনামিকা (ring finger) ও কনিষ্ঠাকে একসঙ্গে অল্প মুড়ে 2 (দুই) সংখ্যাকে; কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে (middle finger) একসঙ্গে অল্প মুড়ে ও 3 (তিন) সংখ্যাকে বোঝান হ'ত। 4 (চার) সংখ্যাকে বোঝান হ'ত অমামিকা ও মধ্যমাকে পুরো মুড়ে। শুধু মধ্যমাকে পুরো মুড়ে 5 (পাঁচ) সংখ্যাকে; শুধু অনামিকাকে পুরো মুড়ে 6 (ছয়) সংখ্যাকে; শুধু কনিষ্ঠাকে পুরো মুড়ে 7 (সাত) সংখ্যাকে; কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে পুরো মুড়ে 8 (আট) সংখ্যাকে বোঝান হ'ত। ৭ (নয়) সংখ্যাকে বোঝান হ'ত কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং মধ্যমাকে পুরো মুড়ে। এইভাবে চ'লত সংখ্যার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পদ্ধতিকে আঙ্গুল-সংখ্যা পদ্ধতি (finger number system) বলা হয়। এই সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতির সুবিধা হ'চ্ছে এটা ভাষানিরপেক্ষ, কিন্তু প্রধান অসুবিধা হ'ল— স্থায়িত্বের অভাব। তাই এই পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে গণনার কাজ চালান সম্ভব নয়। ফলে লিখিত সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'তে থাকে এবং এই পদ্ধতির অবলুপ্তি ঘটে।

লিখিত সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি আবার বিভিন্ন প্রকার পাওয়া যায়। যেমন শব্দ (word) দ্বারা, বর্ণ (alphabet) দ্বারা, অঙ্ক (numeral) দ্বারা প্রভৃতি। এদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হ'ল।

খ) বর্ণ সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি :

বর্ণ সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতিতে (Alphabatic notetion system) এক-একটি বর্ণ দ্বারা এক-একটি সংখ্যা বোঝান হ'ত। পানিনি (C 700 B.C.) এই পদ্ধতির ব্যবহার ক'রেছেন দেখা যায়। তিনি 1,2,3 কে যথাক্রমে অ, ই, উ দ্বারা প্রকাশ ক'রেছেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বর্ণ সংখ্যা পদ্ধতি তৈরী ক'রেছেন। যেমন আর্যভট্ট-I (499 A.D.) এক ধরনের বর্ণ সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং দশগীতিকাতে ব্যবহার করেন। এই বর্ণ সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণের মধ্যে কখনও প্রসারলাভ করেনি।

গ্রীস দেশে 450 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতিকে Cipheroed numerical system বলা হ'ত। এই পদ্ধতিতে ভিত্তি-সংখ্যা আগে স্থির করা হয়। যদি ভিত্তি-সংখ্যা a হয় যখন a ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, তবে 1,2,3,... a–1, a, 2a, 3a,... (a–1).a, a^2, $2a^2$, $3a^2$...প্রভৃতির জন্য আলাদা-আলাদা বর্ণ ধ'রে নেওয়া হয়। গ্রীসে দশ-ভিত্তিক এই পদ্ধতিতে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 এই 27টি সংখ্যার জন্য 27টি বর্ণ ধ'রে নেওয়া হ'য়েছিল।

যেমন 1-এর জন্য α, এবং 20-এর জন্য k, তাই 21=kα দ্বারা প্রকাশ করা হ'ত। প্রাচীন আরবীয় সিরিয়, হিব্রু, হিন্দু-ব্রাহ্মী সংখ্যাপদ্ধতিও এই সংখ্যা-পদ্ধতির উদাহরণ।

গ) স্থানীয় মান ব্যতীত শব্দ-সংখ্যা প্রকাশ পদ্ধতি:

শতপথ ব্রাহ্মণে এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (C 2000BC) আমরা প্রথম স্থানীয় মান ব্যতীত শব্দ-সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতির (word numeral system without place value) নিদর্শন পাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে (C 1200 BC) সংখ্যার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে শব্দের (word) ব্যবহার পাওয়া যায়। পিঙ্গলার ছন্দ সূত্রেও (C 200 BC) সংখ্যার পরিবর্তে শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন 'গায়ত্রী' শব্দটি 24 সংখ্যাকে বোঝাত, জগতী শব্দটি দ্বারা 48 সংখ্যাকে বোঝান হ'ত, রূপ এবং যুগ শব্দ দুটি 1 এবং 12 সংখ্যা দুটিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হ'য়েছে। তবে স্থানীয় মানের ব্যবহার না থাকায় এই পদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ ক'রতে পারে নি।

ঘ) স্থানীয় মান সহ শব্দ-সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি:

শব্দ-সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতিতে 'স্থানীয় মানে'র প্রয়োগ ক'রে স্থানীয় মান-সহ শব্দ-সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতির (word numeral system with place value)' উদ্ভব সম্ভবতঃ 200 B.C. থেকে 300 A.D.-এর মধ্যে হ'য়েছে ব'লে মনে করা হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত অগ্নিপুরাণে প্রথম এই পদ্ধতির ব্যবহার ক'রে সংখ্যা প্রকাশের নিদর্শন পাওয়া যায়। পৌলিশ সিদ্ধান্ততে (C 400 AD) 1582237800 সংখ্যাটিকে যে শব্দগুলি দ্বারা প্রকাশ করা হ'য়েছে তাহ'ল :

'খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রিপাঃ'

এখানে খ (=0), খ (=0), অষ্ট (=8), মুনি (=7), রাম (=3), অশ্বি (=2), নেত্র (=2), অষ্ট (=8), শর (=5), রাত্রিপ (=1), এটি স্থানীয়মানের সাহায্যে শব্দ দ্বারা সংখ্যা-প্রকাশের একটি নিদর্শন। সেই রকম সূর্যসিদ্ধান্ত (C 300 AD), পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (505 AD) মহাভাস্করীয় (522 AD) লঘুভাস্করীয় (522 AD), ব্রহ্ম-স্ফুট সিদ্ধান্ত (628 AD), ত্রিশতিকা (C 750 AD), গণিত সার-সংগ্রহ (850 AD) প্রভৃতি বইয়ে এই পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখার নিদর্শন পাওয়া যায়। কম্বোডিয়াতে 604 AD-এর শিলালিপিতে প্রথম এই পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে সংখ্যার নামগুলি দিয়েই এই পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখা হ'ত যেমন 54 বোঝাতে লেখা হ'ল চতুঃপঞ্চ, ইত্যাদি। তাই সংখ্যার পরিবর্তে বস্তুর নাম বা অনেকক্ষেত্রে সংখ্যার নাম প্রয়োগ ক'রে, স্থানীয় মান পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে সংখ্যা প্রকাশ ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন বস্তু দ্বারা একই সংখ্যাকে প্রকাশ ক'রেছেন বিভিন্ন লেখক। ফলে অর্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।

ঙ) সরল দলগত সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি:

ইজিপ্টে (3400 BC) এবং ব্যবিলনে (2000 BC) দশ-ভিত্তিক 'সরল-দলগত সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতির (simple grouping system)' নিদর্শন পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে 1, 10, 10^2, 10^3,

10^4, 10^5, 10^6-এর আলাদা চিহ্ন ধরা হ'ত। তারপর কোনো সংখ্যাকে সেই চিহ্নগুলি দ্বারা প্রকাশ করা হ'ত যেন যোগফল সেই সংখ্যার সমান হয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিয়োগ-পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে সংখ্যা প্রকাশকে সহজতর করা হ'য়েছে। ইজিপ্টে ব্যবহৃত এই পদ্ধতির একটি আংশিক উদাহরণ নিচে দেওয়া হ'ল :

সংখ্যা	চিহ্ন
1	1
10	η
10^2	?
10^3	⫠—D ↓ ᗝ

এখন 2 1 3 4 সংখ্যাটিকে এই পদ্ধতিতে লেখা হ'ত :

⫠—D ⫠—D ? η η η 1 1 1 1 এখানে বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হ'ল কিন্তু সেই যুগে ডান দিক থেকে বামদিকে লেখা হ'ত।

রোমান পদ্ধতি যা আমরা বর্তমানেও অনেকক্ষেত্রে সংখ্যা প্রকাশের জন্য ব্যবহার ক'রে থাকি তা একটি সরল দলগত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বর্তমানে 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 কে যথাক্রমে L, V, X, L, C, D, M দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিতে 1943 কে MDCCCCXXXXIII দ্বারা প্রকাশ করা হয়, এখানে যোগ প্রক্রিয়া ব্যবহার ক'রে প্রকাশ করা হ'য়েছে। আবার বিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যবহার ক'রে এই একই সংখ্যাকে MCM XLIII দ্বারাও প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতির কিছু-কিছু প্রচলন এখনও থাকলেও বহুল প্রচলন নেই। কারণ এই পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যাকে প্রকাশের জন্য অনেকগুলি চিহ্নের প্রয়োজন হয় সেটা আগের উদাহরণগুলি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথম উদাহরণে 2134 কে বর্তমানে 4টি অঙ্ক ব্যবহার ক'রে লেখা যায়, কিন্তু সরল দলগত পদ্ধতিতে লিখতে 10টি চিহ্নের প্রয়োজন, দ্বিতীয় উদাহরণেও 1943 কে বর্তমান পদ্ধতিতে 4টি অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা যায়, কিন্তু আলোচ্য পদ্ধতিতে 13টি বা 8টি চিহ্নের প্রয়োজন। তাই এই পদ্ধতি সময় ও স্থানের সাশ্রয় ক'রতে না পারায় ধীরে-ধীরে তা অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে। তবে এই পদ্ধতির একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংখ্যাকে বর্ণ বা শব্দ দ্বারা নয়, চিহ্ন দ্বারা অর্থাৎ আমরা বর্তমানে যাকে অঙ্ক (numeral) বলি তার দ্বারা প্রকাশ করা হ'য়েছে, সেটি আজকের সংখ্যা লিখন-পদ্ধতিকে গড়ে উঠতে সাহায্য ক'রেছে।

চ) গুণন দলগত সংখ্যা প্রকাশ পদ্ধতি:

বড় সংখ্যা প্রকাশে সরল দলগত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য গুণন দলগত পদ্ধতির (Multiplicative grouping system) উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে দলের ভিত্তি-সংখ্যা প্রথম স্থির করা হয়। যদি ভিত্তি সংখ্যা k হয়, যখন k অখণ্ড ধনাত্মক সংখ্যা, তবে 1, 2, 3,...k–1 এর জন্য এবং k, k^2, k^3... ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা চিহ্ন স্থির করা হয়, তারপর গুণন পদ্ধতিতে

কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ সরূপ বলা যায় যদি ভিত্তি-সংখ্যা 10 হয় তবে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই নয়টি চিহ্ন এবং 10, 10^2, 10^3, 10^4...এর চিহ্নগুলি যদি a, b, c, d,...ইত্যাদি ধরা হয় তবে 4514 কে বোঝাতে হবে 4c 5b 1a 4 চিহ্ন দ্বারা। চীন-জাপান সংখ্যা পদ্ধতি হ'ল 10 ভিত্তিক গুণন দলগত সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতির উদাহরণ।

ছ) সংখ্যা চিহ্ন-যুক্ত স্থানীয় মান সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতি:

আগে সংখ্যা প্রকাশের যে পদ্ধতিগুলির আলোচনা করা হ'য়েছে তাতে দেখা যায় সংখ্যার পরিবর্তে বর্ণ, শব্দ, চিহ্ন প্রভৃতি ব্যবহার করা হ'য়েছে। কিন্তু স্থানীয় মান পদ্ধতির ব্যবহার না করায় সংখ্যা যত বড় হবে সংখ্যা-চিহ্নের সংখ্যা তত বাড়াতে হবে। এটা কোনো সংখ্যা লিখন-পদ্ধতির বাস্তব ও তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা। তাই মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পদ্ধতিগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট হ'য়েছে, মানুষ খুঁজেছে এমন কোনো সংখ্যা প্রকাশ-পদ্ধতিকে যাতে মূল সংখ্যা-চিহ্ন হবে সীমিত সংখ্যক এবং সেইগুলির সাহায্যে যে-কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। তার ফলেই আজ আমরা পেয়েছি সংখ্যা চিহ্ন যুক্ত স্থানীয় মান সংখ্যা প্রকাশ পদ্ধতিকে (Positional numeral system)। এই পদ্ধতির ভিত্তি সংখ্যা যদি a হয়— যখন a যে-কোনো অখণ্ড ধনাত্মক সংখ্যা, তবে মাত্র a সংখ্যক সংখ্যা চিহ্ন (numeral) দ্বারা যে-কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে ধ'রে নেওয়া হয় 0, 1, 2,... a–1 এর মধ্যে কোনো-একটা সংখ্যা চিহ্ন k, যদি প্রথম স্থানে (একক) বসে তবে তার মান হবে $1 \times k = a^0 . k$ যদি দ্বিতীয় স্থানে (দশক) বসে তবে তার মান হবে $a^1 . k$ যদি তৃতীয় স্থানে (শতক) বসে তখন মান হবে $a^2 . k$ ইত্যাদি। এইরূপ সব মানগুলির যোগফল সংখ্যাটির মান নির্দেশ ক'রবে। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা-পদ্ধতি (Hindu-Arabic Numeral system) এই পদ্ধতির একটি উদাহরণ, যার ভিত্তি-সংখ্যা হ'ল 10, তাই মাত্র দশটি চিহ্ন 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 দ্বারা এই পদ্ধতিতে সব সংখ্যাকে প্রকাশ করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে $5555 = 5 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5\ 10^0$ বোঝায়।

ব্যবিলনে 3000 B.C. থেকে 2000 B.C. মধ্যে 60-ভিত্তিক 'স্থানীয় মান' সংখ্যা-প্রকাশ পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তখন শূন্যের চিহ্ন অর্থাৎ যে স্থানে 1 থেকে 60-এর মধ্যে কোনো সংখ্যা থাকবে না সেই স্থানটিতে যে সংখ্যা থাকবে তার চিহ্ন না থাকায় লিখিত সংখ্যার পাঠোদ্ধার করা মুশকিল হ'ত। তার পর 300 B.C. নাগাদ শূন্যের চিহ্ন অর্থাৎ দুটি সংখ্যার মধ্যে ফাঁকা স্থান বোঝাতে γγ চিহ্ন ব্যবহার করা হ'ত, কিন্তু কোনো সংখ্যার প্রান্তের ফাঁকা স্থানে কোনো চিহ্ন বসান হ'ত না, ফলে এই পদ্ধতিতে লেখা সংখ্যার পাঠোদ্ধারের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

ময়ান (Mayen) সংখ্যা-পদ্ধতি হ'ল 20-ভিত্তিক স্থানীয়মান সংখ্যা-পদ্ধতি। এর উৎপত্তি কাল জানা যায় না। এই পদ্ধতিতে শূন্যের চিহ্ন ⌓-এর ব্যবহার দেখা যায় এবং সংখ্যা উপর থেকে নীচে লেখা হ'ত। স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশ ক'রতে হ'লে শূন্যের চিহ্ন আবশ্যিক। হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি যা বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ব্যবহার করা হয় তার সম্পূর্ণীকৃত আকারে

অর্থাৎ দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মানের ধারণ ও শূন্য চিহ্নসহ ব্যবহারের নিদর্শন ভারতবর্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সময়ে এই পদ্ধতি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই থেকে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা যে এই পদ্ধতির উদ্ভব ভারতবর্ষে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে হ'য়েছিল। তাঁদের এই ধারণার পিছনে যুক্তি হ'ল গ্রীসে বর্ণ-সংখ্যা (alphabetic number) লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হ'য়েছে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে, কিন্তু সেটা সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য হ'য়েছে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে-অর্থাৎ উদ্ভব ও সাধারণের ব্যবহারের মধ্যে প্রায় আট শত বছরের ব্যবধান। আবার আরবে সংখ্যা লিখন পদ্ধতির উদ্ভব খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, কিন্তু প্রায় ছয়শত বছর পরে এই পদ্ধতি সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য হয়। ইউরোপেও একই অবস্থা। তাই যখন শিলালিপিতে দেখাযায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শূন্যসহ দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ভারতবর্ষে সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য ছিল, তখন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি ভারতে উদ্ভব হ'য়েছে ব'লে ধরলে ভুল হবে না। শূন্য চিহ্নসহ দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ভারতবর্ষ থেকে আরবীয়দের মাধ্যমে প্রায় বারশত খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে যায়। তবে ছাপান পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সংখ্যা-চিহ্নগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ছিল। ছাপান পদ্ধতি আবিষ্কারের (1482 A.D.) পর সংখ্যা-চিহ্নগুলি স্থায়ী আকার নেয়। তাই এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, শূন্য-চিহ্নসহ দশভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ভারতবর্ষে প্রথম হয়, 800 খ্রিস্টাব্দে সেটা ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত ছিল এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন এই পদ্ধতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এটি গণিতজগতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

শূন্য : আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যাকে প্রকাশ ক'রতে গেলে শূন্যের ধারণা অপরিহার্য। এই শূন্যকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়— যেমন শূন্য, খ, গগন, বিন্দু, অম্বর, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, নভ, পূর্ণ, রন্ধ্র, বিষ্ণুপদ, অনন্ত ইত্যাদি। ইংরাজীতে একে বলে zero। পণ্ডিতগণ বলেন শূন্য। শূন্য অর্থাৎ ফাঁকা, এর আরবী শব্দ সিফ্‌র (sifr), তার ল্যাটিন পরিভাষা zephirum, সেখান থেকে হয়েছে zero। আবার খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জোর্ডনাস নেমোররিয়াস (Jordanus Nemorarius-C 1225 AD) বলে একজন গণিতবিদ আরবীয় সিফ্‌র শব্দটি জার্মানীতে Cifer নামে প্রচলন করেন। তার থেকে আজ আমরা Cipher কথাটি পেয়েছি। আবার ব্যাবিলনে 3000 B.C. থেকে 2000 B.C.-এর মধ্যে ষাট-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখা প্রচলিত ছিল, কিন্তু শূন্যের চিহ্ন না থাকায় 300 B.C. পর্যন্ত সঠিকভাবে সংখ্যা লেখা সম্ভব হয়নি। 300 B.C. পরেও সংখ্যার প্রান্তে শূন্য ব্যবহার ক'রতে না পারায় সঠিক সংখ্যা প্রকাশের সম্পূর্ণ অসুবিধা কখনও দূর হয়নি, ফলে সেই পদ্ধতির ব্যবহার-যোগ্যতা কমতে-কমতে অবলুপ্ত হয়।

দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান-পদ্ধতির শূন্য ভারতবর্ষেই উদ্ভব হয় এবং সেটা এসেছে অন্য নয়টি সংখ্যার পরে। অর্থাৎ 0 যেমন মানেও (value) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 থেকে কম তেমনি বয়সেও ছোট, কিন্তু প্রয়োজনে বা বিশেষ গুণমানের (honour) দিক থেকে বিচার ক'রলে শূন্য

অন্য সংখ্যাদের থেকে এগিয়েই। বলা যায় এই দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখনের শূন্যের জন্ম ও কর্ম রহস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই হ'ল এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

শূন্যের জন্ম : শূন্যকে আমরা পৃথিবীতে প্রথম দেখতে পাই ভারতবর্ষে, পিঙ্গলার ছন্দ সূত্রে (C 200 B.C.)। এখানে শূন্য কোনো কিছুর অস্তিত্বের অভাব বা বিয়োগের অস্তিত্ব বোঝাতে ব্যবহার হ'য়েছে, দশ-ভিত্তিক সংখ্যা লিখন-পদ্ধতির দশটি চিহ্নের (numeral) একটি হিসাবে নয়। বাকশালী পুঁথিতে (C 200 A.D.) গণনার মধ্যে শূন্যকে দেখা যায়। এখানে শূন্য সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

পৌলিশ সিদ্ধান্তে (C 400 A.D.) বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (505 A.D.), জীনভদ্র গনির (529 A.D.—589 A.D.) লেখায় সংখ্যা হিসাবে শূন্যের বহুল ব্যবহার পাওয়া যায়। জীনভদ্র গনির লেখায় 'বাইশ চুয়াল্লিশ আট শূন্য' দ্বারা 224400000000 সংখ্যাকে প্রকাশ ক'রতে দেখি। ভাস্কর-I (C 525) তাঁর মহাভাস্করীয় বইয়ে দশভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের দশটি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা হিসাবে শূন্যকে ব্যবহার ক'রেছেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিদ্ধসেন গনির লেখায় 3534400000000 এর বর্গমূল 1880000 বলা হ'য়েছে। এখানেও শূন্য দশটি অঙ্কের একটি অঙ্ক হিসাবে ব্যবহৃত। ভারতীয় গণিতবিদ্‌দের প্রায় সকলের বইয়ে শূন্যের উপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য একটি ক'রে পৃথক অধ্যায় দেখা যায়। মোট কথা বলা যায় যে, দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখনের দশটি অঙ্কের মধ্যে একটি অঙ্ক হিসাবে **'শূন্য'** খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হ'য়েছে।

শূন্যের চিহ্ন : খ্রিস্ট যুগের প্রথম দিক থেকেই ভারতবর্ষে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসাবে ধরা হ'য়েছে এবং তার একটি চিহ্নও ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে তার চিহ্ন কী ছিল সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে যে বাকশালী পুঁথি পাওয়া যায় তাতে শূন্যকে একটি বিন্দু (.) দ্বারা বোঝান হ'য়েছে। কিন্তু এই পুঁথি যখন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রথম রচিত হয় তখনও যে বিন্দু চিহ্ন দিয়ে শূন্যকে বোঝান হ'ত কিনা তা সঠিক জানা যায় না। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা সুবন্ধুর বাসবদত্তাতেও শূন্যকে বিন্দু চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করা হ'য়েছে। তাই বলা যায় শূন্যের প্রথম চিহ্ন বিন্দু (.) ছিল, ছোট বৃত্তাকার যে চিহ্ন আমরা বর্তমানে ব্যবহার করি সেটা নয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জয়বর্ধন-2-এর রাঘোলী শিলালিপিতে শূন্যকে ছোট বৃত্ত (0) আকারে দেখা যায়। এর আগের কোনো সময় থেকে শূন্যকে '0' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ শুরু হ'য়েছে ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সঠিক সময় নির্দেশ করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে পাটীগণিতে অজানা রাশি বোঝাতে '0' চিহ্নটি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। শূন্য চিহ্নের এই ধরনের ব্যবহার আরবীয় গণিত এবং ইউরোপীয় গণিতেও দেখা যায়। এখানে শূন্য ঠিক কোনো সংখ্যা নয়।

তাই বলা যায় যে, কখনও কোনো কিছুর অস্তিত্বের অভাব, বিয়োগের ধারণা, অজানা রাশি, শেষে দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতির দশটির অঙ্কের একটি অঙ্ক হিসাবে শূন্যকে পাওয়া যায়।

একে প্রথম দিকে বিন্দু চিহ্ন (.) দিয়ে, পরে ছোট বৃত্ত (o) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হ'য়েছে এবং বর্তমানে শূন্যের (0) চিহ্নটি সর্বজনগ্রাহ্য চিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত।

শূন্যের গণিত : শূন্যের গণিত (Mathematics of zero) ব'লতে বোঝায় শূন্যের উপর অথবা শূন্য এবং অন্য সংখ্যার উপর গাণিতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, উদ্‌ঘাতন, অবঘাতন প্রভৃতি) প্রয়োগের ফল।

বাকশালী পুঁথিতে প্রথম আমরা শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে পাই। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে শূন্যের যোগ, বিয়োগের নিয়মের উল্লেখ আছে। ভাস্কর-I (C 525 A.D.) এবং ব্রহ্মগুপ্তের (628 A.D.) লেখায় শূন্যের উপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফল স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

কোনো সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যা বিয়োগ ক'রলে বিয়োগফলকে শূন্য ব'লে (বর্তমান গণিতের ভাষায় $x - x = 0$)। শূন্যের এই সংজ্ঞা আমরা ব্রহ্মগুপ্তের লেখায় পাই।

মহাবীর (850 A.D), আর্যভট্ট-2 (950 A.D.), শ্রীধর (C 991 A.D.) ও নারায়ণ (C-1350) প্রভৃতি ভারতীয় গণিতবিদ্‌গণ প্রত্যেকে তাঁদের লেখায় শূন্যের যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার উল্লেখ ক'রেছেন। এঁদের প্রত্যেকের বইয়ে শূন্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য একটি ক'রে আলাদা অধ্যায় আছে। পাটীগণিতে প্রযুক্ত তাঁদের বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলি এবং বন্ধনীর মধ্যে তার বর্তমান গাণিতিক রূপ নীচে দেওয়া হ'ল :

i) শূন্যের সঙ্গে যে-কোনো সংখ্যা যোগ ক'রলে সেই সংখ্যা হবে: $(+a + 0 = a)$

ii) কোনো সংখ্যা থেকে শূন্য বিয়োগ ক'রলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে: $(+a - 0 = a)$

iii) কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ ক'রলে গুণফল শূন্য হবে: $(+a \times 0 = 0)$

iv) শূন্যকে শূন্য ছাড়া কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল শূন্য হবে: $(\frac{0}{+a} = 0)$

মহাবীর $\frac{+a}{0} = 0$ ব'লেছেন অর্থাৎ কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল শূন্য হবে এই প্রক্রিয়াটি তিনি ঠিক বলেননি কিন্তু তাঁর আগে ব্রহ্মগুপ্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ ক'রেছেন শূন্য দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত $0/0 = 0$ ধরেছেন— এটিও ঠিক নয়।

v) শূন্যের যে-কোনো ঘাত শূন্য হবে: ($0^n = 0$ যখন n যে-কোনো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা)

vi) শূন্যের যে-কোনো মূল শূন্য হবে: $\sqrt[n]{0} = 0$ যখন n যে-কোনো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা)

বীজগণিতে শূন্যের প্রয়োগ আমরা প্রথম পাই ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে (628 A.D.)— সেখানে উল্লেখ আছে:

vii) ঋণাত্মক সংখ্যা থেকে শূন্য বিয়োগ ক'রলে ফল ঋণাত্মক হবে: $(-a - 0 = -vc)$.

viii) শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ ক'রলে বিয়োগফল শূন্য হবে: $(0 - 0 = 0)$

ix) কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ ক'রলে গুণফল শূন্য হবে: $(-a \times 0 = 0)$.

x) শূন্যকে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল শূন্য হবে: $(\frac{0}{-a} = 0)$

xi) কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে 'হর'-এ যে শূন্য থাকে তাকে রেখে দিতে হবে: ($\frac{+a}{0} = \frac{+a}{0}$ এবং $\frac{-a}{0} = \frac{-a}{0}$)

ভাস্কর-2 তাঁর লীলাবতী গ্রন্থে (1150 A.D.) লিখেছেন কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে বা গুণ ক'রলে শূন্যকে একইভাবে রাখতে হবে যদি পরবর্তী আরও প্রক্রিয়া চালাতে হয়। তিনি a/0 কে 'খ-হর' এবং a X 0 কে 'খ-গুণ' বলে বর্ণনা ক'রেছেন।

xii) লীলাবতী গ্রন্থে আরও পাওয়া যায় যে শূন্য থেকে কোনো সংখ্যা বিয়োগ ক'রলে সংখ্যাটির চিহ্নের পরিবর্ত্তন হয়: [$0-(+a)=-a$, $0-(-a)=+a$]

xiii) বর্তমানে কলন-বিদ্যায় (calculus) যে অপরিমেয় ক্ষুদ্ররাশির (infinitisimal) ধারণার ব্যবহার করা হয় তার আভাস আমরা ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্কর-2-এর লেখার মধ্যে পাই। শূন্যকে অপরিমেয় ক্ষুদ্ররাশি ধ'রে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে তার ভাগফলের ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। ভাস্কর-2 a/0 সম্বন্ধে ব'লেছেন এটি এমন একটি রাশি যা থেকে যত বড় রাশিই কমান হোক বা যার সঙ্গে যত বড় রাশিই যোগ করা হোক ভাগফলের কোনো পরিবর্তন হবে না, যেমন ভগবান সৃষ্টি ও ধ্বংসের সময় বর্জন ও গ্রহণ ক'রলেও তার পরিবর্তন হয় না। এটি অসীমের (infinity) ধারণার সমতুল। তাই আমরা ব'লতে পারি কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল অসীম হয় ($a/0=\infty$) এটি ভাস্কর-2 জানতেন। কিন্তু ভাস্কর-2 $\frac{a}{0}\times 0=a$ ধ'রে কিছু ভুল প্রমাণ ক'রেছেন। তবে এই ধরনের ভুল 1828 খ্রিস্টাব্দের কোনো-কোনো ইউরোপীয় গণিতবিদ্‌দের লেখাতেও দেখতে পাওয়া যায়। গণেশ তাঁর গণিতমঞ্জরীতে (1356 A.D.) স্পষ্টভাবে ব'লেছেন কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল অসীম হবে। তিনি শূন্যকে অপরিমেয় ক্ষুদ্র সংখ্যা ধ'রে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অতীন্দ্রিয় শূন্য: গণিত অতীন্দ্রিয়বাদের (mysticism) এবং ধর্মীয় অতীন্দ্রিবাদের জন্ম প্রায় একই সময়ে। মাথার উপর নক্ষত্র-খচিত আকাশ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা মানুষকে বিস্মিত ক'রেছিল। ঠিক সেই সময়েই প্রকৃতিতে সহজলভ্য জ্যামিতিক আকারের সুষম বস্তুও মানুষকে বিস্মিত ক'রেছিল এই যুক্তি-গ্রাহ্য ব্যাখ্যাহীন বিস্ময় থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদের জন্ম।

সংখ্যা-অতীন্দ্রিয়বাদের (number mysticism) শুরু কখন সেটা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। 'চার' সংখ্যাটিকে আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতির আদিবাসীরা একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। আজও 'a square man' কথাটি সেই দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। পীথাগোরাসের (pythgoras C 540 B.C.) আগেও আমরা দেখতে পাই 'সাত' সংখ্যাটিকে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও ভয়ের সঙ্গে দেখা হ'ত। সপ্তাহের সাতটি বারের নাম সাত গ্রহের নাম থেকে এসেছে (যদিও রবি এবং সোম গ্রহ নয়, নক্ষত্র এবং উপগ্রহ, তবুও জ্যোতিষে তাদের গ্রহের পর্যায়ে ধরা হয়)।

পীথাগোরাসের সময়কে আমরা সংখ্যা-অতীন্দ্রিয়বাদের প্রস্ফুটিত কাল ব'লতে পারি। পীথাগোরাস সমাজ সংখ্যাকে পূজা ক'রতেন ব'ললে অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁদের মতে 'এক'-সংখ্যাটি হ'ল সব সংখ্যার জনক এবং যুক্তির প্রতীক; 'দুই'-সংখ্যাটি হ'ল নারীর প্রতীক এবং মতামতের প্রতীক; 'তিন' সংখ্যাটি হ'ল পুরুষের এবং সাম্যের প্রতীক— একটা বিভিন্নতা ও একত্বের মিলনের নির্দেশ করে; 'চার'-সংখ্যাটি হ'ল ন্যায় বিচার ও প্রতিশোধের প্রতীক; 'পাঁচ' সংখ্যাটি 'দুই + তিন' অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মিলন বলে বিবাহের প্রতীক; 'ছয়'-সংখ্যাটি হ'ল

সৃষ্টির প্রতীক। এইভাবে বিভিন্ন সংখ্যাকে বিভিন্ন গুণের প্রতীক হিসাবে মনে ক'রেছিলেন তাঁরা। 'দশ'-সংখ্যাটিকে সব থেকে পবিত্র সংখ্যা হিসাবে মনে ক'রতেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক হিসাবে বিশ্বাস ক'রতেন।

পীথাগোরাস সমাজ ছাড়াও আমরা সংখ্যা-অতীন্দ্রিয়বাদের বা গণিত-অতীন্দ্রিয়বাদের অনেক নিদর্শন পাই। যেমন প্লেটোর (C 430 B.C. – 349 B.C.) একটি উক্তি— "The philosopher must be an arithmatician because he has to rise out of the sea of change and lay hold of true being" এটি গণিত অতীন্দ্রিয়বাদের একটা নিদর্শন। এবার প্লেটো তাঁর শেষ রিপাবলিক্ (republic) বইয়ে একটি সংখ্যার কথা উল্লেখ ক'রেছেন, যাকে তিনি বলেছেন, "the lord of better and worse births"। ওই সংখ্যাটিকে 'Platonic number' বলা হয়। গণিত ঐতিহাসিকদের মতে ওই সংখ্যাটি হ'ল $60^4 = 12960000$। আবার প্লেটোর মতে আদর্শ শহরের জনসংখ্যা হওয়া উচিত 5040 (= 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.)। এই সংখ্যাটিকে 'Platonic Naptial Number' বলা হয়। এগুলি সবই সংখ্যা অতীন্দ্রিয়বাদের নিদর্শন। আবার অনেক পরে সেক্সপিয়ারকে (W. Shakespeare, 1564 A.D.—1616 A.D.) ব'লতে শুনি "there is divinity in odd numbers". আজও সংখ্যা-জ্যোতিষে (numerology) ব্যক্তির নাম ও জন্ম তারিখ থেকে ব্যক্তির জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যা গণনা করা হয়। সেই সংখ্যা থেকে ব্যক্তির ভাগ্য, আয়, ব্যয়, বিবাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যা স্থির ক'রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। তাই বলা যায় সংখ্যা অতীন্দ্রিয়বাদ আগেও ছিল আজও আছে।

শূন্যের জন্ম সম্বন্ধে আভাস দেওয়ার চেষ্টা আগের অধ্যায়গুলিতে করা হ'য়েছে। অতীন্দ্রিয় শূন্যের (Mystic zero) আভাস একটু পাওয়া গেছে ঠিক আগের (x iii) অনুঅধ্যায়ে তবে অতীন্দ্রিয়-শূন্যের জন্ম কোথায় এবং কখন বলা সম্ভব নয়। তবে শূন্যের যে ধর্মগুলির নিরিখে শূন্যকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা পরমব্রহ্মের প্রতীক হিসাবে ধরা হয় তার কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

i) ঈশ্বরের গুণ বা স্বভাবের বর্ণনায় একটি সাম্যের আভাস পাওয়া যায়। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, সৎ-অসৎ এইসব বিপরীতধর্মী গুণের মিলনে যে সাম্যাবস্থা সেটি ঈশ্বরের স্বভাব। তাই a এবং (–a) এর মিলনে $[a + (-a) = 0]$ উৎপন্ন শূন্য অর্থাৎ দুই বিপরীতের মিলনে উৎপন্ন ব'লে শূন্যের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়।

ii) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তিনি অতি বৃহৎকেও ক্ষুদ্রে পরিণত ক'রতে পারেন, রাজাকে ভিখারী ক'রতে পারেন আবার ভিখারীকেও রাজা ক'রতে পারেন। শূন্যের মধ্যেও এই গুণ বর্তমান ব'লে অনেকে দেখেন $a \times 0 = 0$ (a যে-কোনো বৃহৎ সসীমরাশি হ'তে পারে) এবং $\frac{a}{0}$ = অসীম, (b যে-কোনো সসীম ক্ষুদ্র রাশি হ'তে পারে)। শূন্যের এই ধর্মদুটিকে শূন্যের সর্বশক্তিমত্তার প্রতীক হিসাবে দেখেন, কারণ এই দুটি ধর্মবলে শূন্য যে-কোনো সসীম বৃহৎ রাশিকে ক্ষুদ্রে পরিণত ক'রতে পারে। আবার যে কোনো ক্ষুদ্র সসীম রাশিকে অসীমে পরিণত ক'রতে পারে। তাই শূন্যের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাবলী বর্তমান ব'লে মনে করা হয়।

iii) আবার ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয় তিনি সবকিছুর মধ্যে থেকেও কিন্তু কোনো কিছুতেই

লিপ্ত নন।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 13 / 32)

অর্থাৎ সর্বব্যাপী আত্মা যেমন সূক্ষ্মতা-হেতু কিছু দ্বারা পৃষ্ঠ হয় না তেমনি পরমাত্মা সর্বদেহে থেকেও কোনো প্রকারে লিপ্ত হন না।

শূন্যের একটি ধর্ম $a = a + 0$ অর্থাৎ a যে-কোনো রাশি হোক তার মধ্যে শূন্য বর্তমান। এই ধর্ম থেকে শূন্যকে পরমাত্মার প্রতীক ব'লে ধরা হয়।

iv) বিজ্ঞানের মতে কোনো বস্তুকে ভাঙতে-ভাঙতে তার একটি অণুতে পৌঁছালে সেই অণুর মধ্যে বস্তুর ধর্মাবলী বজায় থাকে, কিন্তু অণুকে ভেঙে যখন পরমাণু স্তরে আনা হয় তখন সেই পরমাণুর মধ্যে আর বস্তুর ধর্ম বর্তমান থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরকে যতই খণ্ডিত করা হোক তার ঈশ্বরত্ব কখনও নষ্ট হবে না ব'লে ধরা হয়। শূন্যের একটি ধর্ম হ'ল শূন্যকে যে কোনো রাশি দ্বারা ভাগ ক'রলে ভাগফল শূন্য হবে অর্থাৎ $0/a = 0$ (a যে-কোনো বৃহৎ সসীম রাশি হ'তে পারে) শূন্যের এই ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের অখণ্ডতা ধর্মের আভাস পাওয়া যায়।

শূন্যের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক স্থাপন বা শূন্যের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপের প্রবণতা আগেও ছিল এখনও আছে তাই **শূন্যের অপর নাম অনন্ত।**

উপসংহার : বর্তমানে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে শূন্যসহ দশভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনার ও লিখনের প্রথম নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। দশ-ভিত্তিক স্থানীয় মান পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে স্থানে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এর মধ্যে কোনো সংখ্যা থাকবে না সেই স্থানটি পূরণের জন্য অন্য একটি সংখ্যার প্রয়োজন সেই সংখ্যাটি হ'ল শূন্য যার চিহ্ন হ'ল '0'। তাই অন্য সংখ্যার মত শূন্যও একটি সংখ্যা। অন্য সংখ্যার মত শূন্যও গাণিতিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদিতে সমানভাবে অংশগ্রহণ ক'রতে পারে। তাই '0' কোনো অস্তিত্বহীন কাল্পনিক বস্তু নয়। অন্য সংখ্যাগুলি (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) যেমন বাস্তব '0' ঠিক ততটাই বাস্তব। এছাড়া শূন্য সংখ্যাটির কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে। যেমন যে-কোনো সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ ক'রলে বা যে-কোনো সংখ্যা থেকে শূন্য বিয়োগ ক'রলে মূল সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে, কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ ক'রলে বা শূন্য ব্যতীত কোনো সংখ্যা দিয়ে শূন্যকে ভাগ ক'রলে গুণফল বা ভাগফল শূন্য হবে। শূন্য ছাড়া অন্য যে-কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল এক (one) হয়। কিন্তু শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ ক'রলে ভাগফল এক হয় না— এই ভাগফল অনির্ণেয়। আবার শূন্য দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ ক'রলে কোনো নির্দিষ্ট ভাগফল পাওয়া যায় না। এইসব ধর্মের জন্য শূন্যের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয় বা অনেকে শূন্যকে ঈশ্বরের প্রতীক ব'লে কল্পনা করেন।

সবশেষে বলা যায় বর্তমানে প্রচলিত সংখ্যা লিখন-পদ্ধতির শূন্য (0) এই ভারতবর্ষেই প্রথম উদ্ভব হ'য়েছে। অন্য অসংখ্য সংখ্যার মত শূন্যও একটি সংখ্যা। অন্য সংখ্যার থেকে এই শূন্যের বিশেষ কতকগুলি ধর্ম আছে। শূন্যের জন্মস্থান জানা আছে কিন্তু জন্মসময় সঠিক জানা নাই।

তাই জ্যোতিষের দৃষ্টিতে তার রাশিচক্র তৈরী ক'রে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা যাবে না সত্য, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে, এই পৃথিবীতে যতদিন গণিত থাকবে সে ততদিন বেঁচে থাকবে এবং তার জন্মস্থান ভারতবর্ষকেও বাঁচিয়ে রেখে সগর্বে ঘোষণা ক'রবে 'আমি ঈশ্বর কিনা জানিনা— আমি শূন্য (zero) কিন্তু শূন্য (nothing) নই।'

তথ্যসূত্র

1. Boyer, C.B & Merzbach, U.C (1989): A History of Mathematics (2nd, Edition). John Wiley & Sons. New York.
2. Datta. B & Singh, A.N (1962): history of Hindu Mathematics (Single Volume Edition). Asia Publishing House. Calcutta.
3. Eves, H (1969): An Introduction to the History of Mathematics (3rd. Edition). Holt Rinehart and Winston. New York.
4. Guinners, G (Ed) (1994): Companion Encylopaedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Routledge. London.
5. মজুমদার প্রদীপকুমার (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ): প্রাচীন ভারতে গণিত-চর্চা, গ্রন্থমেলা, কলিকাতা।
6. Sensarma. A (2001): A search for Absolute zero of History of Mathematics. Indian Journal of Mathematics Teaching. Vol 27, no.I, pp-1-5
7. Smith, D.E (1958): History of Mathematics (vol-1): Dover Publications, Inc. New York.

মৌলকণা : একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষে

অমিতাভ দত্ত
অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

বিচিত্র বস্তুজগৎ : রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" একখানা দিলে নিমেষে তিনখানা ক'রে আনত। সুযোগ পেলে তিনখানাকে নয়, সাতাশ, একাশি বা একেবারে খান্ খান্ ক'রে ফেলাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ভাঙাভাঙির পালাটা একেবারে শেষ অঙ্কে নিয়ে গেলে এমন কিছু কণা পাওয়া যাবে কি যা একেবারে অবিভাজ্য? যদি যায় তবে তাকে মৌলকণা বলা যেতে পারে।

এই বিচিত্র বস্তু জগতের মূলে কী আছে— এই প্রশ্নটি সেই প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকেই বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকদের ভাবিয়েছে। কখনো-কখনো মনে হ'য়েছে প্রশ্নটির উত্তর বুঝিবা হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন এগিয়েছে মৌলকণার ধারণাও তেমনি বদলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাবা হ'ত কয়েকটি মৌল পরস্পরের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ক'রে অপরূপ বস্তুজগৎ গড়ে তুলেছে। যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে জল, সোডিয়াম আর ক্লোরিন মিলে নুন ইত্যাদি। এইসব যে-কোনো মৌলের ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেওয়া হ'ল পরমাণু। পরমাণুবিদ্‌রা ব'লেছিলেন পরমাণু অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয়। এদের সৃষ্টি অথবা বিনাশ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘণ্টাটি বাজার আগেই কিন্তু প্রমাণ হ'ল পরমাণুর থেকেও সূক্ষ্ম কণা আছে— তাকে বলে ইলেকট্রন (e)।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক : ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন : বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে আবার মনে হ'ল মৌলকণার রহস্যের সমাধান হ'য়েছে। ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর কয়েক দশকের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি ভারী কেন্দ্রীণ যার ভর পরমাণউটির ভরের প্রায় সমান। কেন্দ্রীণের চারদিকে এক ঝাঁক ইলেকট্রন বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন পরমাণুর বাইরে বেরিয়ে যায় না কেন? কারণ কেন্দ্রীণের তড়িদাধান ধনাত্মক আর ইলেকট্রনের ঋণাত্মক। বিপরীত আধানের দুটি কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে মোটামুটিভাবে পরমাণুর ব্যাসার্ধ বলা যেতে পারে। এটি এত ছোট যে তা মাপার জন্য একটি বিশেষ একক ব্যবহার করা দরকার। একে বলে Angstrom (সাংকেতিক চিহ্ন A)। 1 A=10^{-8} c.m. অর্থাৎ 1 c.m.-এর দশকোটি ভাগের একভাগ কেন্দ্রীণটি কিন্তু পরমাণুর তুলনায়-ও অনেক ছোট। কেন্দ্রীণের ব্যাসার্ধ হ'তে পারে বড় জোর কয়েক fermi (1 fermi=10^{-13} cm.)।

ইলেকট্রন নিয়ে বহুমূল্য গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইংলণ্ডের আমেরিকার Sir Joseph Thomson এবং Robert Milikan যথাক্রমে 1906 ও 1923 সালে। আর পরমাণুর গঠনের আবিষ্কারক ইংরেজি বৈজ্ঞানিক Sir Ernest Rutherford ওই পুরস্কার জয় করেন 1908 সালে। আমরা যে কটি নোবেল পুরস্কারের উল্লেখ করব তার প্রায় সব কটি দেওয়া হয় পদার্থবিদ্যায়

গবেষণার জন্য। শুধু Rutherford এই পুরস্কার পান রসায়নের জন্য।

পরমাণুর কেন্দ্রীণে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন (p ও n)। প্রোটনের আধান ধনাত্মক, কিন্তু তার মান ইলেকট্রনের আধানের সমান। নিউট্রন নিস্তড়িত। আবার পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান ব'লে পরমাণুটির কোনো তড়িতাদাধান নেই— এটিও নিস্তড়িত। প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। এই ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় দুই হাজার গুণ। এই জন্যই পরমাণুর ভরের প্রায় সবটুকুই তার কেন্দ্রীণে জমা থাকে। কোনো মৌলের রাসায়নিক ধর্মের বিচারে তার পরমাণুর ইলেকট্রন বা প্রোটন সংখ্যার গুরুত্ব সর্বাধিক। এই সংখ্যাটি-ই মৌলের রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারণ করে। যেমন সবচেয়ে লঘু মৌল হ'ল হাইড্রোজেন। এর কেন্দ্রীণে একটি মাত্র প্রোটন থাকে। কেন্দ্রীণের চারিদিকে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। হিলিয়াম পরমাণু হাইড্রোজেনের তুলনায় চারগুণ ভারী। এর কেন্দ্রীণে থাকে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। নিউট্রন আবিষ্কার ক'রে ইংরেজ বিজ্ঞানী Sir James Chadwick নোবেল পুরস্কার পান 1935 সালে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যদি গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে থমকে দাঁড়াত তাহ'লে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন-ই হ'ত মৌলকণা বিজ্ঞানের শেষ কথা। কিন্তু তা হয় নি। বরং ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের এমন অনেক ধর্ম আবিষ্কৃত হ'য়েছে যার সঙ্গে সাধারণ কথায় আমরা যাকে কণা বলি তার আচরণের কোনো মিল নেই।

প্রথমতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন অপরিবর্তনীয় নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা দানা গিয়েছিল। কোনো-কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রীণে একটি নিউট্রন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীণ থেকে বেরিয়ে আসে একটি ইলেকট্রন ও একটি ভরশূন্য, তড়িৎশূন্য কণা **নিউট্রিনো** (υ)। কেন্দ্রীণে প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তনের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের পরমাণু পাওয়া যায়। আবার গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কেন্দ্রীণে নিউট্রন, প্রোটনের রূপান্তর ঘটিয়ে নূতন মৌলের সৃষ্টিও সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের নিরিখে পরমাণু না অবিভাজ্য না অপরিবর্তনীয়!

আলো না ফোটন : তরঙ্গ না কণা? : মানব চরিত্রের দ্বৈতসত্তা— অর্থাৎ দুটি বিপরীত গুণের সহাবস্থান— আমাদের জানা কথা। ডাঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের গল্প কে না পড়েছে? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন রক্তকরবীর রাজা একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ; পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণের পাশাপাশি অবস্থান। কিন্তু আলোর মধ্যে এমন দ্বৈতসত্তার প্রকাশ কি সম্ভব?

জলের মধ্যে একটি ঢেলা ছুঁড়লে ঢেউ ওঠে। জলকণাগুলি নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে ব'লেই ওই ঢেউ বা তরঙ্গের সৃষ্টি। ঢেলাটার কিছু গতিশক্তি থাকে। জলে পড়ে ঢেলাটা থেমে যায়। কিন্তু তার গতিশক্তি তরঙ্গের মাধ্যমে জলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঢেলাটাও আমাদের হাত থেকে কিছুটা শক্তি বয়ে নিয়ে জলে পৌঁছে দেয়। সাবেকী পদার্থ-বিদ্যা অনুযায়ী কিন্তু শক্তির এই দুই ধরনের যাতায়াতের নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা। ঢেলাটার বেলায় একরকম। তরঙ্গের ক্ষেত্রে আর-এক রকম। জলের কণাগুলো একই জায়গায় থেকে ওঠানামা করে। মোটেই

ঢেলাটার মত এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পৌঁছে যায় না।

সূর্যের মধ্যে যে-সমস্ত বিক্রিয়া হ'চ্ছে তাতে প্রচুর শক্তি উদ্ভূত হয়। এই শক্তির কিছুটা আলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছায়। আলোও তরঙ্গ, কিন্তু অন্য ধরনের। আলোর যাতায়াতের জন্য কোনো বস্তুকণার কম্পনের দরকার হয় না। হ'লে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝের বিপুল শূন্যস্থান পেরিয়ে আলো আমাদের কাছে পৌঁছাত না।

আলোর ঢেউ যখন এগিয়ে চলে তখন গতিপথের প্রতি বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। প্রতি মুহূর্তে ওই ক্ষেত্র দুটি বাড়ে কমে। যে বিশেষ নিয়মে ওই বাড়া-কমা চলে তার সঙ্গে জলের কণা ওঠা-নামার নিয়মের কোনো তফাৎ নেই। এইজন্যই আলোকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বলে।

ধরা যাক কোনো-এক মুহূর্তে একটি বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের মান সর্বোচ্চ। তাহ'লে ওই মুহূর্তেই বিন্দুটি থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর তড়িৎ ক্ষেত্রের মান আবার সর্বোচ্চ হবে। পাশাপাশি এমন দুটি বিন্দুর দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপার জন্য A একক ব্যবহার করা হয়। হলুদ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মোটামুটি 6000A। লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর বেশী, বেগুনীর কম। আরো কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গও আছে যা চোখে দেখা যায় না। এগুলি হ'ল অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি ইত্যাদি। A বা তার কয়েকগুণ হ'তে পারে। অর্থাৎ এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং পরমাণুর ব্যাসার্ধ তুলনীয়। আলোর সামনে একটা অস্বচ্ছ বস্তু ধ'রলে ছায়া পড়ে। আলো সোজাপথে চ'লছিল। বাধা পাওয়ায় বস্তুটির পিছনে আলোকশূন্যতা বা ছায়ার সৃষ্টি হয়। খুব ভালো ক'রে সন্ধান ক'রলে কিন্তু দেখা যায় বাধাটি কুব ছোট্ট হ'লে ছায়ার মধ্যেও খানিকটা আলো পৌঁছেছে। আলো তরঙ্গ না হ'লে কিছুতেই এটা ব্যাখ্যা করা যেত না।

সূর্যের আলোয় একটি বস্তু ফেলে রাখলে খানিক পরে বস্তুটি গরম হ'য়ে ওঠে। আলোর শক্তি শুষে নিয়ে বস্তুটি গরম হ'ল— এটা সহজেই বোঝা যায়। কোনো বিশেষ ধাতুর ওপর আলো ফেললে তা থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। একে বলে **ফটো তড়িৎ বিশ্লেষ**। পরমাণুর কেন্দ্রীণের আকর্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য ইলেকট্রনটির কিছু শক্তি দরকার। সেটা কোথা থেকে এল? আলোক তরঙ্গ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি শুষে নিয়ে ইলেকট্রনটি বেরিয়ে পড়ল— এমন ব্যাখ্যা কিন্তু ধোঁপে টিকবে না। আসলে তরঙ্গের শক্তি অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো থাকে। তার অতি সামান্য এক ভগ্নাংশ ক্ষুদ্র ইলেকট্রনের ভাগে প'ড়বে। অঙ্ক ক'ষে দেখানো যায় প্রয়োজনীয় শক্তিটুকু পেতে ইলেকট্রনের বহু সময় লাগবে। কয়েক ঘণ্টা, এমন-কি কয়েকদিনও লাগতে পারে। বাস্তবে কিন্তু আলো পড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। আরো আশ্চর্যের কথা কোনো-কোনো বস্তুর ওপর তীব্র লাল আলো ফেললেও ইলেকট্রনের দেখা পাওয়া যায় না। অথচ বেগুনী রশ্মি পড়লে পলকের মধ্যে ইলেকট্রন নির্গমন আরম্ভ হয়। সাবেকী পদার্থবিদ্যায় কিন্তু আলোর শক্তির সঙ্গে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে এই মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাখ্যা মেলে না।

ইলেকট্রনের সঙ্গে যদি আর-একটা কণার সংঘর্ষ হয়? তাহ'লে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই কণাটির

শক্তি ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে। এই যুক্তির সূত্র ধ'রেই আইনস্টাইন (Albert Einstein) প্রমাণ করলেন আলোর শক্তি যেন ছোট-ছোট প্যাকেটে ভরা থাকে। প্রত্যেকটি প্যাকেটের শক্তি সমান। এই প্যাকেটগুলিকে তিনি ব'ললেন আলোর **কোয়ান্টাম** বা আলোক কণিকা **ফোটন**। ফোটনের সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘাত হ'লে ইলেকট্রনটি প্রায় তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে বেরিয়ে পড়ে। আলোর তীব্রতার সঙ্গে একটি ফোটনের শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। তীব্র আলোর মধ্যে বেশি সংখ্যক ফোটন থাকে— এই মাত্র বলা যায়। ফোটনের শক্তি নির্ভর করে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে, ফোটনের শক্তি তত বাড়বে। তাই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বেগুনী আলোর ফোটন **ফোটো তড়িৎ বিশ্লেষ** ঘটালেও, লাল আলোর ফোটন তা পারে না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মৌলকণার তালিকায় ফোটনের নাম যোগ হয়। 1921 সালে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান। যেসমস্ত গবেষণার জন্য তিনি এই সম্মান লাভ করেন ফোটো তড়িৎ বিশ্লেষের ব্যাখ্যা তার একটি।

আইনস্টাইনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী Arthur Compton রঞ্জনরশ্মি ও ইলেকট্রনের সংঘাত নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি প্রমাণ করেন, এক্ষেত্রেও রঞ্জনরশ্মির মধ্যে ফোটনের ধর্ম প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সমস্ত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কণা ধর্ম আছে। 1927 সালে Compton নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

কিন্তু তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের যাবতীয় ধর্মের ব্যাখ্যা ফোটনতত্ত্ব দিয়ে করা যায় না। ছায়ার মধ্যে আলো কেমন ক'রে পৌঁছে যায় তা বুঝতে আলোর তরঙ্গ ধর্মের সাহায্য নিতেই হবে। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের এই দ্বৈত চরিত্র আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি মূল স্তম্ভ।

বিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে জার্মানীর Max Planck (নোবেল পুরস্কার 1918 সালে) কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রপাত করেন। Planck প্রমাণ ক'রেছিলেন কৃষ্ণবস্তু থেকে বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে পুঞ্জীভূত শক্তি বা কোয়ান্টাম থাকে। কিন্তু ওই শক্তি যখন তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয় তখনো তার মধ্যে কণাধর্ম থাকে— আইনস্টাইনের এই আবিষ্কার কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করল।

আধুনিক বিজ্ঞানে তরঙ্গ-কণা দ্বৈততাকে কেন্দ্র ক'রে যে তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তাকে বলে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব। আমরা জানি বিপরীত তড়িদাহিত দুটি বস্তু একে অপরকে আর্কষণ করে। একই তড়িদাধানের দুটি বস্তুর মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। আমরা যখন কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করি তখন হাতে ধ'রে বা দড়ি বেঁধে টানি। এর মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দুটি তড়িদাধান মহাশূন্যের মধ্যে রাখলেও তারা পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে বিপুল দূরত্ব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মহাকর্ষজ আকর্ষণ থাকে কেন? সাবেকী পদার্থবিদ্যার সূত্র থেকে এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব-অনুযায়ী দুটি তড়িদাহিত কণার মিথষ্ক্রিয়ার মূলে রয়েছে তাদের মধ্যে অসংখ্য ফোটন কণার বিনিময়। পরমাণুর কেন্দ্রীণের চতুর্দিকে যে ইলেকট্রনটি ঘুরছে তা কেন্দ্রীণের ধনাত্মক প্রোটনের সঙ্গে নিরন্তর ফোটন বিনিময় করছে। ফোটনগুলি যেন তড়িৎ চুম্বকীয় বলের

বাহক। তেমনি মহাকর্ষজ বলের বাহক হ'ল গ্রাভিটন কণা। অবশ্য গ্রাভিটনের কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাণিতিক রূপ এখনো নিখুঁতভাবে জানা যায় নি।

ইলেকট্রন ফোটন মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্র তত্ত্বের নাম কোয়ান্টাম তড়িৎ গতি বিদ্যা। এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় বহু বিজ্ঞানীর অবদান আছে। কিন্তু এই তত্ত্বের চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ইলেকট্রন-ফোটন মিথষ্ক্রিয়ার অনেক আপাত দুর্বোধ্য রহস্যের ব্যাখ্যা দেন তিন বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন আমেরিকার Richard Feynman ও Julean Schwinger এবং জাপানের Sin-Itiro Tomonaga। 1965 সালে এই ত্রয়ী নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হ'ন।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশক : মৌল কণার পরিবারবৃদ্ধি : পরমাণুর ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীণ পরস্পরকে ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়তে পারে না। কারণ তাদের মধ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় আকর্ষণ। কিন্তু কেন্দ্রীণের মধ্যে একাধিক প্রোটন বা নিউট্রন আবদ্ধ থাকে কেন? ধনাত্মক প্রোটনগুলির তো একে অপরকে বিকর্ষণ করার কথা। আর নিস্তড়িৎ নিউট্রনের তো তড়িৎ চুম্বকীয় আকর্ষণ বা বিকর্ষণের ক্ষমতাই নেই!

আসলে কেন্দ্রীণের নিউট্রন প্রোটনগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে যে বলের সাহয্যে তা তড়িৎ চুম্বকীয় বলের থেকে অনেক জোরালো। একে বলে শক্তিশালী বল বা নিউক্লিয়ার বল। দুটি তড়িদাহিত বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব যত বাড়ে পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ততই কমে। যেমন দূরত্ব দুই বা তিনগুণ বাড়ালে পারস্পরিক বল কমে দাঁড়াবে চার ভাগের বা নয় ভাগের এক ভাগ। মহাকর্ষজ বলের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম তড়িৎ চুম্বকীয় বা মহাকর্ষজ বলকে দূরপাল্লার বল বলে। শক্তিশালীর বল কিন্তু স্বল্পপাল্লার বল। দূরত্ব কয়েক fermi বা তার কম হ'লে এই বল ভীষণভাবে সক্রিয় থাকে। বলে পারস্পরিক তড়িৎ চুম্বকীয় বিকর্ষণ— যা তুলনায় দুর্বল— উপেক্ষা ক'রে কেন্দ্রীণের মধ্যে কণাগুলি বাঁধা পড়ে। কিন্তু দূরত্ব বাড়লে এই বলের মান ক্রমশঃ কমে না। একবারে ঝপ্ ক'রে কমে যায়। একটা কেলাসের মধ্যে পরমাণুগুলি সুন্দরভাবে সাজানো। একটির থেকে আরেকটির নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে। এই দূরত্ব মোটামুটি কয়েক A। কেলাসের মধ্যে পরমাণুর এমন সুসংবদ্ধ অবস্থান সম্ভব হয় তড়িৎ চুম্বকীয় বলের প্রভাবে। এই দূরত্ব কিন্তু দুটি পরমাণুর কেন্দ্রীণের কণাগুলির মধ্যে নিউক্লিয়ার বল মোটেই সক্রিয় থাকে না।

তিরিশের দশকে শক্তিশালী বলের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন জাপানের Hideki Yukawa। তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন 1930 সালে। কোয়ান্টাম ক্ষেত্র-তত্ত্ব অনুযায়ী তড়িৎ চুম্বকীয় বলের বাহন হ'ল ফোটন। তেমনি নিউক্লিয়ার বলের বাহন হ'ল **মেসন** কণা। একটি বলের বাহক কণার ভর যত কম তার পাল্লা তত বাড়ে। ফোটন বা গ্রাভিটন ভরশূন্য বলেই তড়িৎ চুম্বকীয় বা মহাকর্ষজ বল দূরপাল্লার। পক্ষান্তরে মেসন কণার ভর আছে বলেই শক্তিশালী বল স্বল্পপাল্লার। অনেক আঁক ক'ষে ইউকাওয়া মেসনের ভর কেমন হ'লে শক্তিশালী বলের স্বল্পপাল্লা ব্যাখ্যা করা সম্ভব তা আবিষ্কার ক'রেছিলেন। তাতে দেখা গেল মেসনের ভর হ'তে হবে প্রোটনের ভরের প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ। চল্লিশের দশকে ইংরেজ বিজ্ঞানী Cocil Powell-এর নেতৃত্বে একদল গবেষক এমন কণা আবিষ্কার করেন। Powell নোবেল জয়ের সম্মান লাভ করেন 1930

সালে। মৌলকণার তালিকায় মেসন এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এরপর যেন মৌলকণা আবিষ্কারের ধূম প'ড়ে গেল। মেসন জাতীয় আরো অনেক কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'ল। তাদের আলাদা-আলাদা নাম। যেমন ইউকাওয়ার মেসনের নাম পাই (গ্রীক অক্ষর - π)। গোড়ার দিকে এক ধরনের মেসন কণার কিছু আচরণ একেবারেই সহজবোধ্য ছিল না। এদের বলা হ'ত আশ্চর্য মেসন (সাংকেতিক নাম K মেসন)। প্রোটন-নিউট্রনের প্রায় সমান ভরের এক ধরনের কণার মধ্যেও আশ্চর্য কণার কিছু লক্ষণ দেখা গেল। এরা হ'ল Λ, Σ ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে এই নূতন কণাগুলি নেহাৎই ক্ষণস্থায়ী। এদের গড় আয়ু এক সেকেণ্ডের কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ বা আরো কম। গবেষণাগারের বিশেষ যন্ত্রে এদের অস্তিত্ব পলকের জন্য ধরা পড়ে মাত্র। পক্ষান্তরে ইলেকট্রণ বা প্রোটন চিরস্থায়ী। মুক্ত নিউট্রনের গড় আয়ু বারো মিনিট। কিন্তু অতেজষ্ক্রিয় মৌলের কেন্দ্রীনের নিউট্রন স্থায়ী। আমাদের দৈনন্দিন জাতের মৌলকণা ব'লতে ইলেকট্রণ, প্রেটন, নিউট্রন আর ফোটন। এই জগতে নূতন কণাগুলির কোনো ভূমিকা নেই। নূতন, নূতন মৌলকণা আবিস্কারের কারণ হ'ল কৃত্রিম উপায়ে এদের সৃষ্টির কৌশল বৈজ্ঞানিকদের আয়ত্তে এসেছে। মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের পরমাণুর মিথষ্ক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এরা প্রতিনিয়ত সৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ অগ্রগতির ফলে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে গবেষণাগারে ইচ্ছামত এদের সৃষ্টি করা যায়। আইনস্টাইনের যে তত্ত্বটি এই সৃষ্টির মূলসূত্র এবং যে যন্ত্রগুলি এই সমস্ত কণার সৃষ্টিশালা পরের অধ্যায়ে তারই আলোচনা।

$E = mc^2$ ও ত্বরক যন্ত্র : দুটি মার্বেলগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। গুলিদুটি দুদিকে ঠিকরে যায়। খুব নিখুঁতভাবে মাপলে দেখা যাবে গুলিদুটির মোট গতিশক্তি সংঘর্ষের আগে যা ছিল, পরেও তাই। এই ধরণের সংঘর্ষকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ। এ জাতীয় মিথষ্ক্রিয়ায় মোট গতিশক্তি সংরক্ষিত হয়।

কখনো, কখনো সংঘর্ষের ফলে গুলিদুটি ভেঙে যেতে পারে। ছিটকে-পড়া টুকরোগুলির গতিশক্তি অবশ্য সংঘর্ষকারী গুলিদুটির মোট শক্তির থেকে কম হবে। তাহ'লে কি এক্ষেত্রে শক্তি সংরক্ষিত হয় না? আসলে গুলিদুটি ভাঙতেও কিছুটা শক্তির দরকার। ওই শক্তিটুকুর সঙ্গে টুকরোগুলির গতিশক্তি যোগ ক'রলে দেখা যায় মোট শক্তি ঠিকই সংরক্ষিত হ'য়েছে। এজাতীয় সংঘর্ষকে বলা হয় অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ।

কোনো কণার ভর ও গতি গুণ ক'রলে পাওয়া যায় কণাটির ভরবেগ। স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক যেকোনো সংঘর্ষেই মোট ভরবেগ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ সংঘাতকারী কণাদুটির মোট ভরবেগ অবশ্যই সংঘর্ষের পরবর্তী কণাদের মোট ভরবেগের সমান।

মৌলকণার সংঘর্ষ এবং তার ফলাফল বিশ্লেষণ মৌলকণা বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। প্রোটনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির একটি ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ঘটলে তা হবে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ। সমীকরণের সাহায্যে লেখা হয়, $e+p \rightarrow e+p$

কিন্তু ইলেকট্রণটির গতিশক্তি ক্রমশঃ বাড়ালে অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ দেখা যায়। ফলে একটি π মেসন বা অন্য কণা উৎপন্ন হতে পারে। যেমন $e+p \rightarrow e+p+\pi$

π মেসনটি অবশ্য নিস্তড়িত হবে। কারণ মিথষ্ক্রিয়ার আগে ও পরে মোট তড়িদাধান এক হ'তে হবে। অর্থাৎ মোট শক্তির মতই মোট তড়িদাধান যে কোনো মিথষ্ক্রিয়ায় সংরক্ষিত হয়।

π –মেসনটি কোথা থেকে এল? ওটি সংঘর্ষকারী প্রোটনের মধ্যে ছিল, ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এসেছে তা বলা যাবে না। কারণ সংঘষের আগে এবং পরে প্রোটনের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখা যায় না। π -এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আইনস্টাইনের সূত্র থেকে।

গতিশক্তি, তাপশক্তি, আলোকশক্তি ইত্যাদি শক্তির বিভিন্ন রূপ। মোট শক্তি অপরিবর্ত্তিত রেখে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হ'তে পারে। আইনস্টাইন প্রমাণ ক'রলেন ভর শক্তির-ই একটি বিশেষ রূপমাত্র। একটি স্থির বস্তুর গতিশক্তি নেই। কিন্তু ভরশক্তি আছে। ভর ও শক্তির এই সমতুল্যতা বোঝান হয় একটি বিখ্যাত সমীকরণের সাহায্যে : $E = mc^2$ অর্থাৎ m ভর, mc^2 শক্তির সমতুল্য (c = আলোর গতিবেগ)। এর পর π মেসনের উৎপত্তি আরও রহস্যময় মনে হয় না। সংঘর্ষের পর c ও p'র মোট গতিশক্তি সংঘর্ষকারী c ও p'র মোট গতিশক্তির থেকে কম। উদবৃত্ত শক্তিটুকু π-এর ভর ও গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আইনস্টাইনের সূত্রটি যেন মৌলকণা সৃষ্টির দ্বার খুলে দিল। প্রথমে এক ঝাঁক ইলেকট্রন বা প্রোটন বা সুবিধামত অন্য কোনো কণা ত্বরান্বিত ক'রে উচ্চ গতিশক্তি সম্পন্ন কণার স্রোত সৃষ্টি। তারপর তার সঙ্গে উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তুর (যার মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন আছে) সংঘর্ষ। এই হ'ল মৌলকণার সৃষ্টি-কৌশল। এই কৌশলে প্রচণ্ড গতিশক্তি ভরে রূপান্তরিত ক'রে এমন কণার সৃষ্টি হ'য়েছে যার ভর প্রোটনের ভরের প্রায় একশো গুণ! যে যন্ত্রের সাহায্যে কণার স্রোত ত্বরান্বিত করা যায় তাকে **ত্বরক যন্ত্র**।

কণা বিজ্ঞানের আদিযুগে অবশ্য যথেষ্ট শক্তির ত্বরক যন্ত্র ছিল না। কিন্তু উচ্চশক্তির মৌলকণার একটি প্রাকৃতিক উৎস আছে। দূর-দূরান্তের নক্ষত্রের ভিতর নানা ধরনের মিথষ্ক্রিয়া অবিরাম চলছে। এর ফলে অগণ্য উচ্চ শক্তির মৌল কণার সৃষ্টি হয়। যেগুলি স্থায়ী কণা তারা বহু আলোকবর্ষ দূরত্ব পেরিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুমণ্ডলের অণু, পরমাণু বা গবেষণাগারে বিশেষভাবে স্থাপিত লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে এদের সংঘর্ষে মৌলকণার উৎপত্তি হয়। প্রথম দিকে এইভাবেই বহু নূতন কণার সৃষ্টি হ'য়েছিল।

ত্বরক যন্ত্রে কণা ত্বরান্বিত করা কিন্তু মুখের কথা নয়। ইলেকট্রন বা প্রোটন তড়িদাহত কণা। প্রথমতঃ একটি তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চ বিভব সৃষ্টি করা দরকার। এই ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে কোনো তড়িদাহিত কণা গেলে তারা ত্বরান্বিত হয়। একটি ইলেকট্রনকে 1 volt বিভব প্রভেদের সাহায্যে ত্বরান্বিত ক'রলে তার যা গতিশক্তি হয়, কণা বিজ্ঞানে সেটাই শক্তির একক। একে বলে 1 electron volt (সংক্ষেপে 1ev)। এর দশলক্ষ গুণ শক্তি হ'ল 1electron volt (সংক্ষেপে 1M e v)। 1M eV'র হাজার গুণ শক্তিকে বলে 1giga electron volt (সংক্ষেপে 1Ge V)। সর্বাধুনিক ত্বরক যন্ত্রে কয়েক Te V শক্তির কণার স্রোত পাওয়া যায় (1 Te V = 1000 Ge V)।

1Ge V বা আরো বেশি শক্তির কণা সরাসরি উৎপন্ন করার মত বিভব প্রভেদ গবেষণাগারে সৃষ্টি করা অসম্ভব। তবে অতি উচ্চ মানের বিভব প্রভেদ সৃষ্টি ক'রে তার ভিতর দিয়ে একই কণার স্রোত বারবার নিয়ে গেলে কণাগুলির শক্তি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এজন্য কণার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়। চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে তড়িদাহিত কণার স্রোত প্রবাহিত হ'লে তার গতিপথ বেঁকে যায়। বিপুলাকৃতি আধুনিক ত্বরক যন্ত্রের মধ্যে থাকে নানারকম জটিল তড়িৎ এবং চুম্বক ক্ষেত্র। ক্ষেত্রগুলির প্রভাবে কণার স্রোত সাধারণতঃ একটি বৃত্তাকার পথে প্রবাহিত হয়। বৃত্তটির পরিধি বিশাল— বেশ কয়েক কিলোমিটারও হ'তে পারে।

এই ধরনের ত্বরক যন্ত্রের জনক আমেরিকার Ernest Lawrance। 1939 সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

মৌলকণার মিথষ্ক্রিয়া কতগুলি নিয়ম মেনে চলে। শক্তি, তড়িদাধানের সংরজ্ঞণ সূত্র আগেই আলোচনা করা হ'য়েছে। এইজন্য যে-কোনো মিথষ্ক্রিয়ার নূতন কণার সৃষ্টি সম্ভব নয়। আধুনিক ত্বরক যন্ত্রে সাধারণতঃ দুইটি বিপরীতমুখী কণার স্রোতের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। একটি স্রোতে থাকে কণা। অন্যটিঅতে তার বিপরীত-কণা। এ জাতীয় সংঘর্ষে সব সংরক্ষণ সূত্র মেনেও নূতন-নূতন কণা সৃষ্টি সম্ভব।

বিপরীত-কণা কী? প্রতিটি তড়িদাহিত কণার বিপরীত-কণা আছে। বিপরীত-কণার ভর কণার সমান। কিন্তু তড়িধান বিপরীত। যেমন ঋণাত্মক ইলেকট্রনের বিপরীত-কণা পজিট্রন (e^+) ধনাত্মক। আবার প্রোটনের বিপরীত কণা ঋণাত্মক বিপরীত-প্রোটন ($\bar{p}$)। তড়িৎ শূন্য নিউট্রনেরও কিন্তু বিপরীত কণা আছে। আসলে তড়িদাধান না থাকলেও নিউট্রনের আর এক ধরনের আধান আছে। তাই এমন হয়। ফোটনের কিন্তু কোনো ধরনের আধান-ই নেই। অতএব এর বিপরীত-কণাও নেই। পজিট্রন আবিষ্কারের জন্য আমেরিকার Carl Anderson নোবেল পুরস্কার পান 1936 সালে। বিপরীত-প্রোটন আবিষ্কার করে 1959 সালে নোবেল জয় করেন দুজন আমেরিকান : Emilio Segre এবং Chamberlain।

বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে জেনিভার CERN গবেষণাগারে প্রোটন এবং বিপরীত-প্রোটন স্রোতের সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এর ফলে W, Z প্রভৃতি কণা আবিষ্কৃত হয়। এদের ভর প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের প্রায় ১০০ গুণ। এজন্য দুজন বৈজ্ঞানিক 1984 সালে নোবেল জয় করেন। এঁরা হলেন ইতালীর Carlo Rubbia এবং হল্যাণ্ডের Simon Van Der Meer।

আমেরিকার শিকাগোর কাছে Firmi National Accelarator Centre-এ একটি ত্বরক যন্ত্র আছে। এখানেও প্রোটন ও বিপরীত-প্রোটনের সংঘর্ষ নিয়ে গবেষণা চলছে। সংঘাতকারী কণা দুটির শক্তি মোট দুই Te V। এটিই আজকের দিনের সবচেয়ে শক্তিশালী ত্বরক যন্ত্র।

একবিংশ শতাব্দীর মৌলকণা বিজ্ঞান আরো অনেকটা এগিয়ে যাবে। এজন্য CERN গবেষণাগারে একটি বৃহৎ ত্বরক যন্ত্র বসানো হবে। নাম Large Hadron Collider। এখানে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষ নিয়ে পরীক্ষা চলবে। সংঘর্ষকারী দুটি কণার মোট শক্তি 14 Te V।

উচ্চ শক্তির ত্বরক যন্ত্রের একটি উপযোগিতা হ'ল নূতন-নূতন মৌলকণার সৃষ্টি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে উচ্চশক্তির কণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এরা অতি ক্ষুদ্র বস্তুর

আভ্যন্তরীণ গঠন বিশ্লেষণ ক'রতে পারে। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এটি আলোচিত হবে।

কোয়ার্ক : উচ্চ শক্তির ত্বরক যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে মৌলকণা বিজ্ঞানে সাড়া প'ড়ে যায়। নিত্য নূতন মৌলকণা আবিষ্কার হ'তে থাকে। প্রোটন, নিউট্রন, π, κ, Λ, Σ ইত্যাদি কণার শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া দেখা যায়। মিলিতভাবে এদের নাম হ্যাড্রন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হ্যাড্রনের তালিকায় ছিল হাতে গোণা ক'টি নাম। ছয়ের দশকে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াল কয়েক শো। মৌল কণা— যা সমস্ত বস্তু জগতের মূলে আছে— সংখ্যায় কয়েকটি হ'লে তাদের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যদি কয়েকশো হয়? তখন সন্দেহ জাগে। তাহ'লে কি এরা আরো ছোট কণা দিয়ে তৈরী? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন মার্কিন পদার্থবিদ Murray Gell-Mann।

Gell-Mann বলেন প্রোটন, নিউট্রন, π মেসন, আশ্চর্য কণা ইত্যাদির যাবতীয় হ্যাড্রনের উপাদান হ'ল তিনটি কোয়ার্ক এবং তাদের বিপরীত-কণা। কোয়ার্কগুলির সাংকেতিক চিহ্ন u (up) d (down) এবং s (strange)। বিপরীত-কোয়ার্কের সাংকেতিক চিহ্ন $\bar{u}$, $\bar{d}$ এবং $\bar{s}$।

কোয়ার্ক তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটনের উপাদান দুটি u এবং একটি d কোয়ার্ক। নিউট্রনের মধ্যে আছে দুটি d এবং একটি u কোয়ার্ক। তেমনি মেসনগুলি একটি কোয়ার্ক ও একটি বিপরীত কোয়ার্ক দিয়ে গড়া। কোনো কণার উপাদানের মধ্যে এক বা একাধিক আশ্চর্য কোয়ার্ক (S) থাকলে তারা হবে κ, Λ, Σ প্রভৃতি আশ্চর্য কণা। এই তত্ত্বের সাহায্যে Gell-Mann কণাগুলির ভর নিয়ে কয়েকটি সমীকরণ লেখেন। কণাগুলির পরীক্ষালব্ধ ভর সমীকরণে বসিয়ে দেখা গেল সমীকরণগুলি একেবারে নির্ভুল। তিনটি S-কোয়ার্ক দিয়ে গড়া কোনো কণার হদিশ তখনো পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোয়ার্ক তত্ত্ব সঠিক হ'লে এমন একটি কণা অবশ্যই থাকার কথা। নিজের সমীকরণের সাহায্যেGell-Mann এ হেন কণার ভরের পূর্বাভাষও দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে Ω- মেসন আবিষ্কৃত হয়। তখন দেখা গেল ওই পূর্বাভাষ একেবারে সঠিক। 1969 সালে Gell-Mann নোবেল পুরষ্কার জয় করেন।

কোয়ার্ক তত্ত্ব কিন্তু কতগুলি প্রচলিত ধারাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সেকালে ইলেকট্রনের তড়িদাধানকেই সমস্ত মৌলকণার আধানের একক বলে মানা হ'ত। অর্থাৎ সে যুগে আবিষ্কৃত মৌলকণাদের তড়িদাধান ছিল এর সমান, দ্বিগুণ ইত্যাদি। কিন্তু হ্যাড্রনগুলি কোয়ার্ক দিয়ে গড়া এটা মানলে স্বীকার ক'রতেই হয় কোয়ার্ক-এর তড়িদাধান ইলেকট্রনের আধানের ভগ্নাংশ মাত্র। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক তড়িদাধানের সংকেত চিহ্ন - e। তাহ'লে u, d এবং s কোয়ার্কের তড়িদাধান হবে $^{2}/_{3}e$, $-^{1}/_{3}e$ এবং $-^{1}/_{3}e$। প্রোটন ও নিউট্রনের উপাদান যথাক্রমে udd এবং ddu। কোয়ার্কগুলির আধান যোগ ক'রলে দেখা যাচ্ছে প্রোটনের তড়িদাধান +e এবং নিউট্রন তড়িৎশূন্য।

কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গবেষণাগারে এমন কোনো কণা সৃষ্টি করা যায় নি যার আধান ইলেকট্রনের ভগ্নাংশ হবে। কোয়ার্কগুলি যেন প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কিছুতেই বাইরে আসতে চায় না! কোয়ার্ক তত্ত্বের প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন এদের মিথস্ক্রিয়ার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে এরা হ্যাড্রন কণার মধ্যে চিরতরে আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এমন মিথস্ক্রিয়ার গাণিতিক রূপ কি হ'তে পারে তা পুরোপুরি জানা নেই।

এই সমস্ত কারণে প্রথমদিকে অনেকেই কোয়ার্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। এমনকি Gell-Mann যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন কারণ হিসাবে কোয়ার্ক তত্ত্বের উল্লেখও ছিল না। কারণ হিসাবে বলা হয় "For his contributions and discoveries concerning the classification of elementary particles and their interactions"। পরবর্তীকালে কিন্তু পুরস্কারদাতাদের এই রক্ষণশীল মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে হ'ল।

গভীর অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ : কোয়ার্ক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা : বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণুর কেন্দ্রীণের সংঘর্ষ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। ইলেকট্রনের গতিশক্তি অপেক্ষাকৃত কম হ'লে সংঘর্ষের ফলাফল দেখে মনে হয় যেন দুটি বিন্দুসদৃশ কণার স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটছে। কণাগুলির কোনো আভ্যন্তরীণ গঠন নেই।

ইলেকট্রনগুলির গতিশক্তি কয়েকশো MeV হ'লে কিন্তু একটু অন্য ধরনের ফল পাওয়া যায়। তখন মনে হয় ইলেকট্রনগুলি যেন কয়েকটি তড়িদাহিত গোলক থেকে ঠিকরে যাচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র হ'লেও এই সব গোলকের ব্যাসার্ধ মাপা যায়। ব্যাসার্ধের মান কয়েক fermi মাত্র (1 fermi = 10^{-13}cm)। এর ফলে প্রমাণ হ'ল প্রোটন বা নিউট্রন বিন্দুসদৃশ কণা নয়। এদের অভ্যন্তরীণ গঠন আছে। এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকার Robert Hofstadter। তিনি 1961 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের ত্বরক যন্ত্রে 1 Ge V বা আরো শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের স্রোত পাওয়া গেল। এদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রোটন বা নিউট্রন লুপ্ত হ'য়ে একাধিক মৌলকণার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই সংঘর্ষ অস্থিতিস্থাপক। উপরন্তু ঠিকরে পড়া ইলেকট্রনগুলি পরীক্ষা ক'রলে প্রমাণ হয় এদের সঙ্গে যেন বিন্দুসদৃশ কোনো কণার সংঘর্ষ হ'য়েছে। এই কণাগুলিই প্রোটন বা নিউট্রনের উপাদান। বিপুল গতিশক্তির এই ইলেকট্রনগুলি প্রোটন বা নিউট্রনের গভীরে গিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ গঠন বিশ্লেষণ করে। এইজন্য এ জাতীয় মিথষ্ক্রিয়াকে বলে গভীত অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (deep inelastic scattering)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিউট অফ্ টেকনোলজি (সংক্ষেপে M.I.T) এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা মিলিতভাবে এই গবেষণা করেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় প্রোটন বা নিউট্রনের ভিতরকার এই কণাগুলির তড়িদাধান এবং অন্যান্য ধর্ম Gell-Mann-এর কোয়ার্কের অনুরূপ।

গভীর অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের বিশ্লেষণ ক'রে কোয়ার্কদের মিথষ্ক্রিয়ার কিছু-কিছু নিয়ম কানুন জানা গেছে। তিনটি কোয়ার্ক পরস্পরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া ক'রে কেমনভাবে প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকে তা এখনো অস্পষ্ট। কিন্তু কোয়ার্কের সঙ্গে উচ্চশক্তির কোনো কণার মিথষ্ক্রিয়ার তত্ত্ব এখন আয়ত্বের মধ্যে। প্রমাণ হ'য়েছে এ জাতীয় মিথষ্ক্রিয়ার সময় কোয়ার্কগুলি মুক্তকণার মতই আচরণ করে। এই আচরণের সূত্র ধ'রেই উচ্চ শক্তির প্রোটনের একটি বিপরীত-কোয়ার্কের মিথষ্ক্রিয়ায় কিভাবে W বা Z কণা উৎপন্ন হয় তারও ব্যাখ্যা মেলে।

Gell-Mann-কে পুরস্কৃত করার সময় নোবেল কমিটি যথেষ্ট রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পুরস্কারের কারণ হিসেবে কোয়ার্ক তত্ত্বের কোনো উল্লেখ ছিল না। 1990 সালে

M.I.T-র Jerome Friedman ও Henry Kendall এবং স্ট্যানফোর্ডের Richard Taylor গভীর অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের গবেষণায় তাঁদের অবদানের জন্য নোবেল পুস্কারে ভূষিত হন। এবার সমস্ত রক্ষণশীলতা ঝেড়ে ফেলে কারণ হিসেবে বলা হ'ল "For their pioneering investigations concerning deep inelastic scattering of electrons on protons and bound neutrons, which have been of essential importance for the development of quark model of particle physics."

উপসংহার : সাবেকী পদার্থবিদ্যার নিয়ম কানুন থেকে পরমাণুদের গতিবিধি স্পষ্টভাবে বোঝা যেত না। সবই কেমন যেন বিশৃঙ্খল মনে হ'ত। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের আলোকে এই আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিয়ম, ছন্দের সুষমা ধরা প'ড়ল। বিজ্ঞানের সঙ্গে কবির কল্পনা মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল বিদ্রোহী পরমাণু"।

একসময় মৌলকণা বিজ্ঞানেও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। শ'য়ে শ'য়ে হ্যাড্রন আগাছার মত গজিয়ে উঠে কণা বিজ্ঞানের আঙ্গিনাটি ভরে দিয়েছিল। তারপর কণা বিজ্ঞানীরা এই অরাজকতার মধ্যেও শৃঙ্খলার সন্ধান পেলেন। কোয়ার্ক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

কোয়ার্কের আভ্যন্তরীণ গঠনের কোনো প্রমাণ অবশ্য এখনো পাওয়া যায় নি। তেমনি ইলেকট্রনে বা তার স্বগোত্রীয় কণা মিউ (μ) বা টাউ (τ)— এগুলিও বিন্দুসদৃশ কণা বলেই মনে হয়। ফোটন, W, Z প্রভৃতি বলের বাহক কণাগুলিরও আভ্যন্তরীণ গঠনের কোনো প্রমাণ নেই। একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষে এই কণাগুলিকেই মৌলকণা ব'লে মানা হ'চ্ছে।

এই কণাদের আরো গভীরে প্রবেশের চেষ্টা কিন্তু অবিরাম চ'লেছে। এর ফলে বোঝা গেছে কোয়ার্ক বা ইলেকট্রন অতি ক্ষুদ্র গোলক হ'তেও পারে। কিন্তু এদের ব্যাসার্ধ থাকলেও তা হবে 1 fermi-র হাজার ভাগের এক ভাগ বা আরো অনেক কম।

তেমনি কোয়ার্ক-এরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে আজ অবধি যে সমস্ত মৌলকণার সন্ধান পাওয়া গেছে তার ব্যাখ্যা ক'রতে গেলে অন্ততঃ আরো তিনটি কোয়ার্কের প্রয়োজন। কোয়ার্কের এই সংখ্যাবৃদ্ধি কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? এরা কি মৌলকণা নয়? একবিংশ শতাব্দীর ত্বরক যন্ত্র কোয়ার্ক বা ইলেকট্রনের অভ্যন্তরের কোন্ খবর আনবে তা কে ব'লতে পারে!

শিশুযীশু : অজানা ঘটনা

শান্তনু রায়
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

এল-নিনো (El Nino), স্প্যানিশ ভাষায় যার অর্থ শিশুযীশু। ১৯৭৭ সালে এই এল-নিনো পরিবেশবিদদের নজরে আসে এবং বর্তমানে এর প্রভাব মানব-সভ্যতার কাছে রীতিমত ভয়ের কারণ। December ডিসেম্বর মাসে এল-নিনো শুরু হয় বলে একে শিশুযীশু বলা হয়।

সাধারণ অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশ ইকুয়েডর, পেরু এবং উত্তর চিলির সংলগ্ন সমুদ্রের জল বেশ শীতল এবং এই জলের তাপমাত্রা প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা প্রায় ১০° সেন্টিগ্রেড কম। পূর্ব উপকূলের এই অঞ্চলে মাছের প্রাচুর্য দেখা যায় কারণ এখানে মাছের খাদ্যের উপস্থিতি, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু প্রতি ৫ থেকে ১০ বছর অন্তর ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ব উপকূলের সাগরের উপরিতলের জলের তাপমাত্রা প্রায় ৪°সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৮° সেন্টিগ্রেডে পৌছায়। উপরিতলের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নীচের ঠাণ্ডা জল উপরে উঠতে পারে না মাছের খাদ্য এই নিম্নতলের জলেই দেখা যায়, নীচের জল উপরিতলে না আসার জন্য মাছেদের অস্বাভাবিক খাদ্যাভাব ঘটে, ফলে মাছের সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। পূর্ব উপকূলের উপরোক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই মৎস্য আহরণের উপর নির্ভর করে। শুধু মাছই নয়, এই মাছ খেয়ে বিভিন্ন পাখিও বেঁচে থাকে। এই পাখিগুলি উপকূলবর্তী অঞ্চলের যেখানে বসবাস করে সেখানে তাদের মলের পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। এই মল সংগ্রহ ক'রে চড়াদামে গাছের সার হিসাবে বিক্রি ক'রে এই দেশগুলি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। মাছের অভাবে এই পাখিগুলিরও মৃত্যু ঘটে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই দেশগুলির মাছ উৎপাদন ক্ষমতা পৃথিবীর সর্বাধিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাওয়ার জন্য সারা বিশ্বে মাছের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণভাবে বিষুবরেখা বরাবর দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বায়ু পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। ফলে উষ্ণ জল উপকূলভাগ থেকে মাঝ সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু যে বছর এল-নিনো দেখা যায় তার প্রভাবে এই বায়ুপ্রবাহ ক্রমশ দুর্বল হ'য়ে পরে ও অবশেষে দিক পরিবর্তন ক'রে পশ্চিম থেকে পূর্বে বইতে থাকে ফলে পশ্চিমের উষ্ণ জল পূর্ব উপকূলে জমা হয় ও পূর্ব উপকূলের শীতল জলের মাছেদের মৃত্যু ঘটে। উষ্ণ জল পূর্ব উপকূলের বায়ুর ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করে ফলে চাপও হ্রাস পায় ফলে এই অঞ্চলে অস্বাভাবিক ঝড় ও ঘূর্ণিবর্তার সৃষ্টি করে। নিম্নচাপ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তারতম্য আনে ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খরা ও বন্যা দেখা যায়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় এটা প্রমাণিত যে এল-নিনোর প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে মাছেদের বা পাখির সংখ্যা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও প্রায় বিশ্বের অর্ধেক

অংশের আবহাওয়ার ও পরিবর্তন দেখা গেছে। এল-নিনোর ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় ধূলি ঝড়, তাহিতিতে ঘূর্ণি ঝড়, আফ্রিকা, উত্তর চীনা, ইন্দোনেশিয়ায় খরা, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে বন্যা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে খরা এবং আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২ সালে এল-নিনো চীনদেশে প্রায় ১০ শতাংশ ও আমাদের দেশে ৪ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন হ্রাস ক'রেছে। ওই বছরে আফ্রিকায় ও ইন্দোনেশিয়ায় যথাক্রমে প্রায় ৮০০ ও ৩০০ জন দুর্ভিক্ষে মারা যায় ও পেরুর কিছু স্থানে প্রায় ৬০০ গুণ বৃষ্টি হয়।

এল-নিনো কেন হয় তা এখনও বিজ্ঞানীদের অজানা। অনেকের ধারণা "গ্রীন হাউস এফেক্ট" এর সাথে এল-নিনোর একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু তা এখনও প্রমাণিত হয় নি। বর্তমানে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমিশন নামে একটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে এল-নিনোকে জানার জন্য বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন দেশের সমুদ্র বিজ্ঞানীরা গবেষণা ক'রছেন। মূলতঃ এই বিজ্ঞানীরা সাগরের তাপমাত্রা, জলের লবণের পরিমাণ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উপর গবেষণা ক'রে এল-নিনো আঘাত করার কয়েক মাস আগে এর পূর্বাভাসের চেষ্টা ক'রছেন। উপরোক্ত সংস্থা দুমাস অন্তর একটি পত্রিকাও প্রকাশ করে, এই পত্রিকার দ্বারা এল-নিনোর অবস্থান সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে পূর্বাভাস দেওয়া হয় যাতে তারা সচেতন থাকে ও এল-নিনোর প্রভাবকে কিছুটা প্রতিহত ক'রতে পারে।

বিজ্ঞানীরা যা কিছু করছেন তা এল-নিনোর পূর্বাভাসের জন্য, একে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য বিজ্ঞানীদের নেই। শিশুযীশু যদি মানব সভ্যতার উপর এত প্রভাব ফেলে তাহ'লে না-জানি যীশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও সাধের পৃথিবীর কি পরিণতি হবে?

ওই ফুল ফোটে বনে : উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর চোখে

রূপকুমার কর
অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

ফুল ছাড়া প্রকৃতি সম্পূর্ণ হয় না। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে রঙ-বেরঙের নানা ফুলের কথা বার বার আসে। উদ্ভিদ জগতে যেমন লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ র'য়েছে, তেমনি র'য়েছে অসংখ্য রকমের ফুল। রঙের দিক থেকে তো বটেই, চেহারায় এবং কিছু ক্ষেত্রে গন্ধেও বৈচিত্র র'য়েছে পুরোমাত্রায়। আবার একই প্রজাতির উদ্ভিদের নানারকম 'ভ্যারাইটি'তে ফুলের চেহারা আলাদা, যেমন— বিভিন্ন রকমের গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া। সৌন্দর্য এবং বৈচিত্রের কথা যতই বলি না কেন, ফুল কেন হয়, কিভাবে তৈরী হয়, কিভাবে তার প্রকারভেদ হয়— এরকম হাজারো প্রশ্ন যুগে যুগে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মাথায় তোলপাড় ক'রেছে। অনেক কিছু এ ব্যাপারে জানা গেছে, আবার অনেক উত্তরই মেলেনি। তাই এখনও ফুল একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়বস্তু।

ফুল কি এবং কেন এর সৃষ্টি? : সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, ফুল হ'চ্ছে উন্নততর উদ্ভিদের একটি বিশেষ অঙ্গ যা যৌন জননের মাধ্যমে বংশবিস্তারে সাহায্য করে। অঙ্গসংস্থান বা বাহ্যিক গঠনের দিক থেকে ব'লতে গেলে ফুল একটি অত্যন্ত ঘনসংবদ্ধ রূপান্তরিত বিটপ। অর্থাৎ বিটপের অগ্রভাগ বিশেষ অবস্থায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হ'য়ে নানান পরিবর্তনের মাধ্যমে ফুলে রূপান্তরিত হয়।

পৃথিবীর প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় এককোষী জীব দিয়ে। জীবের প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল বংশবিস্তার অর্থাৎ একাধিক প্রতিলিপি তৈরী করা। এককোষী জীব দিয়ে শুরু হ'লেও বিবর্তনের পথে ধীরে-ধীরে বৈচিত্র আসে। এককোষী থেকে বহুকোষী জীবের আবির্ভাব ঘটে। পরে উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূল আলাদা হ'য়ে যায়। উদ্ভিদের প্রধান ধর্ম হ'ল অজৈব বস্তু থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে জৈব যৌগ তৈরী করা, যা প্রাণীরা বেঁচে থাকার রসদ হিসাবে কাজে লাগায়। উদ্ভিদকূলের মধ্যেও বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন হ'তে থাকে। গোড়ার দিকে অপুষ্পক উদ্ভিদ ছিল সারা পৃথিবীর বুকে। এদের যৌন জনন প্রক্রিয়া থাকলেও জননাঙ্গ ফুলের আকারে ছিল না। অনেক পরে সপুষ্পক উদ্ভিদ আবির্ভূত হয়, এদের মধ্যে আবার গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী এই দুভাগে ভাগ হয়। পাপড়ি সাজানো ফুল, যা পরে ফলে পরিণত হয়, তা কিন্তু গুপ্তবীজী উদ্ভিদেই দেখা যায়। ফুলের দারুণ রঙ বা গন্ধ— এর মূল কাজ কিন্তু আমাদের মন ভরানো নয়, বিভিন্ন পোকা-মাকড়, প্রজাপতি, মৌমাছি, পাখি ইত্যাদি প্রাণীদের আকৃষ্ট করা, যারা ফুলের পরাগমিলনে সাহায্য করে। পরাগমিলনের জন্যই যৌন জননের সম্ভব হয়। যদিও অযৌন জনন অনেক উদ্ভিদেই বর্তমান, যৌন জনন ছাড়া জীবজগতে বৈচিত্র আসত না, কেন না জিনের recombination যৌন জননেই ঘটে।

ফুলের গঠন ও বিকাশ : একটি সম্পূর্ণ ফুলে চারটি স্তবক থাকে বৃতি (Sepal), দল (Petal), পুংকেশর (Stamen) ও গর্ভকেশর (Carpel)। প্রতিটি স্তবকে সদস্য সংখ্যা আবার ফুল অনুযায়ী ভিন্ন। এছাড়া অনেক উদ্ভিদের ফুল অসম্পূর্ণ। সেক্ষেত্রে যে-কোনো একটি স্তবক থাকে না। যেমন একলিঙ্গ ফুলের ক্ষেত্রে স্ত্রীফুলে পুংকেশর থাকে না তেমনই পুংফুলে গর্ভকেশর থাকে না। এছাড়াও আদর্শ ফুলের বাইরে অনেক রকম পরিবর্তিত ফুল রয়েছে। উদাহরণ হ'ল কচু, ডুমুর, রাংচিতা ইত্যাদি। তবে ফুলের জগতে বৈচিত্রের পেছনে র'য়েছে মূলতঃ দল বা পাপড়ির ভূমিকা। এই পাপড়ি অনেক আকারের হ'তে পারে, অনেক রঙের হ'তে পারে। পাপড়ির রং নির্ভর করে রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির উপর। মুখ্য রঞ্জক পদার্থ হিসাবে অ্যান্থোসায়ানিন (জলে দ্রাব্য) পাপড়ির কোষে থাকে। এছাড়াও ক্যারোটিনয়েড ও ক্লোরোফিলের ভূমিকা রয়েছে ফুলের বর্ণবৈচিত্রে।

ফুলের বিকাশ একটি জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বীজ থেকে জন্মাবার পর উদ্ভিদ প্রথমে ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে ওঠে যাকে বলা হয় vegetative growth. এই দশা কিছুদিনের হ'তে পারে, যেমন ছোটো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, আবার বহুবছরের হ'তে পারে বিশেষতঃ বৃক্ষের ক্ষেত্রে। এই দশার শেষে উদ্ভিদ reproductive growth দশায় প্রবেশ করে, যে দশাকে পরিণত দশা বলা যায়। অর্থাৎ reproductive maturity এলে তবেই উদ্ভিদ যৌন জননে সক্ষম হয়। এই দশাতেই ফুলের আবির্ভাব ঘটে। শুরুতে বিশেষ শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের ফলে (সঞ্চার বা induction) উদ্ভিদ কাণ্ডের অগ্রভাগের সূক্ষ্ম গঠনে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এর কারণ শুধুমাত্র বৃদ্ধিজনিত নয়, differentiationএর ফলেই অগ্রভাগের চেহারা পরে মুকুলের আকার নেয়। এরূপ বিকাশের প্রাথমিক দশাকে evocation বলে। এই দশা অর্থাৎ induction এবং evocation-র ঘটনা ফুলের উৎপত্তি ও বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে একদিকে কিছু আভ্যন্তরীণ শর্ত (endogenous factors) এবং অন্যদিকে কিছু বাহ্যিক পরিবেশজনিত শর্ত ((exogenous environmental factors) যা বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য। ফুলের বিকাশের ক্ষেত্রে পরবর্তী ঘটনা হ'ল বিভিন্ন স্তবক গঠন যার জন্য প্রয়োজন জিন নিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন ও differentiation.

ফুলের প্রাথমিক বিকাশ ও দিনরাত্রির ভূমিকা : বিভিন্ন প্রজাতির ফুল শুধু দেখতেই ভিন্ন নয়, তাদের ফোটার সময়ের তারতম্যও উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় বছরের বিশেষ সময়ে ফুল ফোটার ক্ষণ নির্দিষ্ট থাকে। তাই কিছু ফুল শুধুমাত্র বসন্তে ফোটে, কিন্তু গ্রীষ্মে কিছু বা শরতে। প্রশ্ন হ'ল, বছরের এই বিশেষ সময় বা ঋতু উদ্ভিদ কিভাবে অনুধাবন করে। এব্যাপারে দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য বা তাপমাত্রা নির্ভরযোগ্য সংকেতের কাজ করে। বছরের বিভিন্ন সময়ে দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়। এই তারতম্য বৃদ্ধি পায় বেশি দ্রাঘিমায় অর্থাৎ উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে গেলে, আবার বিষুব রেখা অঞ্চলে এই তারতম্য থাকে না। তাই মূলতঃ উত্তর বা দক্ষিণ দ্রাঘিমায় দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য উদ্ভিদের ফুলফোটা সহ বিভিন্ন ঋতুনির্ভর পদ্ধতির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সংকেতের কাজ করে। উদ্ভিদের দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের ওপর এই প্রতিক্রিয়াকে

বলা হয় Photoperiodism.
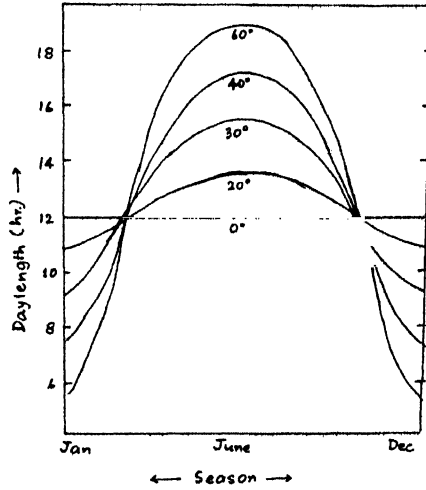
চিত্র ১. পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রাঘিমায় ঋতু অনুযায়ী দিনরত্রির দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন

গার্নার ও অ্যালার্ড ১৯২০ সালে প্রথম দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর ক'রে ফুল ফোটার ধর্মের ভিত্তিতে উদ্ভিদকূলকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেন। যেমন দীর্ঘ দিনের উদ্ভিদ (Long day plant বা LDP), হ্রস্ব দিনের উদ্ভিদ (Short day plant বা SDP), দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day Neutral plant)। এছাড়াও আরও অসংখ্য রকমের উদ্ভিদের ভাগ র'য়েছে বিভিন্ন রকম শর্তের ওপর নির্ভর ক'রে। LDP বলতে বোঝায় এই ধরনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটার সঞ্চার (induction) হবে যখন দিন বা আলোকদশার দৈর্ঘ্য একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আলোকদশা (critical day length বা CDL)থেকে বেশী হবে। এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদের উদাহরণ হ'ল পালং, বার্লি ইত্যাদি। আসলে এই সব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শীতের শেষে দিন যখন ধীরে ধীরে বড় হ'তে থাকে তখনই ফুল ফোটার প্রয়োজনীয় সংকেত পৌঁছে যায় উদ্ভিদের অগ্রভাগে। অন্যদিকে SDP গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত উদ্ভিদেরা শরতের সময় ক্রমশঃ ছোট হ'তে যাওয়া দিনকে অনুধাবন ক'রে ফুল ফোটার জন্য প্রস্তুত হয়। তবে এক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য উল্টোভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের থেকে কম হ'তে হবে। এর উদাহরণ হ'ল সয়াবীন, তামাক ইত্যাদি। যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আলোকদশার বা CDL-র কথা বলা হ'ল তা প্রজাতি অনুযায়ী ভিন্ন হয়, সে LDP হোক বা SDP-ই হোক। *Xanthium strumarium* নামক হ্রস্ব দিনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে CDL হ'ল সাড়ে ১৫১/২ ঘণ্টা, আবার *Hyoscyamus niger* নামক LDP উদ্ভিদের CDL হ'ল ১১ ঘণ্টা। দিনের দৈর্ঘ্য ১২/১৩ ঘণ্টা হ'লে দুটি ক্ষেত্রেই তা ফুল ফোটার সহায়ক হবে, যদিও দু'টি দুই বিপরীত গোষ্ঠীর উদ্ভিদ। তাহ'লে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে, তফাৎ থাকল কোথায়? প্রকৃতিতে শরৎকালে ও বসন্তকালে দিনের

দৈর্ঘ্য একই রকম হয়, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ ছোট হ'তে চ'লেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা ক্রমশঃ বড় হওয়ার দিকে চ'লেছে। অতএব প্রথম ক্ষেত্রে SDP গোষ্ঠীর উদ্ভিদেরা সঞ্চারিত হবে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের নীচে দিন গেলেই। ঠিক উল্টো হবে বসন্তকালে যখন LDP উদ্ভিদেরা সঞ্চারিত হবে দিনের দৈর্ঘ্য CDL-র বেশী হ'লেই।
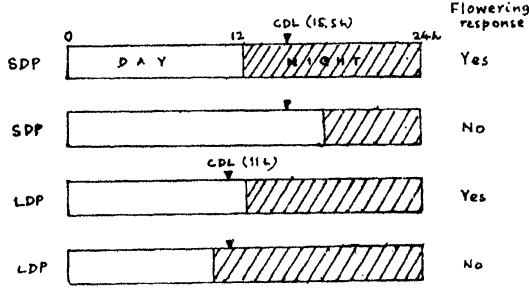
চিত্র- ২. Critical day length-এর পরিপ্রেক্ষিতে ফুলের সঞ্চারের ওপর দিনের দৈর্ঘ্যের প্রভাব হ্রস্বদিনের উদ্ভিদ এবং দীর্ঘদিনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিপরীত

মজার ব্যাপার হ'ল, দিনের দৈর্ঘ্যের প্রতি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়াকে ভিত্তি ক'রে উদ্ভিদের গোষ্ঠীবিভাজন করা হ'লেও জানা গেছে, সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কিন্তু দিনের দৈর্ঘ্য মাপে না, তাদের কাছে রাতের দৈর্ঘ্যের পরিমাপই হ'ল আসল কথা। সেই অর্থে দীর্ঘদিনের উদ্ভিদ গোষ্ঠীর নাম হওয়া উচিৎ ছিল হ্রস্বরাত্রির উদ্ভিদ এবং হ্রস্বদিনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। সেক্ষেত্রে critical day length-র বদলে critical night length-কে বিবেচনা করাই উচিত হবে। একটি সাধারণ পরীক্ষা এই যুক্তিকে সমর্থন ক'রবে। একটি SDP গোষ্ঠীর উদ্ভিদকে দীর্ঘ রাত্রির মাঝখানে যদি আলোর ঝলক দেওয়া যায় তবে এর ফুল ফোটার সম্ভাবনা বন্ধ হ'য়ে যায়। অথচ এই উদ্ভিদেই যদি দিনের মাঝখানে কিছুক্ষণ অন্ধকার প্রয়োগ করা যায় ফুল ফোটার ব্যাপারে কোনো তারতম্য হয় না। অর্থাৎ অন্ধকার দশায় ছেদ প'ড়লে ফুল ফোটার ওপর তার প্রভাব প'ড়বে, অথচ আলোকদশায় ছেদের কোনো প্রভাব নেই।

উদ্ভিদের দিন-রাত্রির অনুধাবন : যদিও ফুল ফোটার অনেক আগেই সূক্ষ্ম পরিবর্তন শুরু হয় উদ্ভিদ কাণ্ডের অগ্রভাগে। বাহ্যিক পরিবেশ থেকে দিনরাত্রির সংকেত কিন্তু গৃহীত হয় পাতায়। একটি মজার পরীক্ষায় উদ্ভিদের শুধুমাত্র একটি বা কয়েকটি পাতাকে সুবিধাজনক বা সঞ্চারক দৈর্ঘ্যের দিনরাত্রি (inductive photoperiod) প্রয়োগ ক'রলেই ফুল ফোটার জন্য সঞ্চারিত হবে (সেক্ষেত্রে উদ্ভিদটিকে একটি কালো বাক্সের মধ্যে ভ'রে রাখতে হবে এবং পাতা বা পাতাগুলিকে ফুটো দিয়ে বাইরে বের ক'রে রাখতে হবে)। এমনকি এই সঞ্চারিত পাতা বা ডালটি অন্য একটি অসুবিধাজনক বা অসঞ্চারক দৈর্ঘ্যের দিনরাত্রিতে (non-inductive photoperiod) রাখা একই

প্রজাতির উদ্ভিদে কলম ক'রে লাগালে দ্বিতীয় উদ্ভিদে ফুলের সঞ্চার ঘ'টবে। অতএব অনুমান করা যায়, সঞ্চারক দৈর্ঘ্যের দিনরাত্রিতে উদ্ভিদকে রাখলে এর পাতায় কোনো বিশেষ রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন হয়, যা পরিবাহিত হ'য়ে অগ্র-মুকুলে পৌঁছায় এবং ফুল ফোটার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটায়। এইরূপ সঞ্চারক দিনরাত্রির আবর্ত পরস্পর ক'দিন প্রয়োজন ফুল ফোটার জন্য, এই ব্যাপারেও উদ্ভিদের ভাগ আছে। তাই এক আবর্তের উদ্ভিদ(single cycle plant) মাত্র একদিনেরই জন্য সঞ্চারক দৈর্ঘ্যের দিনরাত্রি পেয়ে গেলেই ফুল ফোটার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে, বাকী দিনগুলো অসঞ্চারক থাকলেও ক্ষতি নেই। তেমনি র'য়েছে বহু আবর্তের উদ্ভিদ যাদের ফুল ফোটার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার দিনরাত্রির আবর্তের প্রয়োজন হয়।

দিনরাত্রির পরিমাপ ও ফুল সঞ্চারের রহস্য : যদিও জানা গেছে যে উদ্ভিদের দিনরাত্রির প্রতিক্রিয়ার (photo-periodic response) ব্যাপারে রাত্রি বা অন্ধকার দশাই সময়ের পরিমাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, অন্ধকার দশার শুরু তো আলোক দশার শেষ থেকে অর্থাৎ দিনের শেষে গোধূলি লগ্ন থেকে। তাই আলোক দশার গুরুত্ব থেকেই যাচ্ছে। আলোর তীব্রতা একটা ন্যূনতম মাত্রার নীচে নেমে গেলে তা উদ্ভিদের কাছে রাত্রির শুরু বলে বিবেচিত হবে অর্থাৎ সেখান থেকেই অন্ধকার দশার পরিমাপ শুরু হবে। দিনরাত্রির প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক কম তীব্রতার আলোও কিন্তু কার্যকরী। দেখা গেছে ভরা-পূর্ণিমার চাঁদের আলোও ফুল ফোটার ব্যাপারে কার্যকরী। তীব্রতার পরেই আলোচনায় এসে যায় আলোর বর্ণ। এই ব্যাপারে খুব সুন্দর পরীক্ষা করা হ'য়েছে। একটি ছোটো দৈর্ঘ্যের দিনের শেষে ন্যূনতম তীব্রতার লাল আলো জ্বেলে রাখলে তা উদ্ভিদের কাছে দীর্ঘ দিন ব'লে বিবেচিত হয়। তেমনি SDP গোষ্ঠীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ রাত্রির মাঝে লাল আলোর ঝলক প্রয়োগ ক'রলে ফুল ফোটার সঞ্চার বন্ধ হ'য়ে যায়। এই লাল আলোর বদলে অতি দীর্ঘ তরঙ্গের লাল আলো (far red light) ব্যবহার ক'রলে সঞ্চার বন্ধ হয় না। এমনকি লাল আলো প্রয়োগের পরে-পরেই অতি দীর্ঘ লাল আলো ব্যবহার ক'রলেও সঞ্চার বন্ধ হয় না। অর্থাৎ ফুলের সঞ্চার হবে কিনা তা নির্ভর ক'রছে শেষ বেলায় কোন আলো প্রয়োগ করা হ'য়েছে। এই যে লাল আলো ও অতি দীর্ঘ লাল আলোর বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া ফুল ফোটার ক্ষেত্রে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আলো অনুভব করার জন্য এক্ষেত্রে ফাইটোক্রোম (Phytochrome) নামক একরকরম রঞ্জক পদার্থ র'য়েছে উদ্ভিদে। ফাইটোক্রোমের দু'রকম রূপ আছে যা পরস্পর পরিবর্তনশীল। একটি হ'চ্ছে Pr রূপ যা লাল আলো শোষণ করে Pfr-এ পরিবর্তিত হয়। আবার Pfr অতি দীর্ঘ লাল-আলো শোষণ ক'রে Pr-এ পুনরায় ফিরে আসে। এছাড়াও Pfr রূপের ফাইটোক্রোম অন্ধকারেও স্বতস্ফূর্তভাবে Pr-এ পরিবর্তিত হয়। দিনের আলোতে লাল আলোর আধিক্য থাকে, ফলে সারাদিনে ফাইটোক্রোমের বেশীর ভাগ অণুই Pfr-এ রূপান্তরিত হয়। দিনের শেষে যখন উদ্ভিদ অন্ধকার দশায় প্রবেশ ক'রে, Pfr আবার Pr-এ রূপান্তরিত হ'তে শুরু করে। ফাইটোক্রোমের দুটি রূপের মধ্যে Pfr -কে সক্রিয় রূপ ব'লে বিবেচনা করা হয়।
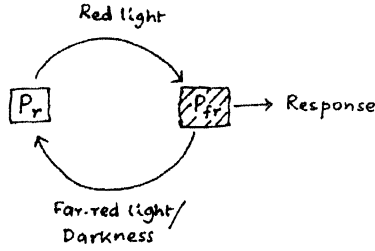
চিত্র ৩.

ফাইটোক্রোমের দু'টি রূপ P_r এবং P_{fr}. P_r লাল আলো শোষণ করে P_{fr} রূপে পরিবর্তিত হয়, আবার P_{fr} দীর্ঘ তরঙ্গের লাল আলো শোষণ করে অথবা অন্ধকারেও P_r রূপে পরিবর্তিত হয়।

এটা বোঝা গেল যে, ফাইটোক্রোম অণু দিনরাত্রির পরিমাপের সঙ্গে জড়িত, কেন না দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণের বিচার উদ্ভিদ এই অণুর মাধ্যমেই করে। তবে ফাইটোক্রোম অণু কিভাবে কোনো একটি দশার (বিশেষতঃ অন্ধকার দশার) দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে তা বোঝা মুস্কিল। মনে করা হয় যে, ফাইটোক্রোম অণু আলোক বা অন্ধকার দশার শুরু বা শেষকে চিহ্নিত করে, কিন্তু দশার দৈর্ঘ্য পরিমাপ অন্য কোনো অজানা পদ্ধতিতে হ'য়ে থাকে। পুরানো Hour glass hypothesis-এ বলা হয় যে ফাইটোক্রোম অণুই সময়ের পরিমাপের জন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমান নানান পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই মতবাদকে সমর্থন করে না। তাই আধুনিক মতবাদ তৈরী হ'য়েছে জীবজগতের অভ্যন্তরীণ ছন্দের (Endogenous rhythm) ওপর ভিত্তি ক'রে। আসলে অনেক আগেই জীবদেহে নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছন্দের অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়েছিল। তাই কচ্ছপের ডিম পাড়া, পিউপা থেকে মথ বের হওয়া, উদ্ভিদের পাতায় স্টোমাটা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি অনেক জৈবিক ঘটনাই একটা অন্তর্লীন ছন্দ মেনে চলে, যাকে বলা হয় Biological clock। এর প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা এখনো অমিল। যাই হোক ফুল ফোটার সঞ্চারের ব্যাপারে আলোর ভূমিকাও কিন্তু এইরকম ছন্দ নির্ভর। তাই সঞ্চার হওয়া নির্ভর করে উদ্ভিদ কখন আলোর সম্মুখীন হ'চ্ছে, কখন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। বুনিং নামক এক বিজ্ঞানী একটি মতবাদ পেশ করেন যা ফুল ফোটার রহস্যকে কিছুটা বুঝতে সাহায্য করে। প্রতিটি উদ্ভিদে আলো-অন্ধকারের তারতম্যে দেহ অভ্যন্তরে তার প্রতিক্রিয়ার একটা ছন্দ বা আবর্ত র'য়েছে। একটি আলো পছন্দের দশা (photphase) এবং একটি অন্ধকার পছন্দের দশা (skotophase), এইভাবে পর্যায়ক্রমে আবর্তে রূপ দেয়। এই দশা দুটি একে অন্যের পরিপূরক (মোট দৈর্ঘ্য ২৪ ঘণ্টা) এবং এদের আনুপাতিক দৈর্ঘ্য উদ্ভিদ অনুযায়ী ভিন্ন হয়। এই অন্তর্লীন ছন্দের সাথে বাইরের দিনরাত্রির ছন্দের মিল বা সমাপতন ঘটলেই সঞ্চার হয়। এই মতবাদকেই external co-incidence বলে অভিহিত করা হয়।

ফুলের সঞ্চারে কম তাপমাত্রার ভূমিকা : অনেক উদ্ভিদ আছে, বিশেষতঃ দানাশস্যের উদ্ভিদ, যেখানে ফুল ফোটার সঞ্চার হয় শুধুমাত্র যদি ঐ উদ্ভিদ বেশ কিছুদিন ধ'রে কম তাপমাত্রায়

(10^0Cএর নীচে) থাকে। সাধারণতঃ এই ধরনের উদ্ভিদ দ্বিবর্ষজীবি হয় এবং এদের ক্ষেত্রে শীতের শেষে ফুল ফোটার প্রস্তুতি শুরু হয়, যার সঞ্চার কিন্তু কম তাপমাত্রার প্রভাবেই হয়। উদ্ভিদের এই কম তাপমাত্রা-নির্ভর ফুল ফোটার প্রতিক্রিয়াকে vernalization বলে। **কিছু উদ্ভিদ আছে** যেখানে প্রতিক্রিয়া ঘটে মিশ্র প্রকৃতির অর্থাৎ photoperiodism ও vernalization **উভয়ই কাজ** করে। সাধারণতঃ এইসব মিশ্র প্রকৃতির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি **কম তাপমাত্রার মেয়াদ** এবং ঠিক তারপরে-পরেই একটি দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের দিনের প্রয়োজন হয়, ফুল **সঞ্চারের জন্য। আসলে শর্তসাপেক্ষে** ফুল ফোটার প্রস্তুতির উৎপত্তি হ'য়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে, উদ্ভিদের **পারিপার্শ্বিক** অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

ফুলের পূর্ণ প্রকাশ ও জিন নিয়ন্ত্রণ : ফুলের প্রাথমিক বিকাশ অর্থাৎ ফুলের সঞ্চার দিনরাত্রি বা তাপমাত্রা নির্ভর হ'লেও, পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর সবকিছু নিয়ে ফুলের সম্পূর্ণ বিকাশ কিন্তু পুরোপুরি আলাদা ঘটনা। এর নিয়ন্ত্রণ কিছু বিশেষ জিনের হাতে। সম্প্রতি অ্যারাবিডপ্সিস (*Arabidopsis*) নামক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটার সাথে জড়িত জিন সমষ্টি চিহ্নিত করা গেছে। ফুলের গঠনে চারটি স্তবক র'য়েছে, যার প্রথম স্তবক বৃতি বাইরের দিক থেকে প্রথম কক্ষে জন্মায় এবং পর পর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কক্ষে যথাক্রমে দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর জন্মায়। এই চারটি স্তবকের বিকাশে অংশগ্রহণ করে তিন শ্রেণীর জিন — A, B এবং C। এদের মধ্যেA শ্রেণীর জিনগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। B নিয়ন্ত্রণ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কক্ষ এবং C এর হাতে নিয়ন্ত্রিত হয় তৃতীয় ও চতুর্থ কক্ষ। এদের মধ্যে কোনো একটি জিনে পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটলেই অস্বাভাবিক ফুলের সৃষ্টি হয়। ফুলের স্তবক গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এইভাবে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা ABC মডেল নামে খ্যাত।
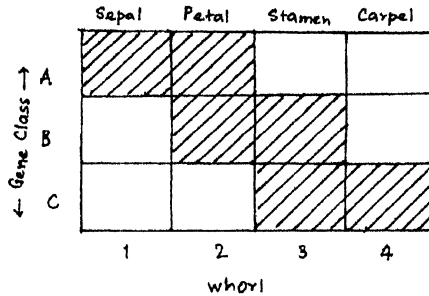
চিত্র ৪. ABC মডেল, যা ফুলের বিভিন্ন স্তবকের বিকাশের জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে

ফুলের স্তবক গঠন ছাড়াও ফুলের বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে বর্ণ ও গন্ধের। বর্ণের ক্ষেত্রে বিশেষ রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ও তার পরিমাণ সবই নিয়ন্ত্রিত হয় জিন দ্বারা। অনুরূপভাবে

গন্ধও নির্ভর করে কিছু বিশেষ উদ্বায়ী রাসায়নিকের ওপর যা অবশ্যই জিন নিয়ন্ত্রিত।

ফুলের সামগ্রিক বিকাশে জিনের ভূমিকা থাকলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা শর্তের পরিবর্তন ঘটিয়ে ফুলের বিকাশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই হ্রস্বদিনের উদ্ভিদেও গ্রীষ্মকালের দীর্ঘদিনে ফুল ফোটানো সম্ভব যদি উদ্ভিদকে কৃত্রিম হ্রস্বদিনে রাখা যায়। এছাড়া হরমোন প্রয়োগ ক'রেও এই ধরণের পরিবর্তন আনা যায়। জিব্বারেলিন প্রয়োগ ক'রে দীর্ঘদিনের উদ্ভিদে হ্রস্বদিনে ও কম তাপমাত্রা নির্ভর উদ্ভিদে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফুল ফোটানো সম্ভব। আগামীদিনে আরও আধুনিক ও উন্নতমানের গবেষণা বিশেষতঃ জিন ও আনবিক স্তরের গবেষণার ফলে এমনই সব রহস্য মানুষের জানা হ'য়ে যাবে। ফলে হয়তো এমন একদিন আসবে যে একজন তার পছন্দসই মাপের, আকৃতির, বর্ণের ও গন্ধের ফুল ফোটাতে সক্ষম হবে নিজের প্রিয় উদ্ভিদে। তবে প্রশ্ন জাগছে মনে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে চলে আসলে প্রকৃতির নিজস্বতা কেমন ক'রে বজায় থাকবে? এর উত্তর সময়ই দেবে।

জৈবপ্রযুক্তি : এক বহুমুখী বিষয়

নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

বিগত শতাব্দীর সেরা আবিষ্কারটি ঠিক কী, বিশ্বের সব কটি মহাদেশ থেকে একজন ক'রে বিদগ্ধ ব্যক্তি বেছে নিয়ে যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়, দেখা যাবে হয়তো যতজন মানুষ পছন্দের তালিকাও ততই দীর্ঘ। কখনই সম্ভব নয় প্রত্যেকের পক্ষে সেই আবিষ্কারটি কী তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। বিজ্ঞানের দুর্বার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অনেক আবিষ্কারই প্রতিনিয়ত ভীষণভাবে সাহায্য ক'রে চলেছে মানব সভ্যতাকে। বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক লক্ষ্যও তাই মানবসভ্যতার উন্নয়নের নানারকম উপায় আবিষ্কার করা। অবশ্য সেই সব যুগান্তকারী আবিষ্কার পরবর্তীকালে মানবকল্যাণের কাজে নাকি যুদ্ধের অস্ত্র-হিসেবে ব্যবহার হবে সেই সিদ্ধান্তের দায় একান্তই ব্যক্তিবিশেষ বা জাতির উপর বর্তায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী পরমাণু বোমার দায় যদি বর্তায় ১৯১৬ সালে **আপেক্ষিকবাদ** এর প্রবক্তার উপর, তবে তা নিতান্তই হাস্যকর। আইনস্টাইন নামে ২০ শতকের অন্যতম সেরা প্রতিভাধর সেই শান্তিপ্রিয় মানুষটি সে সময়ে ঘুণাক্ষরেও আঁচ ক'রতে পারেন নি যে $e = mc^2$ সমীকরণ একদিন পৃথিবীর বীভৎসতম অস্ত্র হ'য়ে দাঁড়াবে। ফিরে আসি সেই পুরনো প্রসঙ্গে। বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কী? আছে অনেক কিছুই; যেমন উড়োজাহাজ, মানুষের চন্দ্রাভিযান, কম্পিউটার আবিষ্কার, অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার, হালফিলের ইন্টারনেট ইত্যাদি। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে কথা না বললে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হ'ল **জৈব প্রযুক্তি**, যা অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে এসেছে সত্তরের দশক থেকে।

জৈবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার মিলিত প্রয়োগে জীবজগতের সাহায্যে মানবকল্যাণমূলক উৎপাদন। বায়োটেকনোলজি একটি বহুমুখীবিজ্ঞান যা জীবাণু, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে বায়োটেকনোলজিস্টরা বা জৈবপ্রযুক্তিবিদ্‌গণ আজ সহজেই ক্লোনিং পদ্ধতিতে নানা ধরনের জীবনদায়ী ওষুধ তৈরী ক'রতে সক্ষম হয়েছেন; যেমন ইনসুলিন, ইন্টারফেরন, হেপাটাইটিস্ বি ভ্যাক্সিন ইত্যাদি। ফলে এই সব ওষুধ এখন বাজারে অনেক সস্তা এবং সহজলভ্য হ'য়ে গেছে যা আমাদের কাছে খুব সুখবর। রোগ-ব্যাধির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে সেই ২১ শতকের সেরা বিজ্ঞাপনটির কথা— **"নিজের শরীরের গোপন রহস্য জানুন। দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পান এবং পরবর্তী প্রজন্মকে রোগমুক্ত রাখুন।"** জৈবপ্রযুক্তির কল্যাণে বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনের নীল-নক্সাটি আজ প্রায় আবিষ্কারই ক'রে ফেলেছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, জিন বা বংশানুঘটিত ব্যাধি পাকাপাকিভাবে শীঘ্রই বিদায় নিতে চলেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও চীনের ৬৪ জন বিজ্ঞানীর প্রায় ১০ বৎসরের নিরলস গবেষণার প্রচেষ্টা আজ সফল হ'তে চলেছে। মানব-জীবনের নীল-নক্সা

তৈরী বা জিন ম্যাপিং-এর কাজ প্রায় শেষ। শুধু সরকারী ভাবে তা ঘোষণা করা বাকী। এই কাজ সম্পূর্ণ হ'লেই মানুষের দেহকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমে যে হাজার হাজার জিন বা বংশানু আছে তাদের প্রত্যেকটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের জানা হ'য়ে যাবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জিনঘটিত যাবতীয় রোগ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। ফলে মানুষের যে শুধু সুস্থ হ'য়ে বেঁচে থাকাটাই সম্ভব হবে তা নয়, একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুরক্ষিত থাকবে। বায়োটেকনলজি ইনফরমেশন সেন্টারের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী গ্রেগরি শুলারের মতে **"মানুষ ভবিষ্যতে গবেষণাগারে গিয়ে নিজেদের কোষের নমুনা দেবেন আর বায়োটেক্‌নোলজিস্টরা সেই নমুনা জিনের তথ্য ভাণ্ডারের ম্যাপের সঙ্গে ম্যাচিং বা তুলনা ক'রে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবেন যে সেই ব্যক্তির কোষে কোন্ কোন্ ক্ষতিকারক জিন বর্তমান।"**

এখন দেখা যাক্ জিন বলতে আমরা কী বুঝি এবং তা ঠিক কিভাবে কাজ করে। আমরা যদি আমাদের নিজেদের কোষের কথাই ভাবি, দেখা যাবে যে কোষের নিউক্লিয়াসে আছে ৪৬টি ক্রোমোজোম (২৩ জোড়া) যার মধ্যে নিহীত আছে DNA বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড নামক একটি (দ্বিসর্পিল তন্তু) double helix। এই DNA এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের আসল প্রকৃতি অর্থাৎ জিন। "Human Genome Project"-এর গবেষণার ফলে এই সব জিনের চারিত্রিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের সব তথ্য আমাদের হাতের মুঠোয় এসে প'ড়ছে। এই লক্ষ লক্ষ জিনের বেশ কিছু সক্রিয় অংশ থাকে যাদের বলা হয় **ইউক্রোমাটিন** এবং বাকী অংশ নিষ্ক্রিয় যার নাম **হেটারোক্রোমাটিন**। সক্রিয় জিনগুলি ক্রমাগত কাজ ক'রে চ'লেছে। এরা মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং এনজাইম তৈরী করে, যার সাহায্যে শারীরবৃত্তীয় যাবতীয় কাজকর্ম সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৯৮ সালের মধ্যেই মানবদেহের প্রায় অর্ধেক জিনের প্রকৃতি জানা সম্ভব হ'য়েছে এবং তার ভিত্তিতেই বংশগত ডায়াবেটিস্ মেলিটাস্ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হ'য়েছিল, যা আজ প্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে। জিন ম্যাপিং এর ফলস্বরূপ জৈবপ্রযুক্তির বিজয়রথ যে কোন পথে চালিত হবে, তা ভেবে আজ অনেকেই শঙ্কিত। হয়তো একদিন দেখা যাবে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার চেহারা ও আচার আচরণের যে সাদৃশ্য ছিল তা ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। বাবা-মায়েরা ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারবেন তাঁদের সন্তানের চোখের, চুলের ও গায়ের রং। টাক্ বস্তুটিও হয়তো মনুষ্যকূল থেকে বিদায় নেবে। গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে জিন প্রতিস্থাপন ক'রে বাদামি চুলের শিশুকে কালো চুলের শিশু ক'রে দেওয়ার প্রযুক্তি আজ বিজ্ঞানীদের আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ বংশগতির ধারা প্রয়োজনে অবলুপ্ত ক'রেফেলা আজ আর অসম্ভব নয়। জিন ম্যাপিং-এর শেষ ধাপে আজ আমরা দাবি ক'রতে পারি যে মানবদেহে যে কয়েক-কোটি জিন আছে তার শতকরা ৯৭ শতাংশের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হ'য়েছে। বাকি তিন শতাংশের জন্য আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন। অবশ্য ওই তিন শতাংশ অজানা থাকলেও খুব একটা ক্ষতি নেই। ৯৭ শতাংশের মধ্যেই যে সত্যটা উদঘাটন হ'য়েছে তা দিয়েই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখা যাবে। গত ২৬শে জুন ২০০০ তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বেশ কিছু বিদগ্ধ বিজ্ঞানী সঙ্গে নিয়ে সগর্বে ঘোষণা করেন **"এতদিন জীবনের রহস্য ছিল একমাত্র ঈশ্বরের জানা। আজ তা মানবকুলের করায়ত্ব। ঈশ্বরের কৃপায় নয়, মানুষ আজ বাঁচবে বিজ্ঞানলব্ধ ফল প্রয়োগ করে।**

কঠিন সব ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার হবে এই জ্ঞান"। সত্যিই আজ আমরা ভাবতে পারছি জিনথেরাপির কথা। শুধু ভাবনাই নয়, বাস্তবে চেষ্টাও চলছে জিনঘটিত ডায়াবেটিস্‌, পার্কিনসন্স রোগ, অনেক ধরনের ক্যান্সার-এর নিরাময়ের লক্ষ্যে। বিশেষ ক'রে কয়েক ধরনের লিউকিমিয়া (Blood Cancer) এবং স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আক্রান্ত শরীরের যে সব কোষে তখনও রোগ বিস্তার করে নি, সেগুলিকে নীরোগ রাখার জন্য উপযুক্ত ড্রাগ আজ তৈরী করা সম্ভব হ'য়েছে। এখন জৈব প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন। তা হ'ল **'ক্লোনিং'**। এই ক্লোনিং আসলে কী? উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদেহের যে-কোনও সজীব কোষকে ব্যবহার ক'রে হুবহু একই চারিত্রিক বৈশিষ্টের একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের সৃষ্টির নামই হ'ল ক্লোনিং। দেখা যাক্‌ প্রাণী জগতে এই ক্লোনিং আজ কীভাবে সম্ভব হ'চ্ছে। একটি "ডোনার এগ" বা দাতা-ডিম্বাণু থেকে সূক্ষ্ম সূচের সাহায্যে এর নিউক্লিয়াসটি টেনে বের ক'রে নেওয়া হয়। সঙ্গে -সঙ্গে বেরিয়ে আসে ডিম্বক মধ্যস্থ ডি.এন.এ। এবার যে প্রাণীর ক্লোনিং করা হবে তার দেহত্বকের একটি কোষ নিয়ে, দুটি কোষকে পাশাপাশি রেখে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত ক'রতে হয়। ঘটে যায় দুটি কোষের কৃত্রিম সংযোজন (Fusion)। এরপর নূতন কোষটি বিভাজিত হ'তে শুরু করে। কালক্রমে তা রূপান্তরিত হয় একটি প্রাণীতে। কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডে এই ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে 'ডলি' নামে যে মেষশাবকের জন্ম হয় তা থেকে আন্দাজ করা যায় যে স্তন্যপায়ীর ক্লোনিং আর খুব শক্ত কাজ নয়। সাধারণভাবেই আমাদের মনে আসে মানব ক্লোনিং-এর বিষয়টি। বিষয়টি খুবই বিতর্কমূলক। এখন প্রশ্ন চিকিৎসার প্রয়োজনে আজ মানব ক্লোনিং কী আদৌ নৈতিক? ডলির জন্মদাতা ইয়ান উইলমার্ট-এর মতে **"মানব ক্লোনিং আজ অপরাধমূলক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা জন্মাবে তাদের বিকৃত শরীর নিয়ে জন্মানোর আশঙ্কাই বেশি"**। এই বিতর্কিত বিষয়ে বেশিদূর এগোনো তাই আপাতত নিষ্প্রয়োজন।

এবার আসা যাক্‌ উদ্ভিদ জগতের বিষয়ে। বায়োটেকনলজির সাহায্যে আমরা কৃষিক্ষেত্রে কিধরনের উন্নতি সাধন ক'রতে পেরেছি তা খতিয়ে দেখা যাক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ব'লতে হয় উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা। T.H. Morgan (1903) সালে ব'লেছিলেন যে একটি সজীব উদ্ভিদ কোষ উপযুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে বিভাজিত হ'য়ে হুবহু একই বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু উদ্ভিদ তৈরী ক'রতে সক্ষম। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে Totipotency। উদ্ভিদ জগতে এই বিশেষ গুণ কাজে লাগিয়ে আজ টিস্যুকালচার পদ্ধতির (জৈবপ্রযুক্তির একটি বিভাগ) মাধ্যমে সামান্য দেহাংশ থেকে হাজার হাজার ক্লোন তৈরী করা সম্ভব যার গুণগত চারিত্রিক পার্থক্য মোটেই থাকবে না। এই টিস্যুকালচার পদ্ধতি আজ উদ্ভিদ জৈবপ্রযুক্তির এক শক্তিশালী স্তম্ভ যার ওপর ভিত্তি ক'রে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের চরিত্রগত ও গুণগত বিকাশ সাধন ক'রে চ'লেছেন।

টিস্যুকালচার ও জৈবপ্রযুক্তির নতুন-নতুন দিক আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রসঙ্গক্রমে এসে পরে 'Transgenic plant'-এর কথা যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে জৈবপ্রযুক্তির আর একটি প্রধান বিষয় 'জেনেটিক্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর বিভিন্ন দিক। 'Transgenic plant' ব'লতে আমরা বুঝি টিস্যুকালচারের মাধ্যমে
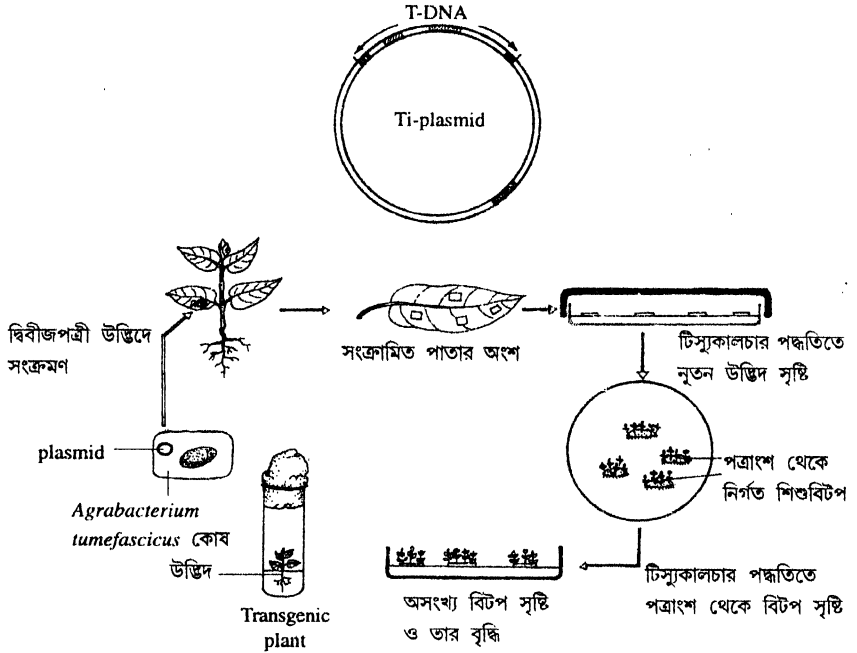
চিত্র : 'ট্রান্সজেনিক' উদ্ভিদ সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সৃষ্ট একটি উদ্ভিদ যার মধ্যে সুকৌশলে প্রতিস্থাপন করা হ'য়েছে একটি অন্য উৎসজাত এক বা একাধিক "মনপসন্দ জিন"। এই জিনের উৎস হ'তে পারে যে-কোনও জীবাণু, প্রাণী বা উদ্ভিদ।

এখন দেখা যাক্ এই Transgenic plant কীভাবে তৈরী হ'তে পারে। বিশেষ পছন্দের যে জিনটি আমরা উদ্ভিদে স্থানান্তরিত ক'রতে চাই তাকে বহন করার জন্য প্রয়োজন আর একটি DNA, যার পরিভাষা নাম 'ভেক্টর'। সাধারণভাবে ভেক্টর হিসাবে নেওয়া হয় একটি বিশেষ প্রজাতির জীবাণুজাত *(Agrabacterium tumefascicus)* প্লাসমিড Ti-plasmid । এই Ti-plasmid একটি বৃত্তাকার দ্বিসর্পিল DNA তন্তু যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ কিলো বেস। এই Ti-plasmid বিশিষ্ট জীবাণু যখন কোন দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকে আক্রমণ ক'রে তখন এই জীবাণুকোষে অবস্থিত Ti-plasmid-এর একটি বিশেষ অংশ (T-DNA) জীবাণুকোষ থেকে গ্রাহক উদ্ভিদ কোষে স্থানান্তরিত হয় এবং পরবর্তী ধাপে উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এর ফলে (T-DNA) সংশ্লিষ্ট জিনগুলির প্রকাশ গ্রাহক উদ্ভিদ কোষে ঘ'টতে থাকে, যেমন অক্সিন (উদ্ভিদ হর্মোন) প্রস্তুতকারক জিন। দেখা যায়, যে সকল উদ্ভিদ কোষে T-DNA-র একীকরণ ঘ'টেছে সেই সব কোষে বেশী পরিমাণে অক্সিন উৎপন্ন হয় এবং এর ফলস্বরূপ দ্রুত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের সেই বিশেষ অংশে একটি 'গল' বা টিউমার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের জিন প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াকে আমরা বলি Natural Gene Delivery System। সুতরাং এখন

বোঝা গেল কীভাবে T-DNA -র মাধ্যমে ইচ্ছেমত মনপসন্দ জিনকে আমরা যে কোন উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করিয়ে Transgenic plant তৈরী ক'রতে পারি। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে সংক্রমণের আগে ওই বিশেষ জিন যেন ঠিকভাবে T-DNA অংশে প্রবেশ করানো হ'য়ে থাকে। এই প্রযুক্তির দ্বিতীয় অধ্যায়ে জিন প্রতিস্থাপিত উদ্ভিদকোষ নিয়ে এক বিশেষ ধরনের টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদ তৈরী করা হয় যার মধ্যে ওই প্রতিস্থাপিত জিনের প্রকাশ ঘটে থাকে (পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্র)।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী বিজ্ঞানীরা এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন জীবাণুর সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই transgenic উদ্ভিদ তৈরীর কাজে হাত লাগালেন। প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়ল কিছু বিশেষ ধরনের উৎসেচকের। যেমন DNA কাটা বা জোড়ার কাজে ব্যবহৃত রেষ্ট্রিকশন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ এবং লাইগেজ। আজ পর্যন্ত অনেক ধরনের রেষ্ট্রিকশন এণ্ডোনিউক্লিয়েজের সন্ধান পাওয়া গেছে নানা রকমের জীবাণু কোষ থেকে। যেমন ECoR1, BamH1, Hind III ইত্যাদি। এইসব উৎসেচক বা এনজাইম DNA তন্তুতে অবস্থিত নির্দিষ্ট কতকগুলি অংশে কাজ ক'রে তন্তুকে কেটে ফেলে। DNA লাইগেজ নামক উৎসেচকটি আবার কাটা DNA-কে জোড়া লাগায়। এইভাবে DNA ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্যে দিয়ে আমরা একটি মনপসন্দ জিনকে T-DNA-র মাধ্যমে একটি উপযুক্ত উদ্ভিদে প্রতিস্থাপিত ক'রতে পারি। সুতরাং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টিস্যুকালচার-এর মিলিত প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে transgenic উদ্ভিদ সৃষ্টি করা আজ অনায়াসেই সম্ভব। আরও জানা গেছে যে-কোনও উৎস (জীবাণু, উদ্ভিদ, প্রাণী) থেকে সংগৃহীত জিন যে-কোনও উদ্ভিদে (দ্বিবীজপত্রী) প্রতিস্থাপন করা সম্ভব এবং সেই জিন সুচারুভাবে তার নির্দিষ্ট কাজও শুরু করে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ দিই।

আমরা জোনাকি পোকার শরীর থেকে রাত্রে যে আলো নির্গত হ'তে দেখি তা আসলে একটি জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। এই পোকার দেহে লুসিফারেজ নামে একটি এনজাইম বিদ্যমান তা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে লুসিফারিন নামে যৌগের উপর বিক্রিয়া ক'রে এক ধরনের আলো সৃষ্টি ক'রে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'বায়োলুমিনেসেন্স্'। এই লুসিফারেজ জিনটি সুকৌশলে পৃথক ক'রে তামাক গাছের দেহকোষে প্রতিস্থাপন করা গেছে এবং ওই বিশেষ প্রতিস্থাপিত তামাক কোষ থেকে যে পরিপূর্ণ উদ্ভিদ সৃষ্ট হয় তা লুসিফারিনের উপস্থিতিতে জোনাকির মতো আলো বিকীরণ ক'রতে সমর্থ। সুতরাং বিজ্ঞানীরা প্রমাণ ক'রতে পেরেছেন যে প্রাণীদেহস্থ জিনও প্রয়োজনে উদ্ভিদদেহে প্রতিস্থাপন করা যায় এবং তার স্বাভাবিক প্রকাশও ঘটে। এই যুগান্তকারী প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গত দুই দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণার ফলস্বরূপ অনেক transgenic উদ্ভিদ জন্ম নিয়েছে, যেমন হার্বিসাইড নিরোধক আলু, টমেটো ও তামাক গাছ। কীটপতঙ্গ নিরোধক তুলো, পাট ইত্যাদি। ছত্রাক নিরোধক আলু, টমেটো, তামাক এবং সর্বোপরি ভাইরাস নিরোধক ঢেঁড়শ, তামাক গাছ। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারী জিনের সন্ধান মিলছে নানা রকমের জীবাণু কোষ থেকে। সেই সব জিনগুলিকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে কেটে নিয়ে নির্দিষ্ট উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসে প্রতিস্থাপন করা হয়। কীট নিরোধক জিন যাকে

বর্তমানে BT জিন বলে আখ্যা দেওয়া হ'চ্ছে তা পাওয়া গেছে *Bacillus Jhuringiensis* নামক জীবাণু কোষে। এই BT জিন জৈবপ্রযুক্তির সাহায্যে তুলো গাছে প্রতিস্থাপন করা হ'য়েছে এবং এর ফলস্বরূপ transgenic তুলো গাছের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘ'টেছে। তুলোর ফল আক্রমণকারী "বোলওয়ার্ম" যখন গাছের পাতা ভক্ষণ শুরু করে তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই BT জিন এখন আরও অন্যান্য গাছে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা চ'লছে এবং শীঘ্রই আমরা কৃষিজ উদ্ভিদকূলকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা ক'রতে সক্ষম হব। এর বিশেষ সুবিধা হ'ল এই ধরণের পতঙ্গ নিরোধক্ উদ্ভিদ সৃষ্ট হ'লে বিষাক্ত কীটপতঙ্গনাশক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার দ্রুতগতিতে কমে যাবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ দূষণও ক'মে যাবে। ভাইরাস্ নিরোধক উদ্ভিদ তৈরী ক'রতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে যে ভাইরাস যে উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে সেই নির্দিষ্ট ভাইরাসের আবরণী প্রোটিনের নির্দিষ্ট জিন যদি ওই উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করা যায় তাহ'লে উৎপন্ন transgenic উদ্ভিদটিতে সেই নির্দিষ্ট ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মায়।

পরিশেষে ব'লতে হয় জৈবপ্রযুক্তির বহুবিধ মানব কল্যাণমূলক প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও মানুষ আজ এই প্রযুক্তিবিদ্যাকে মানবজাতির ধ্বংসের কাজে ব্যবহারের স্বপ্ন দেখতে শুরু ক'রেছে। আমরা দেখেছি কিভাবে এই প্রযুক্তির সাহায্যে কিছুসংখ্যক উন্মাদ লোক রাসায়নিক ও জৈব সমরাস্ত্র তৈরী ক'রতে লেগে প'ড়েছে। সুতরাং আগামী দিনের প্রজন্ম যদি এই প্রযুক্তির ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে সচেতন না হয় তবে মানবজাতির অবলুপ্তি ঘ'টতে বেশীদিন অপেক্ষা ক'রতে হবে না।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা

অদিতি বসু
অধ্যাপিকা, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

প্রবন্ধের শিরোনামটি আমাদের কাছে হয়ত একটু অপরিচিতই লাগে। সঙ্গীতকার, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ্ এবং সর্বোপরি কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর চিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনার সঙ্গে আমরা বোধহয় বিশেষ পরিচিত নই। অথচ সাহিত্য-শিল্পকলার সাধক কবির দীর্ঘজীবনের বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান তাঁকে আকর্ষণ ক'রেছে। এমনকি বিজ্ঞানবিষয়ক তাঁর যে একটিমাত্র বই 'বিশ্বপরিচয়'— তার উৎসর্গপত্রে কবি লিখছেন : 'আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।'

বাল্যকালে তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষার দুয়েকটি টুকরো ছবি তাঁরই রচনা থেকে উল্লেখ ক'রলে নিশ্চয়ই তা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'জীবনস্মৃতি'র 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ে তাঁর কথা : 'প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল।... যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।'

আরও পরবর্তীকালে যখন তিনি তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) উৎসর্গ ক'রছেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, সেখানে তিনি স্মৃতিচারণা ক'রেছেন পিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম হিমালয়যাত্রার সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার। লিখছেন : 'বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে ক'রে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে-দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন।... সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা ব'লে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি।' এই প্রবন্ধটি হ'ল 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' নামের একটি অস্বাক্ষরিত রচনা, যা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয় 'কবি' রবীন্দ্রনাথের প্রথম বড় রচনার বিষয়বস্তু কিন্তু বিজ্ঞান। তাই বলা যায় যে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল বা আগ্রহ কোনওটাই সাময়িক নয়, তা সারাজীবনই ছিল।

পিতার সঙ্গে যখন হিমালয়ভ্রমণে গিয়েছিলেন, 'প্রকটরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ' থেকে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে মুখে-মুখে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান কবিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ ক'রেছিল এবং পদার্থবিদ্যাও। ধীরে-ধীরে বালক-কবি বড় হয়েছেন, বিজ্ঞানবিষয়ক পড়াশোনাও একইসঙ্গে বেড়েছে। বেড়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিজ্ঞানসংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যাও। ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা ছোটবড় নিবন্ধও তিনি

লিখেছেন। ভারতী, বালক, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকা খুঁজলে তাঁর নানা বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় ১২৮১ থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দের মধ্যে সেগুলি প্রকাশিত। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' নামে কবি গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপক্ষীর লাথি, জীবনের শক্তি, মানবশরীর ইত্যাদি ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন ক'রেছেন। এছাড়া পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধও পাওয়া যায়।

এর কয়েকবছর পর ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে (১৩০৮বঙ্গাব্দে) কবি প্রতিষ্ঠা ক'রলেন ব্রহ্মচর্যশ্রম-এর, যা বর্তমানে পরিচিত 'পাঠভবন' নামে। তাঁর জীবনব্যাপী বিজ্ঞানচর্চাকে এবার সচেতনভাবে তিনি প্রয়োগ করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে। প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয়, পরে বিশ্বভারতীতে যে শিক্ষাদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রতে চেয়েছিলেন, সেখানে বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ল্যাবরেটরি এবং টেকনিক্যাল বিভাগ খোলার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু অর্থাভাব ছিল তাঁর বিদ্যালয়ের নিত্যসঙ্গী। সেইসঙ্গে যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবও একটা বড় বাধা ছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ে কবি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন জগদানন্দ রায়কে। এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকটি কবির পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানের অনেকগুলি সহজবোধ্য বই লিখেছিলেন, যা সে আমলে ছেলেমেয়েদের প্রচুর আনন্দও দিয়েছে। বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে কবি অনেক চিঠিও লিখেছেন জগদানন্দকে। বিভিন্ন বইও তাঁকে পাঠিয়েছেন। শুধু বই নয়, বিজ্ঞানশিক্ষার আরও একটি উপকরণের কথা এখানে উল্লেখ না ক'রলে নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বাল্যকাল থেকেই একথা আমরা আগেই বলেছি। সেই আগ্রহ তাঁর বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই কাজ ক'রেছে। ১৯৩৩ সালে কেনা হ'ল একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরবিনটি বেশ শক্তিশালী। শনির বলয় এবং উপগ্রহ, চাঁদের পাহাড়-পর্বত-উপত্যকা এইসব দেখায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নিদারুণ উৎসাহ ছিল।

আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহু পরে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর দ্বিতীয় বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্র' ১৯২৪ সালের ১ জুলাই। এই প্রসঙ্গে কবি ব'লছেন : 'অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকানির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ ক'রে ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।... সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর ইস্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা-কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি।'

তিনি আরও বলেছেন— 'শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না, গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান।... কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়া-চাড়া ক'রে এইটে ঘোচানো চাই।'

১৯৩০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কবি রাশিয়া থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন— 'আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হ'চ্ছে শিক্ষা।... এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'চ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়।... সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে

তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।... আমরা শ্রীনিকেতনে যা ক'রতে পেরেছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই ক'রছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা ক'রে যেতে পারত তাহ'লে ভারি উপকার হ'ত।'

ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালে কবির দ্বিতীয়বার জার্মানি-ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যাঁকে সাধারণভাবে সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলা যায়, সেই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-এর। তবে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ যোগাযোগ হয় ১৯৩০ সালে। কবির জীবনে সেটাই ছিল শেষবারের মত ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ। তাঁদের সেইসময় চারবার দেখা হয়। শেষ সাক্ষাৎকারের বিবরণটি লিপিবদ্ধও আছে।

এছাড়া জার্মান পদার্থবিদ হ্বার্নার হাইজেনবার্গ-এর সঙ্গেও কবির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতায় আসেন কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে। অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : "বিশ্বভারতীতে এই ঘটনার কোনও দলিল আমরা পাইনি। দেবেন্দ্রমোহনের (অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু) দিনপঞ্জিই আমাদের প্রধান ভরসা।... এই বিষয়ে আমরা একটি উল্লেখ পাই ফ্রিট্‌য়োফ কাপরার বই 'Uncommom Wisdom'-এ।... হাইজেনবার্গ নাকি শেষ বয়সে কাপরাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছিলেন।"

বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণ ছাড়াও শিলাইদহে থাকাকালীন এবং তার পরবর্তীকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কবির বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত। এছাড়া তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনার পথ-পরিক্রমা ক'রতে-ক'রতে আমরা প্রায় উপান্তে এসে পৌঁছেছি। এবারে আমরা আসব তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ প্রসঙ্গে। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮) বইটির ভূমিকায় 'বিশ্বপরিচয়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে; রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিনভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে।'

বিজ্ঞানের বই লেখার কাজে রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন মূলত লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে। লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের বই, যাকে ইংরেজিতে Popular Science -এর বই বলা হয়, ইউরোপ-আমেরিকায় তার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। বাঙ্‌লাভাষায় সে সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সে-বই রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথকেই আমরা পথিকৃৎ ব'লতে পারি।

'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, বইটি লেখার ভার তিনি প্রথমে প্রমথনাথ সেনগুপ্তর উপর দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তরুণ প্রমথনাথ শিক্ষাভবনে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই দায়িত্ব কবি পুরোপুরি নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন। এবং সেখানে তিনি সম্পূর্ণ সার্থক। কারণ কী ভাষায় লিখলে তাঁর বক্তব্য সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে, নিজে পেশাদার বিজ্ঞানী না হওয়ার ফলে তা তিনি অতি সহজে বুঝেছেন। তাই আমরা বোধহয় নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, কোনও উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীর পক্ষেও 'বিশ্বপরিচয়'-এর মতো একটি সহজবোধ্য Popular Science-এর বই লেখা রীতিমতো কঠিন।

আজীবন যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা ক'রেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই যে বিজ্ঞানচর্চাও ক'রে গেছেন, সে তো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখলাম। এমনকি, তাঁর লেখা দুটি নাটক 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'— বিশেষত 'মুক্তধারা'য় আমরা দেখি তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার ছবি।

আজ ২০০২ সালে 'সর্দার সরোবর' প্রকল্প বিষয়ে সরকারের সঙ্গে 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনকারীদের যে বিরোধ, সেই একই বিরোধের কাহিনী যেন লিপিবদ্ধ ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূট এবং শিবতরাই-এর প্রজাদের মাধ্যমে। ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটিকে আমরা দেখি, যন্ত্ররাজ বিভূতির তৈরি সেই বাঁধটার সঙ্গে সংগ্রামে উদ্যত।

'রক্তকরবী' নাটকে দেখি একটু অন্য রূপ। যক্ষপুরীতে হঠাৎ একদিন নন্দিনী নামক একটি মানবকন্যা এসে উপস্থিত হয়। কবির কথায়— 'জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক-ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়।' নন্দিনী হ'ল তেমনই একটি মেয়ে। সে রাজাকে বিনষ্ট না ক'রে রূপান্তরিত ক'রতে চায়। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভারি টেকনোলজি এবং তার আনুষঙ্গিক সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা আনয়ন ক'রেছেন।

কিন্তু এসব কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি বিজ্ঞান বা টেকনোলজির বিরোধিতা ক'রেছেন। তিনি যদি বিজ্ঞানবিরোধী মানুষ হ'তেন, তাহ'লে 'বিশ্বপরিচয়' নামক সেই অনবদ্য বইটি বোধহয় বাঙ্‌লাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রত না। তাঁর কবিতায় এ ছত্রকটিও বোধহয় থাকত না :

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
    চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখে মেললুম আকাশে
    জ্বলে উঠল আলো
গোলাপের দিকে চেয়ে ব'ললুম 'সুন্দর'—
    সুন্দর হল সে।'

আজ যখন বিজ্ঞানীরা Ecological Balance বা পরিবেবেশের ভারসাম্য নিয়ে ভাবছেন, ভাবছেন প্রকৃতিকে বাঁচাতে আরও অনেক গাছ লাগানোর কথা, তখন দেখি ঋষিপ্রতিম প্রকৃতিবিদ কবি কিন্তু বহুদিন আগে ভেবেছিলেন এই সমস্যার কথা। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব হ'য়েছিল, যা আজ প্রতি বছর ২২ শ্রাবণ অনুষ্ঠিত হয়। এবং শুধু শান্তিনিকেতনে নয়, সারা পৃথিবীতেই এখন একই কথা— গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও।

বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হ'ল হলকর্ষণ। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে হলকর্ষণের প্রয়োজন সর্বপ্রথম। তা কবি মর্মে-মর্মে অনুভব ক'রেছিলেন। শ্রীনিকেতনের ফার্ম-এ যাতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ করা যায়, তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র এবং পরে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান প'ড়তে পাঠিয়েছিলেন। এই চাষ-আবাদেরই শিল্পসম্মত রূপ হলকর্ষণ।

জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তের বছরদশেক বিজ্ঞান বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখার

বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। নবজাতক-এর 'কেন' কবিতাটিতে বা 'তিনসঙ্গী'র গল্প তিনটিতে বিজ্ঞানের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা বিষয়ে আলোচনা ক'রতে-ক'রতে তাঁর নানা রচনার উল্লেখ করা হ'ল। তাঁর গল্প, তাঁর নাটক, তাঁর প্রবন্ধ, তাঁর গান এমনকি তাঁর শিক্ষাচিন্তাতেও বিজ্ঞান ঘুরে-ঘুরে এসেছে। তবুও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। তাই তিনি বাস করেন আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। এবং তিনি আমাদের আপনজন। তাই নিশ্চিন্তে তিনি ব'লতে পারেন একথা :

'মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদের লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।'

উল্লেখপঞ্জী

১. 'বিশ্বপরিচয়' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. 'জীবনস্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. পত্রাবলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. বাংলাভাষা-পরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. শ্যামলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. সেঁজুতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭. রক্তকরবী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮. রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান : দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৯. রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী বন্ধু (প্রবন্ধ) : শিশির মুখোপাধ্যায়
১০. বিশ্বভারতীর উৎসব : সুশীলকুমার মণ্ডল

লেখক পরিচিতি

সুজিত বসু

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর থেকে আগত অধ্যাপক সুজিত বসু (জন্ম ১৯৪৬) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণপদকসহ স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে, ১৯৬৭ সালে কোলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। পরের বছর তিনি আমেরিকার চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে পাড়ি দেন এবং সেখান থেকে ১৯৭১ সালে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। এরপর দু'বছর ধরে ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডার মন্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কাজ সমাপ্ত ক'রে ১৯৭৩ সালে স্বদেশে ফিরে পুনরায় অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। পুনরায় অধ্যাপনার কাজ শুরু ক'রে দেন। প্রায় তিন দশক ধ'রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চ'লতে থাকে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট, খড়গপুরের আই.আই.টি., কোলকাতার আই.আই.এম.সি. ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। উপাচার্যপদে যোগদানের পূর্বে তিনি ভারতীয় সামরিক বিভাগের অধীনে এন.আই.এম.সি. নামে পরিচালন-ব্যবস্থাবিদ্যার ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে অধ্যাপক বসু সম্ভাবনা-তত্ত্ব, নির্ভরযোগ্যতার সূত্র, পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্তের তত্ত্বগুলি নিয়ে গবেষণারত এবং স্বদেশের জাতীয় স্তরে পরিসংখ্যানতত্ত্ব বিদ্যার ইন্‌স্টিটিউটগুলির আহ্বায়ক অধ্যাপক এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 'জাতীয় প্রকল্পের' সরকারী উপদেষ্টা। তাঁর মূল্যবান গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আর্ন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তাঁকে আমেরিকা, কানাডা, চীন, জাপান, ইরান প্রভৃতি দেশে অধ্যাপনা ও বক্তৃতার কাজে যেতে হয়। অধ্যাপক বসু ২০০১ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন।

ড: পার্থ ঘোষ

অধ্যাপক ঘোষ ১৯৬১ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক হ'য়ে ১৯৬৩ সালে লণ্ডনের ইম্পারিয়াল কলেজ থেকে বিশেষ স্নাতকতা লাভ করেন। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের কাছে গবেষণায় সফল হ'লে ১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদান করেন। ন্যাশানাল আকাদেমি অফ্ সায়েন্স (ভারত), ওয়েস্ট বেঙ্গল আকাদেমি অফ্ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ফেলো হিসাবে ছিলেন। বিজ্ঞান প্রচারের জন্য ভারতীয় জাতীয় সায়েন্স আকাদেমি কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার (২০০০) ইত্যাদি নানান পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ভারতীয় ফিজিক্স অ্যাসোসিয়েসন (কোলকাতা)-এর চেয়ারম্যান ও ভারতীয় ফিজিক্স সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। তিনি কুইন এলিজাবেথ (II) কর্তৃক অনারারি মেম্বার অফ্ ব্রিটিশ এম্পায়ার সম্মানে ভূষিত হন। দীর্ঘদিন তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিভাগে অধ্যাপনা করেন।

কোয়ান্টাম থিওরিতে ড: ঘোষের অবদান প্রায় সমস্ত নতুন বইয়ে গৃহীত হ'য়েছে। তিনি এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত "ডাব্‌ল প্রিজম্ এফেক্ট" প্রচারিত হয় ভারতীয় দূরদর্শনের "টার্নিং পয়েন্ট" অনুষ্ঠানে। অনেক অনুষ্ঠান পরিচালনার মতো ১৯৯৫ এর পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ডায়মণ্ড হারবার থেকে টি.ভি. অনুষ্ঠানে প্রচারিত আর্ন্তর্জাতিক মানের বক্তৃতাও চিত্তাকর্ষক হয়।

ড: ঘোষ এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে সমান ভাবে সঙ্গীত সাধনা ক'রেছেন। তিনি ভি. বালসারার কাছে যন্ত্রসঙ্গীতে এবং দেবব্রত বিশ্বাস, শান্তিদেব ঘোষ-দের মতো ব্যক্তিত্বের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিয়মিত তালিম নিয়েছেন।

তাঁর রচিত "ট্রাডিশন এণ্ড ক্রিয়েটিভিটি ইন টেগোর সঙ্" প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের যোগসূত্রকে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার এস.এন. বোস ন্যাশনাল সেণ্টার ফর বেসিক সায়েন্স, সল্টলেক প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত প্রোফেসর এবং আকাদেমিক প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বে রয়েছেন।

সমর বাগ্‌চী

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে স্নাতক হ'য়ে ধানবাদ মাইনিং কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন শেষ ক'রে দেশের বিভিন্ খনি অঞ্চলে মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করেন। এর কিছুদিন পর বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিজ্ঞান যাদুঘরের ডিরেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এক সময় তিনি সমগ্র পূর্বভারতের সমস্ত বিজ্ঞান যাদুঘরগুলির দায়িত্বে ছিলেন। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 'কোয়েস্ট' নামে যে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি টি.ভি.তে প্রচারিত হয় তিনি তার অন্যতম সদস্য।

শিক্ষাজগতে আপামর স্কুলপড়ুয়া কিশোরদের কাছে বিজ্ঞানকে সহজ ক'রে, কৌতূহল ভরে, গ্রহণযোগ্য করার কাজে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পূর্বভারতের বিভিন্ন স্কুলগুলির মধ্যে বিজ্ঞান জাগৃতির সৃষ্টিমূলক প্রতিযোগিতার প্রবর্তন ও পরিচালন নিজে উপস্থিত থেকে তদারকি করা ছিল তাঁর ডিরেক্টর পদে থাকাকালীন প্রধান কাজ। বর্তমানে তিনি NCSTC নেট্‌ওয়ার্কের 'জাতীয় কিশোর-বিজ্ঞান কংগ্রেসের' সভাপতির পদে আসীন। এখনও তিনি শিক্ষা, বিজ্ঞান, পরিবেশ এবং সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে অদ্যাবধি প্রত্যক্ষভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ত।

ড: কালীশঙ্কর মুখার্জ্জী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। কৃতিত্বের সাথে রসায়ন শাস্ত্রে এম.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না জৈব রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় ডি.এস.সি.; এফ.এন.এ-এর অধীনে উদ্ভিজ্জ-রসায়নে গবেষণা ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন, পরে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন প্রথমে সরকারি কলেজে পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে বিশ্বভারতীর রসায়ন বিভাগে কর্মরত আছেন। অধ্যাপক ড: মুখোপাধ্যায় রসায়ন বিভাগের প্রধান ও শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। অধ্যাপক ড: মুখোপাধ্যায় গত চল্লিশ বছর ধরে উদ্ভিজ্জ-রসায়নে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক ভেষজ উদ্ভিদের উপর রসায়নিক পরীক্ষা করেন এবং পঁচিশটির বেশী নতুন জৈব যৌগের আবিস্কার করেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রিকায় শতাধিক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন এবং তাঁর অধীনে বহু ছাত্র গবেষণা ক'রে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

সুশীলচন্দ্র পাল

অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র পাল (জন্ম ১৯৪১) বেলুড় মঠের বেলুড় হাইস্কুল থেকে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে স্কটিশ চার্চ থেকে স্নাতক ও কলকাতার সায়েন্স কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী

লাভ করেন। জীবাণুপুঞ্জ নিয়ে গবেষণা ক'রে মাইক্রোবায়োলজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। কিছুদিন নৈহাটী কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৭০ সালে বিশ্বভারতীর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। অধ্যাপনা চলাকালীন তিনি মাটির এবং খাদ্যবস্তুর জীবাণুদের উপকারী ও অপকারিতা সংক্রান্ত নানা গবেষণা করেন। এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা আজও চলছে। তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকায় বিশেষ সমাদৃত হ'য়েছে। দেশের প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপনা ও গবেষণা সংক্রান্ত পরীক্ষক হিসেবে এবং আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন। এ ব্যাপারে বিদেশেও বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে বক্তৃতার জন্য যেতে হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন জীবন বিজ্ঞান বিভাগের আহ্বায়ক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর এই বিশেষ গবেষণার কাজের জন্য ১৯৯৩ সালে ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটি থেকে এবং ২০০২ সালে জাতীয় এনভায়রণমেন্টাল অ্যাকাডেমি থেকে বিশেষ ফেলোশিপ পুরস্কার ও স্বর্ণপদক পেয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত হন।

আলোক সেনশর্মা

শ্রী সেনশর্মা ১৯৪৬ সালে বীরভূমের বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬১ সালে স্থানীয় বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে গণিত শিক্ষার জন্য হেতমপুর কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালে গণিতে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৬৬ সালে বিশ্বভারতীর শিক্ষাসত্রে গণিত বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার কাজ চলাকালীন তিনি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন ক'রে ১৯৭০ সালে গণিতে স্নাতকোত্তর এবং পরের বছরগুলিতে বি.এড্, এম.এড্ ইত্যাদি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হ'ল 'গণিত শিক্ষা'র বিভিন্ন দিক। এ বিষয়ে তিনি ১৯৯৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। তাঁর লেখা ২৪টিরও বেশী প্রবন্ধ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জাতীয় গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে।

বর্তমানে তিনি শিক্ষাসত্রে অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বভারতীতে পি-এইচ.ডি. গাইড হিসাবে গবেষণার কাজে যুক্ত আছেন।

অমিতাভ দত্ত

অধ্যাপক দত্ত (জন্ম ১৯৪৭) বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। শ্রীদত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় ১৯৬৯ সালে স্নাতক হ'য়ে বিশ্বভারতী থেকে পদার্থবিদ্যায় ১৯৭১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং উক্ত বিভাগ থেকেই ১৯৭৪ সালে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গবেষণার পর ১৯৮১ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৮৬ সালে আলেকজাণ্ডার ভন্ হামবোল্ট ফেলোশিপ ও ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ইতালীর ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল পদার্থবিদ্যার সদস্য ছিলেন। ২০০০ থেকে ২০০২ সাল অবধি বিশ্বভারতীর পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত থাকার পর পুনরায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হ'ল 'মৌলকণা বিজ্ঞান'। এ-বিষয়ে তাঁর ৬০টিরও বেশী গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে।

শান্তনু রায়

অধ্যাপক শান্তনু রায় সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এস-সি. উত্তীর্ণ হ'য়ে যথাক্রমে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস-সি. অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। এরপর থেকে গবেষণার নানান কাজে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং আমেরিকার জার্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত ছিলেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় হ'ল 'বাস্তুবিদ্যার রূপরেখা নির্ণয়'। এই বিষয় নিয়ে স্বদেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা চল্লিশটির মত। নেদারল্যাণ্ড এবং আমেরিকার মিচিগান থেকে প্রকাশিত একাধিক বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বপদে সম্মানিত হ'য়েছেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বভারতীর প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন।

রূপকুমার কর

অধ্যাপক কর (জন্ম ১৯৫৬) বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে উচ্চমাধ্যমিক ও ১৯৭৬ সালে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে ১৯৮৮ সালে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় হ'ল 'উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা'। বর্তমানে শ্রীকর উদ্ভিদের বার্ধক্যজনিত পরিবর্তন, জলাভাব বা খরার প্রভাব, অঙ্কুরোদ্‌গমে বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা ক'রছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক কর ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং সেখান থেকে ১৯৯০ সালে বিশ্বভারতীর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে উক্ত বিভাগেই রীডার পদে কর্মরত।

নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৫৪) ১৯৭২ সালে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্বর্ণপদকসহ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন ক'রে ১৯৮৩ সালে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল অবধি নানান ফেলোশিপে কোষতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেন। আরও উন্নতমানের অনুরূপ গবেষণার জন্য তিনি ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল অবধি বেলজিয়ামের ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। বিভিন্ন কলেজে ও গবেষণাগারে অধ্যাপনার পর ১৯৯০ সালে বিশ্বভারতীর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কোষতত্ত্ব ও জৈবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বহু গবেষণাপত্র ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে। বর্তমানে তিনি রীডার পদে বিশ্বভারতীর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজের সঙ্গে যুক্ত র'য়েছেন।

অদিতি বসু

কোলকাতার হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট থেকে কলাবিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাঙলায় স্নাতক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। গত দু'দশক ধ'রে বিশ্বভারতীর শিক্ষাসত্রে বাঙলা অধ্যাপিকার কাজে নিযুক্ত আছেন।

প্রবাহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষাসত্র : বিশ্বভারতী

২০০৩

৩

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞান সভার বক্তৃতা

মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্ক হরমোনের ভূমিকা

সমীর ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

আজকের সভার আলোচ্য বিষয়টি জীববিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্গত। আজকাল যার নাম দেওয়া হ'য়েছে 'বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ'। এতদিন মানুষের আচরণ সম্বন্ধে যে-সব আবিষ্কার হ'য়েছে সেগুলি শিল্প, সাহিত্য এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে এর একটা উত্তর পাওয়া যাবে তা ভাবা যায়নি।

মানুষের আচরণ বলতে আমরা বুঝি যে, আমাদের আশেপাশে যারা থাকে, তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার এবং আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহার। এরই ভিত্তিতে আমরা মানুষের স্বভাবের শ্রেণীবিভাগ ক'রতে পারি। যেমন মানুষের স্বভাব খিটখিটে হ'তে পারে কিম্বা রাগী অথবা শান্ত ধীরস্থির হ'তে পারে আবার সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে একেবারে পাগলও হ'য়ে যেতে পারে। পাগল অর্থে আমরা তাদেরই বুঝি যাদের মানসিক স্থিরতা নেই, নিয়ন্ত্রণ-বিহীন মস্তিষ্কই তাদের চিন্তার ভারসাম্যকে নষ্ট ক'রে দেয়। মানসিক অবস্থা কিভাবে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেমন--- ছাত্ররা যখন পরীক্ষা দিতে যায় তখন তাদের মধ্যে কোনো-কোনো ছাত্রকে অত্যন্ত বিচলিত হ'তে দেখা যায়, কারও বা গলা শুকিয়ে যায়, জল তেষ্টা পায় বা হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। আবার এমন ছাত্রও দেখা যায় যে, সে কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। এই বৈপরীত্যের কারণ একটা হ'তে পারে যে মানুষের মনের স্থিরতা নির্ভর করে মানসিক ভারসাম্যের উপর। তাহ'লে মানসিক ভারসাম্য নির্ভর করে কিসের উপর? আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষার উপর না অন্য কোনো কারণে?

আজ থেকে মাত্র বারো বছর আগেও জীববিজ্ঞান-এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। 'মানুষের স্বভাব কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়' এই প্রশ্নের অজানা উত্তরের সন্ধানে গবেষণার সূচনায় কেউই জানতেন না যে তাঁরা কোন্ পথে এগোচ্ছেন। এই গবেষণা মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক, জীবনবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিদ এই তিন শাখার বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছিল। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ডাক্তারগণ। তাঁরা লক্ষ্য ক'রলেন একজনের সঙ্গে অন্যজনের সহ্যশক্তির তফাৎ র'য়েছে। কেউ হয়ত পায়ে গুলি লেগে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে আবার অন্যজনের পায়ে ঐ একই জায়গায় গুলি লাগার পরও অনায়াসে লড়াই ক'রছে। এই সহ্যশক্তির তারতম্য কেন হয় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই নতুনকরে ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত হ'ল।

এরপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হ'ল উদ্ভিদজাত পদার্থ 'মরফিন' যা ব্যথা বেদনা উপশম করে। কিন্তু প্রাণীদেহে মরফিনের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাহ'লে প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বস্তুটি (মরফিন) বিক্রিয়া ঘটায় কেন? গবেষণায় দেখা গেল যে মস্তিষ্কের গায়ে এক বিশেষ ধরনের 'রিসেপ্টর প্রোটীন'[১] থাকে যা মরফিনকে কোষের গায়ে লেগে থাকতে সাহায্য করে।

অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোষে এমন একটি 'বস্তু'র উৎপত্তি হয় যার অনেকটা মিল আছে মরফিনের সঙ্গে। এই 'বস্তুটি' কি তা দেখার জন্য বহু বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেন। এঁদেরই একজন হ'লেন সলোমন স্লাইডার। তিনিই প্রথম একটি বানরকে আঘাত করে তার মস্তিষ্কের ব্যথাবেদনার অনুভূতির অংশ থেকে কিছু কোষ বের করে নিয়ে তার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটীন বা পেপটাইড[২] দেখতে পান যেগুলি ১৬টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। এর থেকে তাঁর ধারণা হয় যে এই প্রোটীন বা পেপটাইডগুলি বানরের মস্তিষ্কের আঘাতকে প্রশমিত ক'রতেই তৈরি হয়। তিনি এর নাম দেন 'এনকেফালিন' (Encephalin)।

এরপর আমেরিকাবাসী চীনা বিজ্ঞানী সি.এইচ.লী শুয়োরের মস্তিষ্কে ও পিটুইটারী গ্রন্থিতে ৯১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত একপ্রকার প্রোটীনের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এই ধরনের প্রোটীনের কাজ হ'ল ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় বস্তুকে সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে সাহায্য করা। অর্থাৎ এই ধরনের প্রোটীন যার শরীরে কম থাকবে সে কম খেলেও মোটা হবে আর যার শরীরে বেশী থাকবে সে বেশী খেলেও রোগাই থাকবে। তিনি এইপ্রকার হরমোনের নাম দেন 'লাইপোট্রপিন'। লী কখনোও ভাবেননি যে এই হরমোন দিয়ে মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ ঘটবে। তিনি ভেবেছিলেন যে 'মোটা হওয়ার সমস্যা'র সমাধান এই লাইপোট্রপিনের দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে। তাঁর মনে হ'ল যে এমন কোনো প্রাণী নিশ্চয়ই থাকতে পারে যে খায় বেশী কিন্তু মোটা হয় না। দেখা গেল এই ধরনের একটি প্রাণী 'উট' যার মেদ জমে না। কিন্তু উটের মস্তিষ্ক থেকে পাওয়া গেল ৩১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি বিশেষ প্রোটীনটি। এই ৩১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড শুয়োরের মস্তিষ্কে পাওয়া লাইপোট্রপিন গঠনের শেষের দিকের অংশগুলির সদৃশ কিন্তু কাজ ভিন্ন। এটি প্রাণীদেহে প্রয়োগ ক'রলেই প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ে বা খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। এই ঘটনা থেকে অনুমান করা হ'ল যে, ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণা ইত্যাদি উপশম ক'রতে এই ধরনের ৩১টি অ্যাসিডে তৈরি পেপটাইড মস্তিষ্কে তৈরি হয়। এই পেপটাইড বা প্রোটীনটির নাম দেওয়া হ'লো 'এন্ডোর্ফিন' (Endorphin— অন্তর্জাত মরফিন বা Endogenous morphin এই অর্থে)। অন্যদিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী হুক্‌স, ভেড়ার মস্তিষ্ক ও পিটুইটারী পরীক্ষা ক'রে এমন একরকম পেপটাইডের সন্ধান পেলেন যার অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা এণ্ডোর্ফিনের থেকেও কম। হুক্‌স পুনরায় এই পেপটাইডটির নাম দিলেন 'এন্‌কেফালিন'। প্রাণীদেহে 'এনকেফালিন' প্রযোগ ক'রে দেখা গেল ব্যথার অনুভূতি এতেও নষ্ট হয়।

এইবার বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইলেন যে মানসিক ভারসাম্যের তারতম্য ঘটাতে এই বিশেষ পেপটাইড বা এণ্ডোর্ফিনের কোনো প্রভাব আছে কিনা? সুইডেনের একটি হাসপাতালে কিছু মানসিক রোগীকে এনে তাদের স্পাইনাল কর্ড থেকে কিছুটা করে ফ্লুইড বের ক'রে নেওয়া হ'ল। কেননা মানুষের মস্তিষ্ক তো আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। তাই স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে যে ফ্লুইড বা তরলপদার্থ থাকে তার থেকেই মস্তিষ্কের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। যাইহোক এই সমস্ত রোগীদের স্পাইনাল ফ্লুইডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এণ্ডোর্ফিন পাওয়া গেল। ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে জন্ম নিল এক নতুন প্রশ্নের। তাহ'লো— এণ্ডোর্ফিনের আধিক্যের ফলেই কি মানুষ পাগল হ'য়ে যায়? এরপর এণ্ডোর্ফিনের 'অ্যান্টিবডি'[৩] তৈরি ক'রে কয়েকজন মানসিক

রোগীকে প্রয়োগ ক'রে দেখা গেল যে দু'দিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হ'য়ে উঠছে। এইভাবে বোঝা গেল এণ্ডোর্ফিন বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। ক্রমশঃ বিভিন্ন গবেষণাগার থেকে কয়েকধরনের এণ্ডোর্ফিন আবিষ্কার হ'ল। এগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হ'ল। যথা আল্‌ফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ)। দেখা গেল 'বিটা-এণ্ডোর্ফিন' মানুষের মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে, বিপদে মানুষের বুদ্ধিকে স্থির রাখতে সাহায্য করে। আল্‌ফা-এণ্ডোর্ফিনের ক্রিয়াকলাপ অনেকটা 'বিটা-এণ্ডোর্ফিনে'র মতই। কিন্তু 'গামা-এণ্ডোর্ফিনে'র আধিক্যে মানুষ ক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। ইদানীংকালের গবেষণায় দেখা গেছে যে মোটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিটা-এণ্ডোর্ফিন বাড়তে শুরু করে। অর্থাৎ বিটা-এণ্ডোর্ফিন খাবার লোভকেও বাড়িয়ে দেয়।

বিজ্ঞানী ব্লুমস্ 'বিটা-এণ্ডোর্ফিনে'র মত একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি ক'রে তার নাম দিলেন 'ন্যালেক্‌সন'। এই ন্যালেক্‌সন যখন কোষে পৌঁছয়, তখন কোষ ভাবে, এটাই বুঝি এণ্ডোর্ফিন এবং তাকেই রিসেপ্টরের সাহায্যে গ্রহণ করে ফলে কোষে পরে সত্যিকারের এণ্ডোর্ফিন গেলেও তা কোষে আর প্রবেশ ক'রতে পারে না। এইভাবে ন্যালেক্‌সন প্রয়োগ ক'রে দেখা গেল যে প্রাণীরা কিছুই খেতে চায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমরা যা কিছু চিন্তা করি না কেন তার অনেক কিছুই এণ্ডোর্ফিনের উপর নির্ভর ক'রছে এমনকি খাওয়ার ইচ্ছের কথা পর্যন্ত। বস্তুতপক্ষে সেই ৯১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত 'লাইপোট্রপিন'ই (যা প্রথমে শুয়োর থেকে আবিষ্কৃত) যাবতীয় ক্রিয়াকলাপকেই নিয়ন্ত্রণ ক'রছে। মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কতগুলি এনজাইম আছে যেগুলি সময়তমত ৯১টি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ভাঙে এবং তারা মানুষের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে কাজ করে। মানসিক বিকৃত রোগীদের ক্ষেত্রে বিটা-এণ্ডোর্ফিন প্রয়োগ ক'রে তাদের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'য়েছে। এণ্ডোর্ফিন থেকে গামা (γ) অংশটুকু বেরিয়ে গিয়ে শরীরে কাজ শুরু ক'রলে প্রাণী ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু বিটা (β)-এণ্ডোর্ফিন প্রয়োগ করা মাত্রই সে শান্ত হ'য়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের মতে আল্‌ফা-এণ্ডোর্ফিনের কাজ বিটা-এণ্ডোর্ফিনের মতই অর্থাৎ খুব শান্ত, ধীরস্থির করা। মস্তিষ্কের যে-সমস্ত কোষ এবং এনজাইম ঐ ৯১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত পেপটাইড্‌কে ভেঙে এণ্ডোর্ফিন তৈরি করে, সেগুলির কাজ করার ক্ষমতা মানুষের চিন্তার উপর নির্ভর করে।

দেখা যাচ্ছে যে একই হরমোন 'বিটা-এণ্ডোর্ফিন' মানসিক বিকৃতিও ঘটায় এবং ক্ষিদেও বাড়ায়। এর কারণ হরমোনটির পরিমাণের উপরই এই বিভিন্নতা নির্ভর করে। অন্যদিকে 'লাইপোট্রপিন' প্রয়োগ করলে 'মোটা হওয়া' কমানো নিয়ে চিন্তা থাকে না। কিন্তু এই লাইপ্রোট্রপিন খুবই অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন ১০০০টি শুয়োর থেকে সংগ্রহ ক'রলে তার পরিমাণ হবে ৫ মাইক্রো গ্রাম। সুতরাং বাজারে লাইপোট্রপিন পাওয়া গেলেও তা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না এর অতিরিক্ত আর্থিক মূল্যের জন্য। অতএব 'জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং'[৪] এর সাহায্যে ইনস্যুলিন এর মত লাইপোট্রপিনকে যতদিন না কৃত্রিমভাবে তৈরি সম্ভব হ'চ্ছে ততদিন এই লাইপোট্রপিন সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবে না।

আমাদের মন যে-কোনো রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে একথা আমরা সহজে বিশ্বাস ক'রতে পারি না। মানুষের যে বিশেষ মানসিক শক্তি আছে যার সাহায্যে সে বিভিন্ন

অবস্থাকে মানিয়ে চ'লতে পারে সেগুলিই মস্তিষ্কের কোষে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ গঠনে সাহায্য করে। মানসিক দুর্বলতায় এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভিন্ন ধরনের হ'য়ে অসুস্থতা সৃষ্টি ক'রতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে মানুষ অশান্তিতে ভোগে তার ক্ষিদে কমে যায় অর্থাৎ দরকারী এনজাইমগুলি নিঃসৃত হয় না— ফলে অ্যাসিডিটি বাড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সকলক্ষেত্রেই মনের সঙ্গে একটা সংযোগ থাকছেই। কিন্তু এই মন, শরীর এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণের যে সংযোগ তা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটাই অনাবিষ্কৃত র'য়ে গেছে।

বিজ্ঞানসভা: ২৮.২.৮৪ : শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী : প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

সংকেতসূত্র

১ রিসেপ্টর প্রোটীন— যে সব ওষুধ বা হরমোন আমাদের দেহের কোষের অন্তর্গত কাজকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে, তারা হয় কোষের বাইরের পর্দায় অথবা কোষের ভেতরে কোনো প্রোটীন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। যে প্রোটীন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয় সেই প্রোটীনকে বলা হয় রিসেপ্টর প্রোটীন।

২ প্রোটীন ও পেপটাইড— অ্যামাইনো অ্যাসিড ২০ ধরনের আছে। এরা একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে পেপটাইড্ ও প্রোটীন তৈরি হয়। পেপটাইডে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা সাধারণত প্রোটীন থেকে কম থাকে, তাছাড়া পেপটাইডে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো সোজা সুতোর মত একে অন্যের সঙ্গে লেগে থাকে। অন্যদিকে প্রোটীন অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি পেপটাইডের মতো তো জুড়ে থাকেই এমনকি বিভিন্ন আকৃতিতেও সজ্জিত থাকে। যেমন সুতোর মতো সোজা না থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো বেঁকে, জড়িয়ে নানান্ আকার নিতে পারে। সেই আকার যাইহোক না কেন, প্রত্যেক প্রোটীনের একটি বিশেষত্ব তাতে থাকে।

৩ অ্যান্টিবডি— দেহের বিশেষ কোনো প্রোটীন বা পেপটাইডের কাজকে বন্ধ করার জন্য সেইসব প্রোটীনের অ্যান্টিবডি শরীরের ভেতর তৈরি হয়। দেখা গেছে অ্যান্টিবডিও একটি প্রোটীন জাতীয় বস্তু। কোনো বিশেষ প্রোটীনের সেই অনুযায়ী অ্যান্টিবডি তৈরি হ'লে, এই অ্যান্টিবডি উক্ত প্রোটীনের সঙ্গে লেগে গিয়ে তার কাজ করার ক্ষমতাকে বন্ধ ক'রে দেয়।

৪ জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং— যে পদ্ধতি কৃত্রিম জিন (Gene) তৈরি করে সেই জিনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় প্রোটীন তৈরি করা হয়।

কোষ : সামগ্রিক ধারণা ও আণুবীক্ষণীক গঠন

শেলী ভট্টাচার্য
অ...পিকা প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা যে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ (Advance knowledge in Life Science) ক্লাসের আয়োজন ক'রেছ আজ তার প্রথম দিন। এইরকম একটা আয়োজনে তোমাদের কাছে আজ আসার সুযোগ পেয়ে বেশ একটা আনন্দ বোধ ক'রছি। পরবর্তী ক্লাসের শিরোনামগুলি দেখে বেশ বুঝতে পারছি যে জীবনবিজ্ঞান বিষয়টি তোমাদের বিশেষ আকর্ষণ ক'রেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চ'লতে গেলে এই ধরনের বিজ্ঞান সভার অত্যন্ত প্রয়োজন, একথা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম অগ্রগতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার অন্যতম পথ এই বিজ্ঞান সভা। তোমাদের চেষ্টার ও উদ্যোগের সাফল্যে শুভকামনা জানাই। যাক, সময় নষ্ট ক'রব না, আমার জন্য যে বিষয়টি রেখেছ সেই বিষয়ের আলোচনায় আসি। কোষতত্ত্বের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ যা কিনা জীবনবিজ্ঞানের আজ এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এবং এত বিশাল ব্যপ্তি যে দু'একটি আলোচনা-সভায় তা শেষ করা সম্ভবও নয়। অতএব আমি এ-সম্বন্ধে তোমাদের এমন কিছু ব'লব যা তোমাদের নিয়মমাফিক পাঠ্যপুস্তকে নাও থাকতে পারে।

প্রথমেই বলি **'জীবনবিজ্ঞান'** ধারণাটির জনক স্বয়ং অ্যারিস্টটল অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের গুরু। সে-যুগে (ধরে নিতে পারো খ্রীঃপূঃ ৫০০ বছর) মানুষ কেবল দেখত জন্তু-জানোয়ার আর গাছপালা। অ্যারিস্টটল প্রথম দেখলেন দু-রকমের জন্তু— কিছু জন্তু আছে যাদের কাটলে লাল রঙের রস বের হয়, বাকী আর একধরনের প্রাণীদের কাটলে সাদাটে রস বের হয়। কেঁচো থেকে শুরু ক'রে মেরুদণ্ডী পর্যন্ত প্রাণীদের দেহে লাল রঙের যে দেহরস থাকে তার নাম রক্ত। তোমরা নিশ্চয় জানো যে ঐ রসে হিমোগ্লোবিন দ্রবীভূত থাকে ব'লে ঐ দেহরসের রং লাল

- গ্যালিলিও : ১৬০৯ দূরবীন যন্ত্র
- টোলেমি এবং কোপারনিকাস : সমকালীন বৈজ্ঞানিক
- গ্যালিলিও : ১৬১০ সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র
- রবার্ট হুক : ১৬৬৫ জটীল অণুবীক্ষণ যন্ত্র
- অ্যান্টনি ভন্ লিউয়েনহুক : ১৬৬৫ পুকুরের জলে এককোষী আণুবীক্ষণীক জীবের উপস্থিতি
- ফন্টানা : ১৭৮১ কোষের মধ্যে ডিম্বাকৃতি অংশসমূহের উপস্থিতি
- রবার্ট ব্রাউন : ১৮৩৩ নিউক্লিয়াস
- পারকিন্‌জি : ১৮৩৯ প্রোটোপ্লাজম
- স্লাইডেন : ১৮৩৯ উদ্ভিদ কোষ
- সোয়ান : ১৮৩৯ প্রাণীকোষ
- স্লাইডেন এবং সোয়ান : ১৮৪৫ কোষ সূত্রে (Cell theory) প্রচারিত।
  'বিভিন্নতার মধ্যে একতা'র তত্ত্ব। যার অর্থ কোষ নিজে একা-একা সব কাজ করতে পারে আবার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের দেহে সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্রে একটি কাজ করতে পারে।
- ভিরচো : ১৮৫৫ *Omni cellula e cellula* প্রত্যেকটি কোষ আর-একটি কোষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র ১ : আবিষ্কার তালিকা

হয়। অন্যদিকে প্রজাপতি এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের দেহরস সাদাটে কিংবা শামুক, চিংড়ি ইত্যাদি প্রাণীর নীলচে। অ্যারিস্টটল চিন্তা ক'রে দেখলেন যে এই বিশেষত্বের ভিত্তিতেই প্রাণীদের একটা শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। এইভাবেই জীবনবিজ্ঞান চর্চার শুরু সেই অ্যারিস্টটলের যুগ থেকেই।

এখানে কতকগুলি সালের একটি তালিকা দেখতে পাচ্ছ। আর এই তালিকা দেখেই বুঝতে পারছো যে বিশেষভাবে '**জীবন**' সম্বন্ধে জানার শুরু কবে থেকে? এই প্রসঙ্গে তোমাদের জানা আর-একজনের নাম স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি হ'লেন গ্যালিলিও। তোমরা জান নিশ্চয় যে তিনি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপের আবিষ্কর্তা। তাঁর তৈরি টেলিস্কোপের সাহায্যে সর্বপ্রথম আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে তখনকার সেই প্রচলিত ধারণাকে দিলেন পাল্টে। ওই সময় 'সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে'— টোলেমির প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদকে প্রতিবাদ ক'রে কোপারনিকাস ব'ললেন ঠিক উল্টো। অর্থাৎ 'পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ ক'রছে'। কোপারনিকাসের এই মত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ আবিষ্কারের জন্যই। তাই আজ গ্যালিলিও আমাদের কাছে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

তিনি যে শুধু দূরের জিনিস দেখার জন্য টেলিস্কোপ তৈরি ক'রেছিলেন তা নয়, ১৬১০ সালে তিনি সহজ সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যার সাহায্যে মাটির তলায় বাসকরা ছোট্ট-ছোট্ট প্রাণী এবং গাছের পাতার চেহারাগুলো আরও স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাওয়া গেল। গ্যালিলিওর এই আবিষ্কারের আগে মানুষ কিন্তু এসব কিছুই দেখতে পায় নি। কেননা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এত বিস্তারিত চেহারা দেখতে পাওয়া সম্ভবও নয়।

গ্যালিলিওর পর এলেন রবার্ট হুক— ১৬৬৫ সালে। তোমরা যারা জীবনবিজ্ঞান নিয়ে প'ড়বে তাদের সারাজীবন এই নামটি মনে রাখতে হবে। কেননা যা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা— 'কোষ', স্বয়ং রবার্ট হুক-ই প্রথম তাঁর নিজের তৈরি মাইক্রোস্কোপ-এর সাহায্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে '**কোষ**' শব্দটি প্রচলন করেন।

কী ছিল তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। কর্ক অর্থাৎ শিশি-বোতলে যা ছিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। কর্ক তো গাছেরই অংশ। সেই কর্ককে তিনি টুকরো-টুকরো এবং পাতলা করে কেটে নিজস্ব তৈরী মাইক্রোস্কোপ-এর নীচে রেখে দেখতে পেলেন কতকগুলি প্রাচীরযুক্ত মুক্ত জায়গা। এই যে প্রাচীর যুক্ত ফাঁকা জায়গা বা প্রাচীরবেষ্টিত গহ্বর, সেইগুলির নাম দিলেন '**সেল**' যার অর্থ হ'ল প্রকোষ্ঠ বা Compartment। মানে ঘরের যেমন একটা পরিধি আছে যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য এই প্রকোষ্ঠগুলিতেও র'য়েছে, তাই নাম দিলেন 'Cell' মাইক্রোস্কোপের নীচে যা তাঁর মনে হ'য়েছিল এক-একটা উন্মুক্ত কম্পার্টমেন্ট।

আজ তোমরা জেনেছ কোষ কেবলমাত্র উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠই নয় বরং সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে থাকে আরও অনেককিছু অংশ যেমন সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন কোষ পর্দা আরও কত অংশ। রবার্ট হুক কিন্তু এত সব কিছুই দেখতে পান নি সেদিন। কেননা কর্ক তো মৃত কোষ দিয়ে তৈরি। ফলে মৃত কোষে প্রাচীর ছাড়া আর কিছু তাঁর নজরেই পড়েনি।

ঠিক এই একই সময়ে, ব'লতে পার ১৬৬৫ সালে এক ডাচ বস্ত্র বিক্রেতার আবির্ভাব।

নেদারল্যান্ডের এই কাপড়ের ব্যবসায়ীর সখ ছিল কাঁচ ঘসে-ঘসে লেন্স (Lens) তৈরি করা। আর সেই লেন্স দিয়ে মাইক্রোস্কোপ বানানো। তখন তো বাজারে মাইক্রোস্কোপ কিনতে পাওয়া যেত না। এইভাবেই একদিন তিনি নিজের তৈরি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কাছাকাছি একটা পুকুর থেকে জল এনে পরীক্ষা ক'রে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। সকলকে দেখালেন, অনেককিছু যেন লাফাচ্ছে। আরও পর্যবেক্ষণ ক'রে জানতে পারলেন যে এগুলি এককোষী জীব (Single Cell Organism) ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি হ'লেন অ্যান্টনি লিউয়েনহুক।

এই প্রথম জানা গেল যে কোষ কেবল স্থির একটা প্রকোষ্ঠ নয়। সুতরাং নড়েও না চড়েও না এ ধারণা ভুল। লিউয়েন হুক এর বেশী আর কিছু দেখতে পেলেন না। এই 'নড়াচড়া' গুণটি ছাড়া ওই মাইক্রোস্কোপের এর বেশি ক্ষমতা ছিল না বাকী আরও কিছু জানার।

তারপর দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানী ডিউট্রোচেকে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব'ললেন টিস্যু সিস্টেম বা কলাতন্ত্রের কথা। তা উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই হোক না কেন? তিনিই প্রথম ব'ললেন এই যে আমরা অনেক জীব (organism) দেখি তা অনেকগুলো সেল দিয়ে তৈরি। আর যখন অনেকগুলো সেল মিলেমিশে একটা কাজ করে তখন সেই কোষ সমষ্টিকে বলে Tissue বা কলা। উনি দেখলেন কলাকে প্রাণী ও উদ্ভিদ এই দুরকমে ভাগ করা যেতে পারে আবার এও দেখলেন যে প্রাণী ও উদ্ভিদ এই দু'রকম কলার মধ্যে কিছু গঠনমূলক সাদৃশ্য আছে। এই কথা যখন বলেন তখন বাজারে অল্পস্বল্প মাইক্রোস্কোপ পাওয়া যাচ্ছে— তিনি তা দিয়ে দেখলেন যে কোষের কেন্দ্রের দিকে কালো রঙের আরও কিছু-একটা র'য়েছে— কিন্তু তখন তার কোনো নামকরণ করেন নি।

এরপর ১৮৩৩ সালে রবার্ট ব্রাউন ব'ললেন ওই যে কোষের মধ্যে কালো রঙের অংশটা, ওটা আসলে নিউক্লিয়াস। পারকিন্‌জি (১৮৩৯) নামে এক বৈজ্ঞানিক কাজ ক'রতেন স্নায়ুকোষ এবং নার্ভাস-সিস্টেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে। যার জন্য নার্ভাস-সিস্টেমে অনেক সেল আছে— যা 'পারকিন্‌জি সেল' নামে পরিচিত। এই পারকিন্‌জিই প্রথম নতুন ক'রে 'প্রোটোপ্লাজম' নামটি শোনালেন। এইসময় থেকেই বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদের এবং প্রাণীদের কোষের দিকে আলাদাভাবে মনোযোগ দিতে লাগলেন। এর কিছুদিন পরেই দেখা গেল একজন উদ্ভিদবিদ্যার বিজ্ঞানী এবং একজন প্রাণীবিদ্যার বিজ্ঞানী যথাক্রমে স্লাইডেন এবং সোয়ান ১৮৩৯ সালে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষকে বিভিন্নভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে Unity in diversity তত্ত্বটি জানতে পারলেন। ভারতবর্ষ যেমন বহু জাতির দেশ, যার বহু ভাষা, বহু কলা ও সংস্কৃতি কিন্তু দেশটা একই। কোষও তেমনি এক-একটা উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে এক-এক রকম। আবার একটা কোষকে আলাদা ক'রে দেখলে তার মধ্যে প্রাথমিক কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়। প্রত্যেকটি আলাদা কোষ একত্রিত হ'য়ে যেমন একটা কাজ ক'রতে পারে তেমনি একা-একাই স্বাধীনভাবে সব কাজ ক'রতে পারে। এই এক-একটা কোষ নিয়ে বহু কোষ। আর এইরকম বহু-বহু কোষ নিয়েই কুকুর বেড়াল বা মানুষের দেহ তৈরি। দেহে বা শরীরে কোষ (Cell) নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে কাজ ক'রতে পারে। এই দুটো তত্ত্বই দিলেন এই দুজন বিজ্ঞানী। এই যে কোষের এককভাবে এবং যৌথভাবে কাজ ক'রতে পারা এই তত্ত্বই তখন 'কোষ সূত্র' বা Cell Theory ব'লে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৮৪৫

চিত্র ২. জীব বৈচিত্র

সালের মধ্যে সোয়ান ও স্লাইডেনের দেওয়া এই কোষতত্ত্ব বা Cell Theory সকল বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে যায়। ১৮৫৫ সালে কোষ সংক্রান্ত গবেষণায় যুক্ত হ'ল লাতিন ভাষায় আরও একটি বিজ্ঞানবার্তা '*Omnis Cellula e Cellula*' উক্তিটি রুডলফ্ ভিরচো'র। অর্থাৎ ইংরাজীতে বলা যেতে পারে 'a cell is derived from a cell— মানে একটা কোষ আর একটি কোষ থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে। স্বয়ংভূ নয়। নিজে-নিজে আসে নি। তাহ'লে ১৮৫৫ সালে ভিরচো'র মতবাদ দাঁড়ালো এই যে— 'কোনো কোষ নিজে নিজে আসতে পারে নি সেটা এসেছে আর-একটা কোষ থেকে'। এটা একটা ধারা। চলে আসছে প্রথম কোষ (Cell) থেকে আজকের কোষ (Cell) পর্যন্ত। অনেক এককোষী প্রাণী যেমন অ্যামিবা, প্যারামোসিয়াম এবং এককোষী উদ্ভিদ ডায়াটম্, অ্যালগী ইত্যাদিরা একদিকে যেমন স্বাধীন জীব তেমনি এরা আবার এক-একটা কোষও বটে। আচ্ছা! বলতে পারো অ্যামিবার কোষের সঙ্গে মানুষের কোষের কোনো তফাৎ আছে কি কিছু?

হ্যাঁ আছে। Organism আর Cell। সেল হ'ল Unity in diversity. অ্যামিবারা যা করে তোমার লিভার Cellও তাই করে। তোমার লিভারের কোষ, চামড়ার কোষ সবাই একই কাজ করে। সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে তফাৎ ক'রবে তাদের মধ্যে? আমাদের যেমন একটা কোষ থেকে আর-একটা কোষ উৎপন্ন হয় ওদের তা হয় না। ওরা তো এককোষী প্রাণী।

এই এককোষী প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয় বা Population বাড়ে কোষ বিভাজনের সাহায্যেই। 'কোষ বিভাজন' কথাটা শুনেছো নিশ্চয়। দু'ধরনের কোষ বিভাজন সাধারণত ঘ'টে থাকে। মাইটোসিস এবং মায়োসিস। এককোষী প্রাণীদের এই দু'রকম কোষ বিভাজনই হয়। কিন্তু বহুকোষী প্রাণীদের সবকোষেই মাইটোসিস হয় শুধু গোনাড্ সেল বা জননকোষ বাদে। এই মাইটোসিস প্রক্রিয়া পর্যন্ত অ্যামিবার কোষ আর তোমার আমার কোষের কোন পার্থক্য নেই। উভয়েরই কোষকে শ্বসন, রেচন, নিউট্রিশন এবং মুভ্‌মেন্ট (চলন) ইত্যাদি সব প্রক্রিয়াই ক'রতে হয়, কিন্তু ভিন্নভাবে। আমাদের যে-কোনো একটা কোষকে যদি একটা Organism-এর সঙ্গে তুলনা কর তাহ'লে দেখবে অ্যামিবার কোষ বিভাজন এবং আমাদের কোষ বিভাজনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু তবু যেন একটা পার্থক্য আছে— অ্যামিবার নিজস্ব একটা অস্তিত্ব আছে, একটা নাম আছে *Amoeba protius*। আমাদেরও একটা নাম এবং অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আমাদের নাম (*Homocepians sp.*) হ'মোসেপিয়ান্স বললে অ্যামিবার মতো কোনো কোষ বোঝায় না, গোটা Tissue System বা দেহটাকে বোঝায়। বিভিন্ন তন্ত্র নিয়ে গঠিত আমাদের দেহটা কলাতন্ত্রের (Tissue System) শ্রমবিভাজনের সাহায্যে চ'লছে— অ্যামিবারও সেইসব কাজগুলো চ'লছে ঐ একটা কোষের মধ্যেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের কোষ আর অ্যামিবার কোষে শুধুই চেহারার তফাৎ, কাজের তফাৎ কিছু নেই। তাহ'লে এ পর্য্যন্ত আমরা দেখলাম যে 'কোনো তফাৎ নেই' এই ধারণা কিভাবে এসেছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানা সময়ে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত তুলে ধ'রেছেন (চিত্র ২. জীব বৈচিত্র)।

ছবিগুলি দেখ দেখবে এককোষী ব্যাক্‌টেরিয়া থেকে প্রজাপতি, একটা গোলাপ, একটা

- মাইক্রন— মাইক্রোমিটার— μm
- অ্যাংগস্ট্রম (A°)— $১০^{-১০}$ m
- ন্যানোমিটার (nm)— $১০^{-৯}$ m [১ nm = ১০ A°]
- EM (ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ) ক্ষমতা : ১০ A° — ১০০০ A°
- LM (সাধারণ মাইক্রোস্কোপ) ক্ষমতা : ১ μm — ১০০ μm
- হাইড্রোজেন অ্যাটম : ২ A°
- হিমোগ্লোবিন : ৮০ A°
- পোলিও ভাইরাস : ৩০০ A°
- স্ট্যাফাইলোকক্কাস (ব্যাক্‌টেরিয়া) : ১ μm
- নীলাভ সবুজ শ্যাওলা : ৮ μm
- বেশীরভাগ কোষ : ১০— ১০০ μm
- ডায়াটম : ১০০ μm
- ইউগ্লিনা, অ্যামিবা : ১ nm
- উটপাখীর ডিম : ৫ cm

চিত্র ৩. পরিমাপ তালিকা

ডলফিন ইত্যাদি বহুকোষী জীবের দিকে তাকিয়ে দেখো জীবনের মধ্যে কত বৈচিত্র। সব কিন্তু কোষ দিয়েই তৈরি। আর এই জন্যই কোষকে বলা হয় 'Basic unit of life' বা জীবনের একক। জীবনের এই ক্ষুদ্রতম এককটিকে মেপে ফেলার জন্য যে একক বা Unit এর ব্যবহার করা হয় তার নাম মাইক্রন বা মাইক্রোমিটার।

মাইক্রোস্কোপে মাপার প্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলি। আমরা মাইক্রোস্কোপের পরিমাপকে মাইক্রোমিটারের এককে প্রকাশ করি। এক মাইক্রোমিটার হ'ল এক মিটারের ১০$^{-৬}$ ভাগ অর্থাৎ ১ মিটারের ১০০০,০০০ ভাগ। আর একটি একক হ'ল Angstrom অর্থাৎ ১ মিটারের ১০$^{-১০}$m. ১ ন্যানোমিটার (Nanometer) মানে ১০$^{-৯}$m. মানে ১০A^{o}... এইরকম নানা এককে মাইক্রোস্কোপে দেখা বস্তুর আয়তন বোঝান হয়। এই অ্যাংগ্স্টম (Angstrom) এককটি বিজ্ঞানী অ্যাংগ্স্টম-এর নামানুসারে নামাঙ্কিত। কোষপর্দার পরিমাপ বোঝাবার সময় এই অ্যাংগ্স্টম (A^{o}) এককটি ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ (EM) যার মাপবার ক্ষমতা ১০A^{o}—১০০০A^{o}, চিন্তা ক'রে দেখ কত সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে পাওয়া যায় সে জায়গায় সাধারণ মাইক্রোস্কোপে (Light microscope) বা LM-এ এই ক্ষমতা ১ μm থেকে ১০০ μm। দু'একটা উদাহরণ দিই। হিমোগ্লোবিনের একটা প্রোটীন অণুর মাপ ৮০A^{o}, পোলিও ভাইরাস ৩০০A^{o}, ব্যাক্টেরিয়া ১ মাইক্রোমিটার (μm), Blue green algae হচ্ছে ৮ মাইক্রোমিটার (μm)। যাই হোক বেশীরভাগ যা কিছু মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখি তা ১০ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটারের (μm) মধ্যে। চিন্তা ক'রে দেখ কত সূক্ষ্ম— খালি চোখে দেখা সম্ভব হয়। ইউগ্লিনা বা অ্যামিবাকে (১ mm) খালি চোখে হয়তো এক বিন্দুর মত দেখাবে বা তার নিউক্লিয়াস দেখা যাবে যদি একটা ভালো মাইক্রোস্কোপ থাকে।
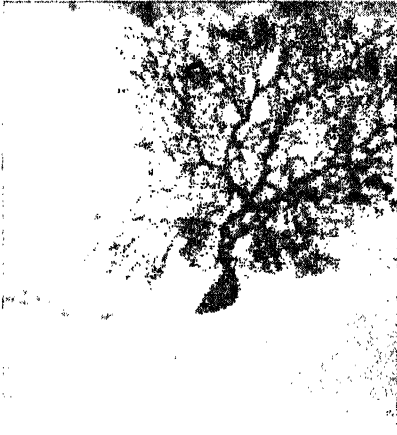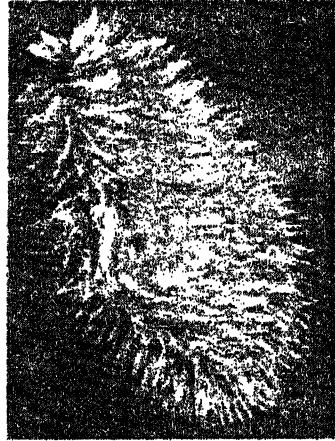
নার্ভ কোষ প্যারামোসিয়াম

চিত্র ৪. বিভিন্ন প্রকার কোষের আকার ও আয়তন
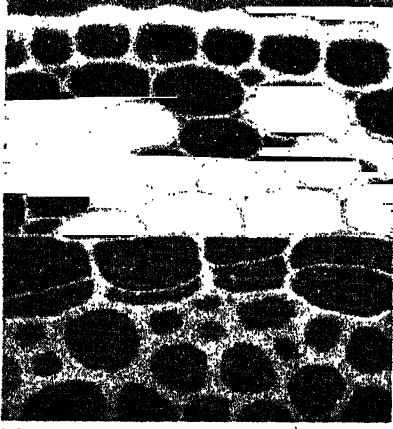
উদ্ভিদ কোষ ব্যাক্টেরিয়া
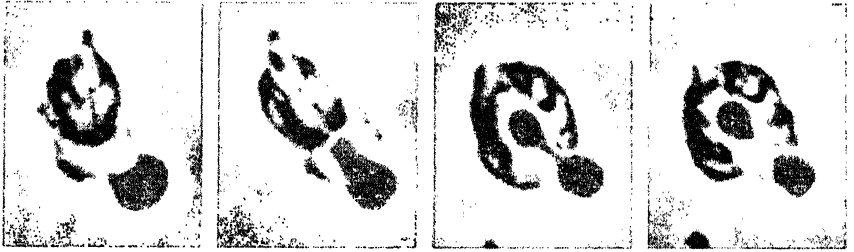
রক্তকণিকা

চিত্র ৪. বিভিন্ন প্রকার কোষের আকার ও আয়তন

ছবিতে আমি বিভিন্ন মাপের কোষ সেই সঙ্গে এককোষী জীবের মাপও দেখিয়েছি। নার্ভ কোষ, রক্ত কণিকা এবং একটা উটপাখীর ডিমের মাপও জেনেছো। উটপাখীর ডিম সবচেয়ে বড় কোষ। এর সাইজ ৫ সেন্টিমিটার— সুতরাং খালিচোখে দেখা যায়। আশা করি সব মিলিয়ে কোষের আয়তন সম্বন্ধে একটা ধারণা হ'য়েছে।

এবার আর একটা ছবি দেখ।
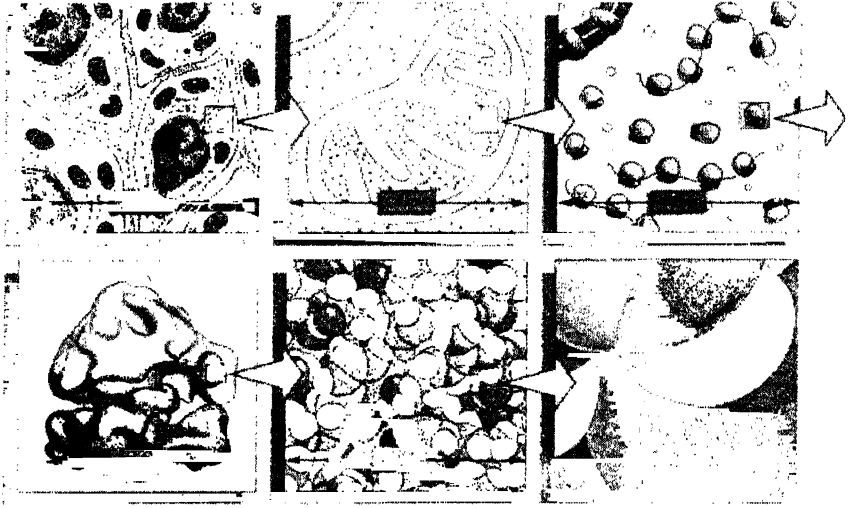
চিত্র ৫. মানুষের বুড়ো আঙুলের ক্ষুদ্রতম অংশের গঠনের পর্যায়ক্রমিক ধাপ

এটা একটা বুড়ো আঙুলের ছবি। ছবিটাতে একটা ⁝ চিহ্ন জায়গাকে আরও বড় ক'রলে (Magnify) দেখা যাবে চামড়ায় কত Layer বা ভাঁজ। আবার যদি মাইক্রোস্কোপের নীচে আরও বড় (Magnify) করে লক্ষ্য ক'রলে দেখবে যে কতগুলো কোষ নিয়ে ওই অংশ তৈরি, আবার ওই অনেক কোষযুক্ত অংশ থেকে যদি ২০ মাইক্রোমিটার মত অংশ নিয়ে আরও বড় (magnify) ক'রে দেখ তাহ'লে দেখবে নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্‌ড্রিয়া সাইটোপ্লাজম গল্‌গি কমপ্লেক্‌স ইত্যাদি। যদি ২ মাইক্রোমিটার মত অংশ নিয়ে যদি magnify ক'রে দেখ তাহ'লে দেখবে রাইবোসোম (যা দিয়ে প্রোটীন সিন্থেসিস হয়) যার সাইজ ·২ μm. সেটা EM-এর নীচে ২০ nm। জীবনের বিশ্লেষণ মাইক্রোস্কোপে শেষ হবার পর, আরও বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায়, কোষ দেহ কিছু রাসায়নিক অণু ছাড়া আর কিছু নয়। তাহ'লে একটা বুড়ো আঙুল থেকে রাইবোজোম পর্যন্ত EM এর সাহায্যে পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায় একটা অ্যামিবার মধ্যে যা আছে মানুষের কোষেও তাই আছে— সেই মাইটোকন্‌ড্রিয়া, সেই রাইবোসোম সেই নিউক্লিয়াস।

এবার দেখ একটা উদ্ভিদ কোষ (Plant Cell) এবং একটা প্রাণী কোষ (Animal Cell) এর ছবি। ছবি দুটি ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপের (EM) নীচের ছবি। উদ্ভিদ কোষের ছবিটার দিকে তাকাও। দেখ কোষপ্রাচীর, মাইটোকন্‌ড্রিয়া আর এই যে সবুজ অংশগুলো এরা হ'ল ক্লোরোপ্লাস্ট (চিত্র ৬ ও ৭)। ক্লোরোপ্লাস্ট যদি না আসতো তাহ'লে প্রাণীরা আসত না। প্রাণী কোষ খাদ্য তৈরি ক'রতে পারে না কিন্তু উদ্ভিদ কোষ পারে এই ক্লোরোপ্লাস্টের জন্যই যা কিনা প্রাণী কোষে নেই। আর লম্বা-লম্বা fibre (তন্তু) এর মত অংশ এর নাম সাইটোস্কেলিটন। কোষের এই কঙ্কালের ওপর নির্ভর করে কোষের আকৃতি। নিউক্লিয়াসকে নিশ্চয় চিনতে পারছো— এর ভেতর র'য়েছে
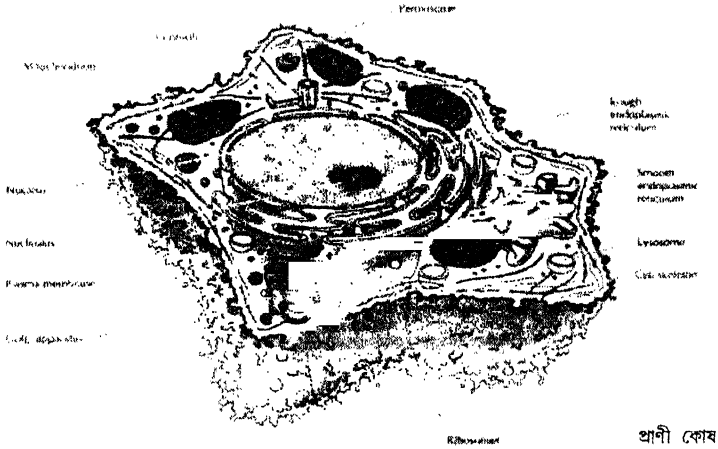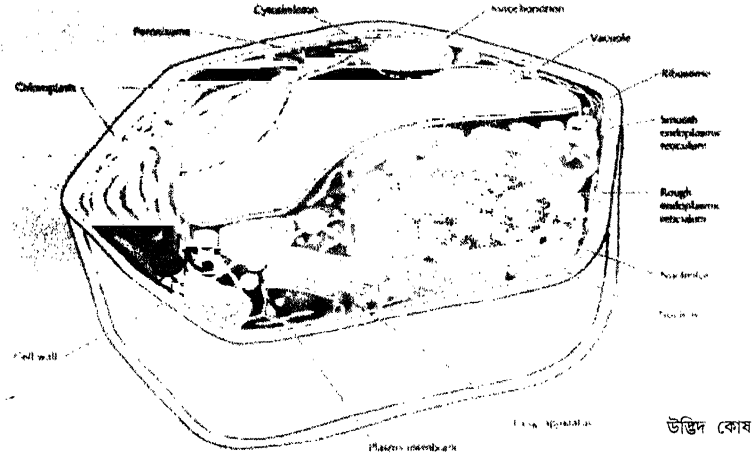
চিত্র ৬. উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষ (EM)

নিউক্লিওলাস। পাতলা পর্দার মত অংশের নাম গল্‌গি অ্যাপারেটাস। কোষপ্রাচীরের সবচেয়ে ভিতরের স্তরকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে। এছাড়া এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের দিকে তাকাও যেগুলোর দেখছো গায়ে রাইবোজোম লেগে আছে তাদের rough endoplasmic reticulum আর যাদের গায়ে রাইবোজোম লেগে নেই তাদের smooth endoplasmic reticulum বলে। আবার মাইটোকন্‌ড্রিয়ার দিকে তাকাও দেখ ক্রিস্টির (Cristae) ওপরে যে মেমব্রেন আছে তার

গায়ে লক্ষ্য করে দেখ গুড়িগুড়ি রোমের মত অংশ আছে এগুলি অনেক প্রোটীন দিয়ে তৈরি এগুলিকে বলা হয় 'রেস্‌পিরেটরি প্রোটীন' (Respiratory Protein)। এগুলি শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করার কাজটি মাইটোকন্‌ড্রিয়া গুরুত্বপূর্ণভাবে পালন করে সেই সঙ্গে আরও একটি অত্যন্ত অপরিহার্য কাজ করে থাকে তাহ'ল ATP (Adenosine triphosphate) কারেন্সির উৎপাদন। এটি এককথায় জীবনের কারেন্সি। প্রয়োজনমত ভাঙানো যায়। তাহ'লে এইবার নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে মাইটোকন্‌ড্রিয়া কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাইটোকন্‌ড্রিয়া প্রাণীকোষে ছোট আর উদ্ভিদ কোষে বড় আকারে থাকে।
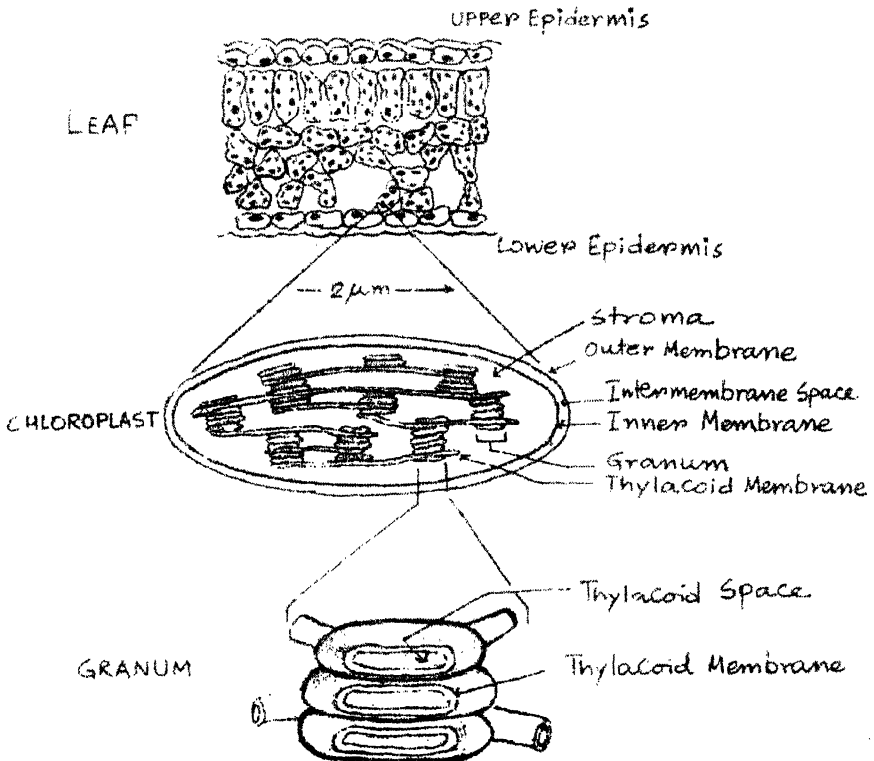
চিত্র ৭. ক্লোরোপ্লাস্টের আণুবীক্ষণীক (EM) গঠন

A Mitochondrion
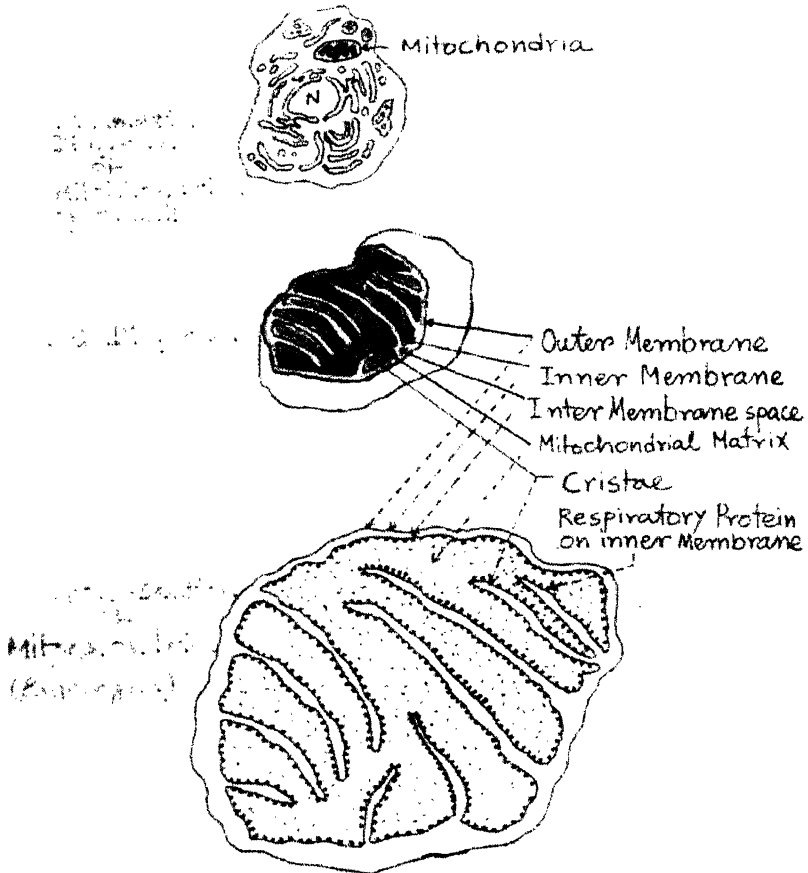
চিত্র ৮. মাইটোকণ্ড্রিয়ার আণুবীক্ষণীক (EM) গঠন

এবার উদ্ভিদ কোষের ছবির দিকে তাকাও। ক্লোরোপ্লাস্টিড ব'লে যে অংশটি দেখছো এটি উদ্ভিদ কোষের একটি অতি উল্লেখযোগ্য অংশ। ক্লোরোপ্লাস্ট আর মাইটোকনড্রিয়ার মেমব্রেনগুলি লক্ষ্য করার মত। ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনকে বলা হয় থাইলাকয়েড। থাইলাকয়েডগুলোও আবার মেমব্রেন দিয়ে তৈরি। মাইটোকনড্রিয়ার মত ক্লোরোপ্লাস্টেরও inner (অন্তর) এবং outer (বাহির) মেমব্রেন আছে। কিন্তু মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দা গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যেমন ক্রিস্টি (Cristae) গঠন করে ক্লোরোপ্লাস্টের বেলায় তা হয়না। ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ তোমরা প'ড়ছ সেজন্য তার

The Golgi Apparatus
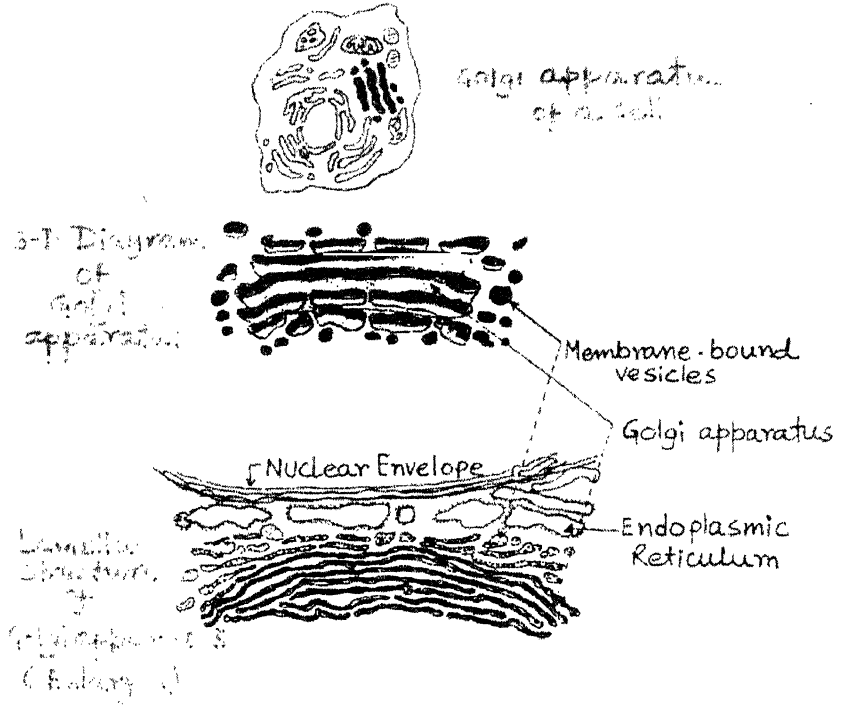
চিত্র ৯. গলগী বস্তুর আণুবীক্ষণীক (EM) গঠন

মধ্যে গেলাম না কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য কর যে সালোকসংশ্লেষের সময় এই যে অক্সিজেন ত্যাগ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ তা কিন্তু শ্বসনের বেলায় এর উল্টো। এসব কিছু কিন্তু একই মেমব্রেনের মাধ্যমেই হ'চ্ছে। নিউক্লিয়াসের মেমব্রেন যা দিয়ে তৈরি, গল্‌গি কমপ্লেক্সের মেমব্রেনও তাই দিয়ে তৈরি। এই মেমব্রেনগুলো প্রোটীন আর কার্বহাইড্রেট দিয়ে তৈরি শুধু শতকরা ভাগ মাপের তফাৎ। নিউক্লিয়াসের ওপরে যে পর্দা আছে তাকে 'নিউক্লিয়ার এন্‌ভেলাপ' বলা হয়। এন্‌ভেলাপ মানে ঢেকে রাখা। এর থেকেই তৈরি হয় 'এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম'। এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ভেঙে তৈরি হয় গল্‌গি অ্যাপারেটাস্‌। যে সব কোষে উৎসেচক (enzyme) বেশি থাকে সেই সব কোষে প্রচুর গল্‌গি কম্‌প্লেক্স থাকে। সব সময় কোষে গল্‌গি থাকে না। কোনো কোষে যখন উৎসেচক (enzyme) তৈরি করার দরকার হয় তখন সেই সমস্ত কোষে প্রয়োজন মত গল্‌গি কম্‌প্লেক্সও তৈরি হয়। কোষের এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ ক'রে দেখেছেন। পরীক্ষার জন্য ইঁদুর আর তার কিছু দূরে খাবার রেখে গল্‌গি কম্‌প্লেক্সের হেরফের

The Endoplasmic Reticulum
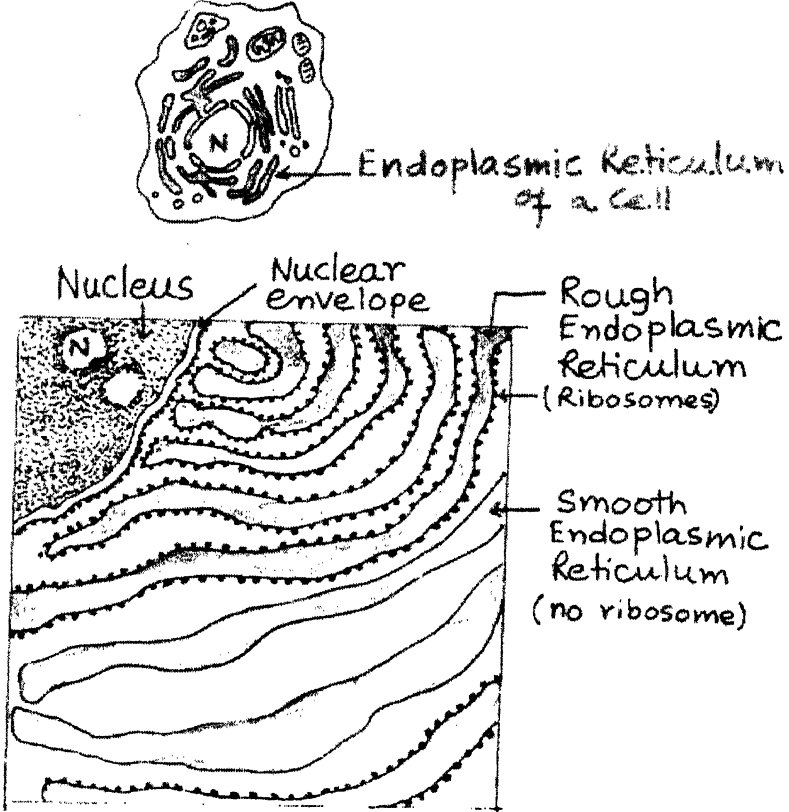
চিত্র ১০. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের আণুবীক্ষণীক (EM) গঠন

দেখার জন্য ইঁদুরটাকে মেরে ফেলে উৎসেচক নিঃসরণকারী কোষগুলোকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে সবেমাত্র গল্‌গি তৈরি হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। পরের পরীক্ষায় আরও কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে অর্থাৎ ইঁদুর সব খাবার খেয়ে নেওয়ার পর অনুরূপভাবে Pancreas অগ্ন্যাশয়-এর কোষ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন গল্‌গি কমপ্লেক্স অনেকগুণ বেড়ে গেছে। আবার যখন পেটের মধ্যে খাবার ঢুকে গেছে তখন দেখা গেল উৎসেচক নিঃসরণ ক'রছে। সবসময় গল্‌গি কম্‌প্লেক্স নতুনভাবে তৈরি হয়।

যখন নিউক্লিয়ার envelop (আচ্ছাদন) থেকে থেকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তৈরি হয়

আর তার গায়ে যদি রাইবোজোম লেগে থাকে তখন তাকে rough endoplasmic reticumum সংক্ষেপে RER এবং যখন রাইবোজোম লেগে থাকে না তখন তাকে smooth endoplasmic reticulum বা SER বলে। এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের শ্রমবিভাজনে দেখা যায় SER স্টেরয়েড্ তৈরি করে এবং RER তৈরি করে প্রোটীন। গল্‌গির কাজ হ'ল ER যে উৎসেচক (enzyme), পেপ্‌সিন ইত্যাদি তৈরি ক'রল সেগুলিকে কোষের বাইরে চালান করা। কিন্তু সবকিছুই একই মেমব্রেন দিয়ে তৈরি। নিউক্লিয়ার এনভেলপ, গল্‌গি কম্‌প্লেক্স আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সব খুব কাছাকাছি থাকে।

যাক। আমাদের ক্লাসের নির্ধারিত সময় শেষ হ'য়ে গেছে। সময় সুযোগ পেলে আবার এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। মনে আছে তো আমাদের কথা ছিল বই থেকে বেরিয়ে এসে আর-একটু বেশি ক'রে জানবো। তাই Advance knowledge for Biological Science এর ক্লাসে তোমাদের বই-এ যে সব তথ্য আছে সেগুলির আর উল্লেখ ক'রলাম না। সেগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের। এ নিয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে আমার কাছে চ'লে আসবে— আমি সবসময় তোমাদের জন্য আছি।

শিক্ষাসত্রে ৩.৮.২০০১ তারিখে আয়োজিত Advanced knowledge in Life Science-এর প্রথম ক্লাসে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ

শিবনাথ মজুমদার
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

ছাত্রবন্ধুরা। তোমরা আর মাষ্টারমশাইরা মিলে যে বাড়তি বিজ্ঞান শেখার ক্লাসের আয়োজন ক'রেছ, সেই আয়োজনে আমাকে তোমাদের একজন মনে ক'রে কিছু বলবার জন্য যে সুযোগ দিয়েছো সেজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে ক'রছি। কেননা এতদিন পরে আবার স্কুলে আসার সুযোগ পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হ'য়েছি। পুরোনো দিনে ফিরে যেতে পেরে তোমাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ ক'রছি।

আমার পড়াশোনা এবং গবেষণার কাজ Immunology, আর আরও বিশেষ ক'রে বলতে গেলে Immuno System (প্রতিরোধ ব্যবস্থা) নিয়ে। এতদ্‌সত্বেও বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য যে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন আছে সেটা তোমাদের কাছে এসে বেশ বুঝতে পারছি। যাইহোক আলোচনা চলা কালে তোমরা প্রয়োজন মত প্রশ্ন ক'রবে— প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়াটা চললে আমিও একটু আস্বস্ত হ'তে পারি।

আজকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত ছিল Blood & Lymph (রক্ত ও লসিকা)। কিন্তু তোমাদের অনুমতি নিয়েই বিষয়ের নামটা একটু পাল্টে নিচ্ছি। নাম দিলাম **'মারামারি'**। দেখা যাক কে মারামারি করে, কার সঙ্গে মারামারি করে কি ভাবে করে কে জেতে কে হারে? একপক্ষ মারামারি ক'রতে এলে অপর পক্ষ বাধা দিতে চেষ্টা ক'রবেই অর্থাৎ একটা প্রতিরোধ বাহিনী গ'ড়ে তুলবে— প্রাণীদেহে এই ব্যবস্থার নামই Immunity বা প্রতিরোধ ক্ষমতা। Immunity কথাটা এসেছে ল্যাটিন Immunitus থেকে। আবার এই Immunitus কথাটার উৎস 'They are Immunate to everything' থেকেই, রোমের সেনেটারদের সম্বন্ধে যা বলা হ'ত। সেনেটারেরা সমগ্র রোম দেশ শাসন ক'রত। যারা সেনেটর হ'তেন তাদের সমস্ত সামাজিক দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ছিল। তারা যে-কোনো কাজ বা অন্যায় করুন না কেন তাদের প্রতি প্রশ্ন করার অধিকার কারোর ছিল না। ফলে তারা immunate to everything. এই ঘটনা থেকেই Immunitus কথাটি এসেছে আর সেখান থেকেই Immunity কথাটির উৎপত্তি।

এবার তাহ'লে আমরা বুঝতে আরম্ভ করি আমাদের শরীরে Immunity বা প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন ক'রে ঘ'টছে? ধর আমরা সবাই প্রচণ্ড রোদ্দুরে, পড়াশোনা বাতিল ক'রে, বোলপুরের 'গীতাঞ্জলী'তে সিনেমা দেখলাম। ফেরার সময় তো প্রচণ্ড বৃষ্টি। ভিজে ভিজে বাড়ি তো ফিরলাম। রাত্রে আমাদের সকলের অনির্বাণের বাড়িতে নেমন্তন্ন। গিয়ে দেখি সকলেই এসেছে— আসেনি শ্বেতা। অনির্বাণকে জিজ্ঞেস ক'রতেই ব'ললে ওর খুব জ্বর এসেছে। বল কি? খুব জ্বর? তাহ'লে ভেবে দেখ রহস্যটা। আমরা সবাই একসঙ্গে রোদ্দুরে-রোদ্দুরে সিনেমা গেলাম। সিনেমা দেখে সকলেই একসঙ্গে সারাক্ষণ ভিজতে-ভিজতে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের কারোর কিছু হ'ল না

অথচ দেখ শ্বেতার জ্বর হ'য়ে গেল।

তাহ'লে ব্যাপারটা কি এইরকম যে যে-সব জীবাণু বা বীজাণু জ্বর ঘটায় তারা কেবল শ্বেতাকেই ভালবাসে? না। তা হ'তে পারে না। আমাদের সকলকেই আক্রমণ ক'রেছিল কিন্তু আমাদের জ্বর হয়নি তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিষেধক ক্ষমতাটা রয়েছে। সেই ক্ষমতা জ্বরের জীবাণুগুলোর সঙ্গে মারামারি বা লড়াই ক'রে হারিয়ে দিয়েছে তাই আমাদের জ্বর হয় নি। আর শ্বেতার বেলায় প্রতিষেধক ক্ষমতাটাই হেরে গিয়েছে, জীবাণুদেরই জয় হ'য়েছে। তাই তার জ্বর হ'য়েছে। আমাদের বেলায় কি ঘটেছিল যার জন্য জ্বর হয়নি? ওই জীবাণুগুলোর আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune System) সময়মত জাগ্রত (activated) হ'য়েছিল এবং জীবাণুদের পরাস্ত ক'রতে পেরেছিল। অর্থাৎ একটা প্রতিরোধকারী উদ্দীপক (Immune response) (যার কাজ প্রচুর জৈবিক প্রক্রিয়া উৎপন্ন করা) সৃষ্টি করা। মোদ্দা কথায় Immunity System বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা মানে আমাদের শরীরে যে একজন সতর্ক ডাক্তার বসে আছেন, তাঁর কাজ রোগাক্রমণ-কালে যথাসময়ে কালবিলম্ব না ক'রে অতি তৎপরতার সঙ্গে লড়াই ক'রে আমাদের রোগমুক্ত করা।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি ঘটনার কথা বলি— আমি তখন বেশ ছোট। আমার ছোটবোনের খুব জ্বর হ'য়েছে। ঠাকুমা তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি দেখে ব'ললেন এ তো হাম হ'য়েছে, খুব ভাল হ'য়েছে। কথাটা শুনে খুব দুঃখ হ'য়েছিল, আবার আশ্চর্য হ'য়েছিলাম এই ভেবে যে ঠাকুমা এত ভালবাসেন সবাইকে, অথচ ঐটুকু একটা বাচ্চার হাম হ'য়েছে শুনে ব'ললেন 'ভাল হ'য়েছে'? বড় হ'য়ে ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম সেদিন কেন 'ভালো হ'য়েছে' ব'লেছিলেন? ঠাকুমা কি ব'ললেন জানো! 'যার একবার হাম হয়, তার আর দ্বিতীয়বার হাম হয় না'। তোমরাও বাড়িতে গিয়ে বয়স্কদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রলে জানতে পারবে, হাম একবার হ'লে দ্বিতীয়বার আর হয় না।

ঠিক তাই। সাধারণতঃ চিকেন পক্স, হাম একবার হ'লে আর হয় না। কেন? আর-একটু আলোচনা এগোলে আশাকরি সকলেই বুঝতে পারবে। এস। প্রথমে দেখি প্রতিরোধ ব্যবস্থার (Immunity System) বৈশিষ্ট্য কি কি? প্রধানতঃ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হ'ল Specificity অর্থাৎ ভীষণভাবে নির্দিষ্টতা; Diversity অর্থাৎ বহুমুখিতা; Memory অর্থাৎ স্মৃতি বা মনে রাখা। Self- non-self অর্থাৎ আপন-পর এবং Self-regulation বা স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ। তাহ'লে বৈশিষ্ট্য পাঁচটি আর-একবার বলি। i) Specificity ii) Diversity iii) Memory iv) Self- non-self এবং v) Self-regulation এই যে পাঁচটি বৈশিষ্টের কথা জানলাম, হামজ্বর নিয়ে এদের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা আলাদা ক'রে দেখতে, ঠাকুমার সেই উক্তিতে ফিরে আসি। ঠাকুমার ব'লেছিলেন একবার হাম হ'লে তার আর হাম হবে না। এই হ'ল সেই 'স্মৃতি' (Memory)। ওই যে সেই ডাক্তার যিনি Immune System-এর মধ্যে ব'সে আছেন তিনি একবার একটা অসুখকে দেখে সেই যে মনে রেখেছেন, পরের বার যখন সেই অসুখটাই আক্রমণ করে তখন চেনা অসুখ ব'লে সহজেই ধ্বংস ক'রে দেয়। নতুন ক'রে আর চিনতে হয় না। এই 'স্মৃতি' ক্ষমতার জন্য পরের বার সামাল দিতে বেগ পেতে হয় না। এর পরের বিশেষত্ব হ'ল নির্দিষ্টতা

(Specificity) ও বহুমুখীতা (Diversity)। এই কথাটা বুঝতে যুদ্ধের প্রসঙ্গে আসতে হয়। তোমরা যুদ্ধের সিনেমা দেখেছো তো! নিশ্চয়। দেখেছো এক-একটা প্লেটুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে চলে, দলে সাত-আটজন সৈনিক নিয়ে, দেখবে কারোর হাতে থাকে রাইফেল, কারোর বা হাতে লাইট মেশিনগান (LMG), আর কারো হাতে গ্রনেড লঞ্চার। লক্ষ্য কর— এই অস্ত্রগুলোর এক একটির কাজ এক-এক রকমের। যেমন দূরের কোনো লক্ষ্যবস্তুকে বেছে-বেছে ধ্বংস করা রাইফেলের কাজ, আবার LMG-এর কাজ অনেকজন শত্রুকে একসঙ্গে মোকাবিলা করা। অতএব গ্রনেড লঞ্চার-এর কাজ বুঝতেই পারছো। যখন ট্যাঙ্কসহ বড় দলের শত্রুপক্ষ আক্রমণ ক'রতে আসে, তখন গ্রনেড ছাড়া উপায় কি? যাইহোক। এটুকু তাহ'লে বুঝতে পারছি— মশা মারতে কামানের দরকার নেই। একজন শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য যেমন গ্রনেড দরকার নেই তেমনি ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিতে রাইফেল যথেষ্ট নয়। অতএব সবই Specific বা নির্দিষ্ট।

আমাদের Immune System-এর মধ্যেও ঐরকম অনেকগুলি অস্ত্র থাকে। প্রত্যেকটা অস্ত্রের কাজ নির্দিষ্ট। অতএব যুদ্ধের বা আক্রমণের সময় যে অস্ত্রের জন্য যাকে দরকার আমরা তাকেই দেখবো অন্য কাউকে নয়।

আবার সমগ্র দল বা ঐ সাত-আটজনের প্লেটুনকে দেখ। কারোর হাতে রাইফেল, কারোর কাছে LMG আবার কারো-কারোর কাছে লঞ্চার। সমগ্র দলকে একসঙ্গে দেখলে মনে হবে বিশাল অস্ত্রসম্ভার নিয়ে একদল এগিয়ে চ'লেছে আর আলাদা ক'রে এক-একজনকে দেখলে মনে হবে ও তো কেবল রাইফেল চালাতেই পটু অন্য কিছু নয়। এই দলগত বৈশিষ্ট্যই হ'ল বহুমুখীতা (Diversity) আর একটি আলাদা ক'রে বৈশিষ্ট্যকে বলে Specificity বা নির্দিষ্টতা। আশাকরি আমার এই উপমার সাহায্যে তোমাদের Immunity System-এর দুটি বৈশিষ্ট্য বোঝাতে পারলাম।

এস, আর-একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি। Self- non-self। যাকে বলা যেতে পারে 'আত্ম' 'পর' ভেদের বৈশিষ্ট্য। এই 'আপন' 'পর' ভেদ গুণটি না থাকলে শত্রু-মিত্র বাছাই করাই তো যাবে না। ঠিকমত যাচাই ক'রতে না পারলে অম্বুজদাকে শত্রু মনে ক'রবো অথচ দেখ অম্বুজদা আমায় কত ভালবাসেন। আমাদের Immune Systemকেও চিনতে হবে কে ক্ষতিকারক। বাইরে থেকে দেহে কিছু ঢুকলেই যে সেটা ক্ষতিকারক হবে তা নয়। রসগোল্লাও তো ঢুকছে বাইরে থেকে তোমার দেহে— রসগোল্লা কি ক্ষতিকারক? তা তো নয়। অতএব জানতে হবে কে উপকারী কেই বা ক্ষতিকারক? অর্থাৎ কে Self কে non-self অর্থাৎ কে তোমার আত্মীয় কে তোমার পর। বাইরে থেকে কিছু ঢুকলেই যে সেটা তোমার ক্ষতিকারক তা নয়।

এরপর Self regulation. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? আমাদের শরীরের মধ্যে ডাক্তার ঘুমোচ্ছেন। যেই কোনো ক্ষতিকারক কিছু ঢুকছে অমনি ডাক্তারবাবু জেগে উঠছেন। তারপর ডাক্তারবাবু যা-কিছু করণীয় ক'রছেন।

ধর ছোটভাই একটা কাপ ভেঙে দিয়েছে। বাবার খুব সখের কাপ। বাবা অফিস থেকে ফিরে ব্যাপারটা জেনেই ভীষণ চটে গেলেন। মাও চেপে থাকতে পারলেন না। ফলে বাবা অত্যন্ত রেগে দিলেন দু-চার ঘা বসিয়ে। এই অবস্থা দেখে মা বাবার রাগ কমাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। বাবাকে বোঝাতে থাকেন— 'এত রাগ করলে ক্ষতি হবে', 'Blood pressure বেড়ে যাবে' ইত্যাদি।

Immune System ব্যাপারটা এইরকমই। চুপচাপ বসে ছিল। যেই শত্রু দেখল অমনি জেগে উঠল— রেগে গেল। এবার যদি রাগ না কমে, যদি সবসময় রেগেই থাকে— তাহ'লে তো আর কোনো কাজ হবে না— সবসময় ঝগড়াই ক'রবে সে। শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকবে না। একটা বিচ্ছিরি লণ্ডভণ্ড ব্যাপার হ'য়ে যাবে। অতএব বুঝতেই পারছো Self-regulation ব্যাপারটাও ভীষণ জরুরি। আমি কি ধরে নিতে পারি Immune System-এর ধারণা তোমাদের কাছে পরিস্কার হ'য়েছে। এস আর-একবার Immune System বা 'প্রতিরোধ ব্যবস্থা'র বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরাবৃত্তি করি। Specificity, Diversity, Memory, Self- non-self এবংSelf-regulation।

পরবর্তী প্রসঙ্গে আসা যাক। দেহ তো কোষ দিয়েই তৈরি। আমাদের দেহে যে প্রতিরোধ (Immune System) ডাক্তার আছে— সেও কতগুলি কোষ নিয়েই বসে আছে। এই কোষগুলি দু'ধরনের। একটি 'B'-cell অন্যটি 'T' cell. এই B-cell কোষগুলি অস্থিমজ্জা (Bone marrow) থেকে উৎপন্ন হয় আর T-cell উৎপন্ন হয় Thymus গ্রন্থি থেকে। Bone marrow থেকে উৎপন্ন হয় ব'লে 'B' cell আর Thymus থেকে উৎপন্ন হয় ব'লে 'T' cell. এছাড়াও আরও একটি কোষ আছে যার নাম Macrophage. এই তিন ধরনের কোষের সাহায্যেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা Immune System-এর কাজ বা প্রক্রিয়াগুলি চ'লছে। এবার দেখতে হবে কাজগুলি কেমন ক'রে চ'লছে? কাজগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) Passive immunity এবং (২) Active Immunity।

তোমরা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দেখেছো 'কৌটোর দুধের চেয়ে মাতৃদুগ্ধ শিশুদের জন্য অনেক বেশি উপকারী'। কেন জানো? পুষ্টি ছাড়াও আরও যে গুণটি গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল প্রতিরোধ ক্ষমতা। মায়ের দেহে কোন সংক্রমণ হ'লে, আক্রমণকারী জীবাণু বা ক্ষতিকারক পদার্থকে মায়ের দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunity System) সক্রিয় করে। ফলে মায়ের দেহে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে ওষুধের মত শিশুর দেহে চ'লে আসে। ফলে শিশুটি ঐ অসুখের প্রকোপ থেকে রেহাই পায়। এই পদ্ধতিকে বলে Passive Immunity অর্থাৎ যেখানে সরাসরি বাচ্চার দেহ কাজ ক'রছে না— কাজটা মায়ের দেহে ঘ'টেছে সেখান থেকেই বাচ্চারা পাচ্ছে। আর Active immunity হ'ল যেখানে বাচ্চার বা ব্যক্তির দেহেই সরাসরি Immune System কাজ করে, ক্ষতিকারক পদার্থকে ধ্বংস ক'রে ফেলে দেহটিকে সুস্থ রাখে। এরপর আমরা দেখব যে কিভাবে 'B'-cell, 'T'-cell এবং Macrophage কাজ করে এবং আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। বাড়িতে ছোটভাই খেলছে— এমন সময় একটা সাপ ঢুকল। সাপটাকে প্রথম দেখল ছোটভাই, সঙ্গে-সঙ্গে 'সাপ-সাপ' ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আওয়াজ না পেয়ে দাদা ভাবল, ভাই হয়ত সাপটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। পরক্ষণে ভাবল, ভাই যদি সাপটাকে না মারতে পারে তো 'দাদা' 'সাপ' 'বাঁচাও' ইত্যাদি ব'লে চিৎকার ক'রে, ঘাবড়িয়ে, একটা গোল বাঁধিয়ে ফেলবে। যেই-না-ভাবা অমনি বই বন্ধ ক'রে উঠে সাপ মারতে উদ্যত হ'ল। তোমাদের কি মনে হয়? দাদা সাপ মারতে বন্দুক নিয়ে যাবে না লাঠি নিয়ে যাবে? লাঠি। হ্যাঁ ঠিক। ঠিক ব'লেছো সবাই। এইবার দাদা সাপ মারতে লাঠি হাতে যেই

না চ'লেছে, অমনি পাড়ার সকলে দাদাকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রল, কিরে কোথায় চ'লেছিস? দাদা সকলকে 'বাড়িতে সাপ ঢুকে পড়ার' ঘটনাটা ব'লল। এই খবর শুনে পাড়ার আরও দু-চারজন লাঠি নিয়ে এল। সাপের আর রেহাই নেই। অবশেষে সকলে মিলে সাপটাকে মেরে ফেলল।

এই গল্পটার থেকে এস 'প্রতিরোধ ব্যবস্থা'র বিজ্ঞানটাকে খুঁজে বের করি। সাপের বদলে ভাবি 'X' একটা ব্যাক্‌টেরিয়া আর বাড়িটা হ'ল আমাদের শরীর বা দেহ। দেহের মধ্যে যেই একটা ব্যাক্টেরিয়া X ঢুকে পড়ে, অমনি ম্যাক্রোফেড ব'লে যে কোষগুলো আছে (ছোটভাই-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে), তারা তো দেহের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাই প্রথম দেখবে এবং চেঁচাবে। কোষ তো আর চেঁচাতে পারল না ফলে Xকে দেখে ম্যাক্রোফেজ্ কোষগুলো কিছু সংকেত পাঠাতে লাগল। পাশের ঘরে দাদা (B-cell) আরাম ক'রে 'ফেলুদা' পড়ছিল। ওই সংকেত পাওয়া মাত্র তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে বইপড়া বন্ধ ক'রে দিল। তারপর দেখল এ এমন কিছু মারাত্মক সাপ নয়, সাধারণ ঢোঁড়া সাপ, নিজেই মেরে ফেলতে পারবে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে বিপদ সংকেত পেলেই B-cell প্রথম সক্রিয় (activated) হয়। আর— বিষাক্ত সাপ অর্থাৎ ভয়ানক হ'লে সক্রিয় B-cell অনুপ্রাণিত হ'য়ে বিপদ সংকেত পাঠাতেই থাকে, তখন পাড়ার আরও অনেকে মানে আরও অনেক B-cell মিলে 'লাঠি' দিয়ে ভয়ানক 'X'কে মেরে ফেলে। লক্ষ্য কর সাপ মারতে লাঠিই চাই বন্দুক নয়। এটাই Specificity অর্থাৎ 'প্রতিরোধ ব্যবস্থা'র (Immunity System) 'নির্দিষ্টতা' বৈশিষ্ট্য। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য কর। দাদা ছিল একা। যাবার সময় আরো পাড়ার দাদাদের জুটিয়ে নিয়ে গেলেন। বিজ্ঞানের চোখে কি দেখবো। দেখবো B-কোষ ছিল একটাই। বিভাজিত হ'য়ে অনেক কোষ তৈরি হ'ল, তারপর সবগুলো কোষ একত্রে গিয়ে ঐ ভয়ানক Xটাকে মেরে ফেলল।

এরপর এস দেখি স্মৃতির (memory) বৈশিষ্ট্যটি। বিজ্ঞানের চোখে দেখবো কয়েকজন (ধর চারজন) মিলে সাপ বা Xকে মারতে গিয়ে কয়েকজন (ধর দুজন) মারা গেল। বেঁচে রইল দুজন। যুদ্ধে প্রারম্ভে ছিল একজন, হ'য়ে গেল দুজন। এদের কি তালিম (Training) ছিল? সাপ কি, কিভাবে এদের মারতে হয় ইত্যাদি। ফলে আবার যখন সাপ আসবে তখন সহজেই চিনতে পারবে এবং মেরে ফেলবে। এটাকেই আমরা বলি স্মৃতি বা memory. আশাকরি আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি কি ক'রে memory activated হয় এবং Immune System কিভাবে ক্ষতিকারক জিনিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাজ করে। এতক্ষণ B-cell এর মারামারির গল্পটা তো শুনলাম। এবার T-cell এর মারামারির কায়দাটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। T-কোষের মারামারির কায়দাটা বোঝার জন্য একটু ব্ল্যাক-বোর্ডের সাহায্য নেওয়া যাক।

ধরা যাক এটা হ'ল T-cell আর এটা হ'চ্ছে ক্ষতিকারক cell. T-cell কিন্তু চিনতে পারে কোষটি ক্ষতিকারক কি না। এক্ষেত্রে সেই 'আত্ম-পর' ভেদ (Self- non-self) বৈশিষ্ট্যটি কার্যকারী ভূমিকা নেয়। বোর্ডের দিকে তাকাও। T-cell কিভাবে কাজ করে তা পরপর ধাপগুলিতে দেখ। প্রথমে Xকে চিনল এবং যাচাই ক'রল X ক্ষতিকারক কি না? ধরা যাক ক্ষতিকারক। এবার T-cell ওই X-এর মধ্যে অবস্থানগত দূরত্ব কমিয়ে পাশাপাশি এল এবং অবশেষে X-এর সঙ্গে

ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত (Tightly bind) হ'ল। T-cell-এর মধ্যে অন্যান্য কোষের মত নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম বর্তমান। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছোট-ছোট থলির মত কতগুলো অংশ আছে— এদের ভেসিক্‌ল (Vesicle) বলে। এই ভেসিক্‌লগুলোর মধ্যে একধরনের রাসায়নিক যৌগ (chemical compound) থাকে। এই রাসায়নিক যৌগ T-cell-এর নিজের তৈরি এবং এটি বিষাক্ত। শত্রুপক্ষ Xকে ধ্বংস করার সময় T-cell ওই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দেহের বাইরে নিক্ষেপ করে। T-cell থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ X কোষগুলোর প্রাচীরকে ফুটো ক'রে দেয় বা বিনষ্ট ক'রে দেয়, ফলে ঐ আক্রমণকারী 'X'দের কোষদেহ থেকে কোষীয় যাবতীয় পদার্থ বেরিয়ে যায় ফলে 'X' কোষগুলি আর বেঁচে থাকতে পারে না। এইভাবে আক্রমণকারী 'X' কোষগুলো ধ্বংস হ'য়ে যায়। তাহ'লে পর্যায়গুলি কি কি তার পুনরাবৃত্তি করা যাক। প্রথম ধাপে চিনতে পারা, দ্বিতীয় ধাপে কাছাকাছি আসা এবং তৃতীয় ধাপে ভেসিক্‌ল-এর মধ্যে থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করা ও আক্রমণকারীদের বিনষ্ট করা। এইভাবে T-cell আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য ক'রছে।

তাহ'লে প্রশ্ন হ'ল B-cell বা T-cell 'চিনতে পারার' (Identify) বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের হাম, জ্বর ইত্যাদি রোগগুলি বারবার হয়? আমরা সবাই জানি জ্বর, হাম এইসব অসুখগুলি সৃষ্টি করে ভাইরাস। ভাইরাসের চেহারাটা তোমাদের জানা। একটি DNA বা RNA এর অণুকে প্রোটীন দিয়ে মোড়া। আক্রমণের সময় DNA বা RNAটি কোষদেহে ঢুকে পড়ে আর প্রোটীনের খোলটি কোষদেহের বাইরে পড়ে থাকে। প্রথমবার যখন ওই অসুখগুলো হ'ল তখন সেই ভাইরাসদের চিনে পর্যায়ক্রমে তাকে ধ্বংস ক'রেছিল। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পুনরায় জ্বর হবার সময় B-cell, T-cell 'চিনে নেওয়া' (Identify) এবং 'মনে রাখা' (Memory) ইত্যাদি গুণগুলো কার্যকরী হ'ল না ফলত Immune System ফেল ক'রে গেল। কেন ফেল ক'রল জানো? দ্বিতীয়বার জ্বরের সময় ভাইরাসগুলো এলো দেহাকৃতি (Structure) পাল্টে। আলাদা-আলাদা রূপে। ফলে প্রথমবারের চেনা কোনও কাজে লাগল না। ল'ড়তে হ'ল নতুন ক'রে। প্রতিরোধী কোষগুলো হয়ত ভাবছিল, আর কোনো চিন্তা নেই। প্রথম ও দ্বিতীয়বারের 'চেনা'কে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু হায়! তৃতীয়বার জ্বরের সময় দেখা গেল ভাইরাসের চেহারা পুনরায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে এবারও পারল না চিনতে, আবার হেরে গেল। এর পেছনে কারণ একটাই— ভাইরাসের আশ্চর্য রকমের বহুরূপী ক্ষমতা। ভাইরাসের এই গঠন বা দেহাকৃতি পাল্টে ফেলতে পারে স্রেফ একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড। পরের বারে, যে ভাইরাস এল তার তখন অ্যামাইনো অ্যাসিড 'প্রোলিন' পাল্টে লিউসিন হ'য়েছে। ফলে Immune System আর চিনতেই পারল না, ভাবল, নতুন ক'রে কেউ এসেছে।

এবার প্রতিরোধ ব্যবস্থার আর-একটা দিকের কথা বলি। আলোচনার শুরুতেই ব'লেছিলাম Activation বা জাগ্রত হওয়া বা সক্রিয় হওয়ার কথা। জাগ্রত হ'য়ে চিৎকার শুরু— মনে আছে নিশ্চয়। সেই জাগ্রত হওয়া প্রসঙ্গেই বলি 'বেশী জাগ্রত' হ'লে কি হয়। অধিক সক্রিয়তার ফলে হিতে বিপরীত। দু'একটা তোমাদের দেখা ঘটনার কথা ধরা যাক। তোমরা কেউ-কেউ হয়ত হামেশাই 'অ্যালার্জি' শব্দটা শুনেছ। অনেকে বলে ছাতিম ফুল ফুটলে আমার শ্বাসকষ্ট বেড়ে

যায়, হাঁচি হয়। ছাতিমে আমার দারুণ 'অ্যালার্জি'। শান্তিনিকেতনে, কথাটা বেশ শোনা যায়। আবার তোমাদের মধ্যে কেউ বল ঠাণ্ডায়, কেউ-বা ডিম খেলে আবার কারো চিংড়ি খেলে অ্যালার্জি। কারোর গা চুলকায়, ফুলে যায়, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট পর্যন্ত হয়।

কেন এমনটা ঘটে। প্রতিরোধ ব্যবস্থার (Immune System) কার্যপদ্ধতিটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি। ধর কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল, পিঠে একটা চাপড় মেরে জিজ্ঞেস ক'রলে— কেমন আছিস? এই চাপড়টা তো ভালবাসার চাপড়। বন্ধু কিছু মনে ক'রছে না কোনও ক্ষতিও হ'চ্ছে না। কিন্তু যদি চাপড়টা খুব জোরে হ'য়ে যায়, বন্ধু আহত হ'তে পারে, এমনকি তেমন হ'লে মরেও যেতে পারে। সেইরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune System) যখন সঠিকভাবে কাজ ক'রছে তখন সে অসুখকে সারিয়ে তুলছে। কিন্তু যদি অসুখটাকে নিশ্চিত ক'রে চিনে ফেলে বেশি উত্তেজিত (over activated) হয় তখন ভালোর জায়গায় খারাপই হয় বেশি। অধিক সক্রিয় হ'লেই এই বিপত্তি। 'অ্যালার্জি' এইরকমই একটা ঘটনা।

চিংড়ি, ডিম ইত্যাদি খাদ্যে কি আছে? প্রোটীন, কার্বহাইড্রেট আর ফ্যাট। খাদ্যের যে অংশে প্রোটীন আছে সেই অংশকে ক্ষতিকারক ব'লে চিনতে পারছে কিন্তু এমন বেশি ক'রে চিনে ফেলছে যে ওই খাদ্য খেলেই শরীরে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি (adverse reaction) শুরু হ'য়ে যাচ্ছে। মৌমাছি, বোলতার কামড়ে শরীর ফুলে যায় অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি মারাও যায় প্রতিরোধ ব্যবস্থার এই অধিক জাগরণ (over activation)-এর ফলে। এর নামই অ্যালার্জি।

সময় শেষ হ'য়ে এল। এই প্রসঙ্গে তোমাদের টীকাকরণের (Vaccination) প্রয়োজনীয়তা স্মরণ ক'রিয়ে দিই। এই টীকাকরণ পদ্ধতি কিন্তু একটা Immunological response. এক্ষেত্রে কি করা হয় লক্ষ্য কর, অল্প পরিমাণে রোগ বহনকারী জীবাণুকে (ক্ষতিকারক X) শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। এর ফলে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাকে (X) চিনে রাখছে। এরপর সত্যিকারের অক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে ওই জীবাণুদের চিনে নিতে অসুবিধে হ'চ্ছে না। ফলে ওই ক্ষতিকারক জীবাণু (X)-এর বিরুদ্ধে একটা 'সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা' (Active immune response) গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হ'চ্ছে। এই হ'ল টীকাকরণ (Vaccination)-এর কার্যকারিতা।

আর সময় নেই। এবার শেষ ক'রতে হ'চ্ছে। তোমাদেরও এরপর ক্লাস আছে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune System) নিয়ে আলোচনা তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে আলাদা ক'রে নেই। রক্ত নিয়ে আলোচনা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তাই সরাসরি পাঠ্যসূচী থেকে বেরিয়ে এসে আজ যে গল্প হ'ল সেই গল্প যদি তোমাদের ভাল লাগে তবে জানব আমার চেষ্টা সার্থক।

শিক্ষাসত্রে ৫.৮.২০০০ তারিখে আয়োজিত Special class for advanced knowledge in Life-science-এর চতুর্থ সভার ভাষণের অনুলিখন।

বংশগতি ও জিন: আমাদের সম্পর্ক

সুদীপ মণ্ডল
অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

তোমাদের আয়োজিত আজকের এই বিজ্ঞানসভা আমাকে অভিভূত ক'রেছে। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমাকে একজন বক্তা হিসেবে নির্বাচন করায় আমি গর্বিত। আমার জন্য তোমরা যে বিষয়টি নির্বাচন ক'রে দিয়েছ তা আজকের বৈজ্ঞানিক জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এস, দেখি আমরা মানুষেরা কিভাবে বংশগতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

পৃথিবীতে মানুষ আসার অনেক আগে এসেছে উদ্ভিদ, অন্যান্য জন্তু তারপর মানুষ। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত খাদ্য আহরণ করার জন্য। ধীরে-ধীরে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হ'তে শুরু ক'রল, শিখল অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা ক'রতে। সারাবছর ঘুরে-ঘুরে শিকার করাও বেশ অসুবিধের। শীত আছে, গ্রীষ্ম আছে, আছে প্রবল বর্ষা। এই সমস্ত অসুবিধার সমাধানে মানুষ তখন শুরু ক'রল চাষবাস সেইসঙ্গে পশু-পাখা পালন। কিন্তু চাওয়ার তো শেষ নেই। তখন মানুষ ভাবতে শুরু ক'রল কিভাবে চাষবাস এবং পশুপাখী প্রতিপালনকে আরও উন্নত করা যায়। ক্রমশঃ ভাবতে লাগলো কিভাবে পাওয়া যেতে পারে আরও উন্নত মানের ধান যা থেকে পাওয়া যাবে বেশী ফসল। এমনকি এও ভাবল যে বেশী পরিমাণে দুধ দেওয়া স্বল্পায়ু গরুদের আয়ু অর্থাৎ বাঁচার গুণ আরও কি ক'রে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। **'জেনেটিক্স'** কথাটা তখন তো তাদের জানা ছিল না। কিন্তু তারা ভাবছিল কিভাবে দু'টি প্রাণীর গুণ একটি প্রাণীতেই পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ দ'টো ভালো গুণ যা আলাদা-আলাদা জীবের মধ্যে আছে তাদের একত্রিত করার পদ্ধতি। ভাবল সেটা সম্ভব হ'তে পারে পরের প্রজন্মে অর্থাৎ এদের বাচ্ছার মধ্যে।

এইসব সম্ভাবনার কথা নিয়েই আজকের সভায় আলোচনা ক'রব। এই যে একটু আগে জেনেটিক্স শব্দটি উচ্চারণ ক'রলাম তার অর্থটি হ'ল, যে প্রক্রিয়ার কোনও জীবের একটি গুণ বা চরিত্র, একটি বংশ (Generation) থেকে পরবর্তী জনু বা বংশতে স্থানান্তরিত হ'চ্ছে বা চ'লে যাচ্ছে সেই প্রক্রিয়াকেই ব'লছি বংশগতির বিজ্ঞান (Science of inheritance)। এই হ'ল বংশগতি-বিদ্যার (Genetics) প্রথম কথা। আবার একথাও জেনে রাখ যে, সবসময় বেছে-বেছে ভাল গুণ বা চরিত্রগুলোই যে পরের জনুতে সঞ্চারিত হ'চ্ছে তা কিন্তু নয়, ভালো-খারাপ সব চরিত্রই চ'লে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খয়েরী রঙের বাবা ঘোড়া এবং সাদা রঙের মা ঘোড়ার বাচ্ছার গায়ের রঙ সাদা ও খয়েরী ছোপ-ছোপ হবে। অর্থাৎ বাচ্ছার মধ্যে বাবার গুণ যেমন থাকবে তেমনি মায়ের গুণও থাকবে। অন্যদিকে বাচ্ছার আরও কিছু গুণ থাকবে যা কিন্তু একেবারে নিজস্ব। এবার তাহ'লে আলোচনার আরও একটু গভীরে যাই।

গ্রেগর জোহান মেণ্ডেলকে বলা হয় Father of Genetics অর্থাৎ বংশগতিবিদ্যার জনক। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক। তিনি ঐ চার্চের বাগানে অতি কৌতূহলের সঙ্গে মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে, আশ্চর্য সমস্ত ফলাফল লক্ষ্য করেন। মটরগাছের মোট সাতটি গুণ বা চরিত্র নিয়ে তিনি পরীক্ষাগুলি চালিয়েছিলেন। প্রত্যেকবার পরীক্ষার সময় তিনি কেবলমাত্র একটি চরিত্র নিয়েই বিশ্লেষণ ক'রেছেন, বাকী ছ'টি চরিত্রগুলিকে ঐ পরীক্ষার সময় বিবেচনা করেননি।

ৰজ্জ্বজ্জ্ব সালে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে কিছু সূত্রের সন্ধান পেলেন। পরীক্ষা ক'রে দেখালেন যে একটি লম্বা এবং একটি বেঁটে মটরগাছের মধ্যে নিষেক ঘটালে প্রাথমিক জনুতে (F_1) উৎপন্ন সমস্ত মটরগাছই লম্বা প্রকৃতির হ'চ্ছে। আবার F_1-এ উৎপন্ন লম্বা মটরগাছগুলির মধ্যে পরস্পর নিষেক ঘটালে পরবর্তী বংশে অর্থাৎ দ্বিতীয় জনুতে (F_2) আশ্চর্যভাবে দেখা গেল লম্বা আর বেঁটে দু'রকমই মটরগাছ জন্মেছে। অঙ্ক ক'ষে মেণ্ডেল দেখালেন লম্বা ও বেঁটে গাছের অনুপাত ৩ : ১ অর্থাৎ মোট উৎপাদিত মটরগাছের তিনভাগই লম্বা এবং বাকী একভাগ বেঁটে প্রকৃতির এই পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ ক'রলেন যে প্রথম বংশে (F_1) বেঁটে গুণটি লুকিয়েছিল বা প্রচ্ছন্ন ভাবে উপস্থিত ছিল লম্বা গুণটির পাশে। এর থেকে সহজেই পরিস্কার বোঝা গেল যে বেঁটে গুণটি হারিয়ে যায়নি, দু'টি গুণই ছিল প্রথম বংশে। কিন্তু লম্বা গুণটি শক্তিশালী (প্রকট) হওয়ায় প্রথম জনুতে (F_1) সব মটরগাছগুলিই জন্মেছিল লম্বা প্রকৃতির। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে প্রকট গুণটির পাশে প্রচ্ছন্ন গুণটি থাকলেও প্রকট গুণটিই প্রকাশিত হবে, প্রচ্ছন্নটি নয়।

তোমরা জান একটি মাত্র কোষ দিয়েই জীবের জীবন শুরু হয়। সে জীব উদ্ভিদই হোক বা প্রাণী। ওই একটিমাত্র কোষই বিভাজিত হ'তে-হ'তে সবশেষে পরিণত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ বা প্রাণীতে। কোষ বিভাজন দু'ভাবে হ'তে পারে। মাইটোসিস ও মিয়োসিস। মাইটোসিস পদ্ধতিতে একটি কোষ বিভাজিত হ'য়ে অনুরূপ দু'টি কোষ তৈরী হয়। কিন্তু মিয়োসিস কোষবিভাজনের বেলায় একটি কোষ থেকে চারটি কোষ উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন চারটি কোষ কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজনে উৎপন্ন কোষ দু'টির মত নয়, কেননা মিয়োসিসে উৎপন্ন চারটি কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা বিভাজনের শুরুতে কোষটির (মাতৃকোষ) ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হ'য়ে যায়। এইভাবে যে অর্ধসংখ্যক (n) বিশিষ্ট কোষগুলি তৈরী হয় সেই কোষগুলিকে বলে **গ্যামেট**। এইরকম অর্ধসংখ্যক বিশিষ্ট একটি পুরুষ কোষ (পুং গ্যামেট) এবং একটি স্ত্রী কোষ (স্ত্রী গ্যামেট) একত্রিত (নিষেক) হ'য়ে যে কোষটি (2n) তৈরী হয় তার নাম জাইগোট। যেটি কিনা পরবর্তী প্রজন্মের প্রথম কোষ অর্থাৎ জীবনের আরম্ভের কোষ। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে যে উৎপন্ন (জাইগোট) কোষের নিউক্লিয়াসে অর্ধেকগুলি ক্রোমোজম এসেছে স্ত্রী গ্যামেট থেকে বাকী অর্ধেকগুলি পুং গ্যামেট থেকে।

জেনে রাখা ভাল **ক্রোমোজম** কথাটি থেকে এসেছে দু'টি শব্দ থেকে। একটি Chrome অর্থাৎ রঙ এবং Some অর্থাৎ বা দেহ। একত্রে অর্থ দাঁড়ায় নিউক্লিয়াসের যে অঙ্গগুলি রঙগ্রহণে সংবেদী বা সক্ষম সেই অঙ্গগুলিই হ'ল Chromosome। ১৯০৫-০৬ সালে ক্রোমোজম আবিষ্কার হ'য়েছিল। ১৮৭০ সালে মেণ্ডেল জানিয়েছিলেন প্রত্যেকটি চরিত্র বা গুণের জন্য দু'টি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। মেণ্ডেলের সেই তত্ত্বকেই ১৯০০ সালে পুনঃপ্রবর্তন ক'রলেন হুগো দ্য ভ্রিস্, জার্মেক

এবং কোরেন্স। ফিরে আসি ক্রোমোজমের কথায়।

ধরা যাক, কোনও কোষের ক্রোমোজম সংখ্যা ১৮। কোষটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হবার সময় ক্রোমোজমগুলি মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দু'ভাগে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি ভাগ পর্যায়ক্রমে কোষে পরিণত হয়। ফলে কোষ বিভাজনের পর উৎপন্ন দু'টি কোষেরই ক্রোমোজম সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮, অর্থাৎ মাতৃকোষের মত একই থাকে। কিন্তু মিয়োসিস অর্থাৎ জনন কোষ (গ্যামেট) বিভাজনের বেলায় একটি কোষ থেকে যে চারটি কোষ উৎপন্ন হয় সেই কোষগুলিতে ক্রোমোজম সংখ্যা ক'মে অর্ধেক হ'য়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংখ্যা দাঁড়ায় ৯। মেণ্ডেলের সূত্র মতে 'প্রতিটি চরিত্রের জন্য একজোড়া বৈশিষ্ট্য' থাকে, দেখা যায় তা এই ক্রোমোজমের মধ্যেই অবস্থিত।

১৯৪৩-৪৪ সালে বিজ্ঞানীরা ক্রোমোজম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে দেখলেন একটি সুতোর মত অংশ যা কিছু জিনিসকে জড়িয়ে আছে। এই সুতোটিই হ'ল DNA আর জড়িয়ে থাকা জিনিসগুলিহ'ল প্রোটিন। DNA এর গঠন (চিত্র ১) আবিষ্কার করেন ওয়াটসন এবং ক্রিক ১৯৫৩-৫৫ সালে এজন্য তাঁরা ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। DNAএর গঠন অনেকটা ঠিক পেঁচানো সিঁড়ির মত।

চিত্র ১. DNAএর গঠন

ক্রোমোজম তৈরী হয় এই DNA এবং প্রোটিন দিয়েই। বৈশিষ্ট্য গঠনের যাবতীয় দায়িত্ব এই DNAএরই। যাই হোক DNA যে প্রোটিনকে জড়িয়ে থাকে তার গঠন চাক্‌তির মত।

এই চাকতির মত প্রোটিন অংশগুলিকে বলে কোর (Core)। এক-একটি চাক্‌তি (Core) আটটি প্রোটিন দিয়ে তৈরী। এই চাক্‌তি বা Core কে DNA তন্তু জড়িয়ে থাকে ব'লেই DNA-র দৈর্ঘ্য কম দেখায়। এই রকম ছয়টি চাক্‌তি এক জায়গায় জড়ো হয় তার উপর আরও ছয়টি, তারপর আরও এইভাবে DNA-র দৈর্ঘ্য ক'মতে থাকে কিন্তু প্রস্থে বাড়ে। এইভাবে ক্রোমোজমে ৬০-৭০ মিটার লম্বা DNA থাকতে পারে। এক-একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য DNA-র এই এক-একটি অংশই নিয়ন্ত্রক। এই অংশগুলিকেই বলে জিন (Gene)। এই জিনদের কিন্তু সাধারণ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় না।

জিনবাহিত বৈশিষ্ট্যের দু-একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মানুষের বিভিন্ন রঙের চোখের মণি। কালো, খয়েরী কারও বা নীল। এই চোখের রঙের জন্য দায়ী জিন (Gene) যা সবার এক নয়। মানবসমাজে এই যে একই জিনের বিভিন্নরূপ (Form) একেই বলে অ্যালীল্ (allele)। এমনি আরও একটি উদাহরণ হ'ল চুলের রঙ। কালো, খয়েরী, সোনালী ও ধূসর এই চার রঙের চুলের জন্য চারটি জিন দায়ী অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই চুলের রঙের জন্য দায়ী একই জিনের চারটি রূপ (Form) বা অ্যালীল্ (allele)। অতএব দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যায় যত অ্যালীলই থাক না কেন এক ব্যক্তির কাছে এক জোড়া অর্থাৎ দু'টি অ্যালীলই থাকবে। এই হ'ল মেণ্ডেল-তত্ত্বের মূল কথা।

বক্তৃতায় প্রদর্শিত স্লাইডগুলির (Projection slide) বিষয়বস্তু ছিল এই রকম :

* পৃথিবী সৃষ্টির পর জীব তখনও জন্মায়নি সেই প্রাণবিহীন অবস্থার ছবি।
* এরপর এল জীব, এল প্রাণী।
* এল সরীসৃপের দল— Reptiles।
* সরীসৃপদের অনেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।
* বিবর্তনের ধারায় সরীসৃপ থেকে একদল হ'ল পাখী অন্যদল স্তন্যপায়ী।
* Tulip ফুলের ছবি। সমস্ত লাল ফুলের মাঝে শুধু একটি হলুদ।
* ছবিতে দেখা যাচ্ছে নানা রঙের, নানা গঠনের কুকুর।
* এখানে দেখা যাচ্ছে মানুষের চারজোড়া চোখ। পরের ছবিতে দেখ—
* চারজন মানুষের গায়ের রঙ ও চুল আলাদা-আলাদা।

  Note: এই গায়ের রঙ, চোখের রঙ বা চুলের জন্য এক-একটি ভিন্ন-ভিন্ন জিন দায়ী। এই একই জিনের বিভিন্নরূপকেই অ্যালীল (allele) বলে। কিভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে এই বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র গঠিত হ'চ্ছে বা সঞ্চারিত হ'চ্ছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে বিদ্যার চর্চা সেই বিজ্ঞানকেই বলে Science of inheritence বা Study of Genetics. ১৮৭৬ সালে গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল এই বিদ্যার সূচনা ক'রেছিলেন ব'লে তাঁকে Father of genetics বলা হয়।
* চারটি গরুর ছবি। জোড়া দু'টির এক-এক জোড়া পরস্পর হুবহু এক (যমজ)।

Note: আমরা জানি পুং জনন কোষ (গ্যামেট) ও স্ত্রী জনন কোষ মিলে যে কোষটি (জাইগোট) উৎপন্ন হয় এটিই হ'ল জীবের প্রথম কোষ। এরপর কোষটি বিভাজিত হ'য়ে একটি থেকে দু'টি তারপর ক্রমাগত চারটি থেকে আটটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। বারবার বিভাজনের ফলে কোষটি পরিশেষে সহস্রতর সংখ্যায় পরিণত হয়। ছবিতে প্রতিজোড়া গরুদু'টির (যমজ) ক্ষেত্রে জাইগোটের বিভাজনের সময় যখন প্রথম কোষটি থেকে দু'টি হয় সেইসময় ওই কোষ দু'টি যদি আলাদা ক'রে বিভাজিত হ'তে থাকে ভ্রূণ গঠনের জন্য, তখন হুবহু একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দু'টি গরু পাওয়া যাবে।

* চারজন মানুষের ছবি। দু'টি ক'রে যমজ ভাই। দু'জন হুবহু এক। বাকী দু'জন একটু আলাদা। যে যমজ ভাই দু'টি একই জায়গায় বড় হ'য়ে উঠেছে তাদের বাহ্যিক গঠন থেকে শুরু ক'রে চিন্তা, পছন্দ ইত্যাদি সব কিছুই এক। কিন্তু অন্য যমজ ভাই দু'টিতে একটু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তারা আলাদা-আলাদা জায়গায় বড় হ'য়েছে ফলে তাদের বাহ্যিক রূপ এক হ'লেও চিন্তা, পছন্দ, আচার-ব্যবহার আলাদা। এর থেকে বোঝা যায় জীবের উপর জিন ছাড়াও পরিবেশ বা আবহাওয়ারও প্রভাব আছে।

* মেণ্ডেলের সেই বাগানের ছবি যেখানে তাঁর সেই যুগান্তকারী কাজ ক'রে যে সব তথ্য দিয়ে গেছেন। যা আজও আমরা মেনে চ'লেছি।

* একটি কোষের ছবি। নিষেকের সময় ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস মিলিত হ'য়েছে। প্রমাণিত হ'চ্ছে নিউক্লিয়াসই মূল কথা।

* নিউক্লিয়াসের ছবি। পাকানো ক্রোমোজমের ছবি।

Note: প্যাঁচ খুললেই ক্রোমোজম থেকে বেরিয়ে প'ড়বে DNA। অতএব বোঝা যাচ্ছে DNA পেঁচিয়ে, জড়িয়ে আছে ক্রোমোজমে। ক্রোমোজম আছে নিউক্লিয়াসে। পরের ছবিতে দেখা যাক DNA ক্রোমোজমে কিভাবে আছে।

* ছবিটি চারজন মানুষের। এঁরা হ'লেন James B Watson, Fransis Crik, Roseman Franklin এবং Will kins. Watson-Crik-Willkins DNA- এর গঠন ব্যাখ্যা ক'রে নোবেল পুরস্কার পান।

* পবের ছবিতে দেখা যাচ্ছে উপরে DNA-র ছবি নীচে ক্রোমোজমের (মেটাফেজ)।

Note: DNA সবুজ রঙের যে চাক্‌তিগুলিকে জড়িয়ে আছে তার নাম হিস্টোন (Histone Core)। হিস্টোন এক ধরণের প্রোটিন। যেহেতু মাঝের অংশ তৈরী করে সেহেতু Core বলে। আমরা জানি এই হিস্টোন কোর আটটি প্রোটিন দিয়ে তৈরী। এছাড়াও আছে Histone linker যা প্রোটিনগুলিকে জুড়তে সাহায্য করে (ছবিতে হলুদ রঙের অংশগুলি) যখন দু'টি হিস্টোন কোর একদিকে এসে যায় তখন DNA-র দৈর্ঘ্য কমে এবং প্রস্থ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে Solinoid। এই সলিনয়েড আবার যখন DNA loop তৈরী করে তখন DNA প্রস্থে আরও বেড়ে যায়।

* এটি একটি DNA-র ছবি।

Note: ছবিতে দেখা যাচ্ছে DNAটির দু'টি তন্তু (Strand), একটি হলুদ অন্যটি সবুজ রঙ দিয়ে দেখানো হ'য়েছে। বিভাজনের সময় সবুজ এবং হ'লুদ Strand দু'টি আলাদা হ'য়ে যায় অর্থাৎ DNA মাঝ বরাবর খুলে যায়। এই এক-একটি তন্তুর (Strand) পাশে নতুন একটি ক'রে তন্তু উৎপন্ন হয়। ছবিতে দেখ সবুজ থেকে বেগুনী হ'য়েছে এবং হলুদ থেকে গোলাপী হ'য়েছে। এই

ঘটনাকে বলে DNA replication (সংশ্লেষ) অর্থাৎ একটা DNA molecule (অণু) থেকে নতুন DNA হওয়া। এই যে নতুন দু'টি DNA তৈরী হ'ল তার প্রত্যেকটিরই একটি ক'রে নতুন strand এবং একটি ক'রে পুরোনো strand এজন্যই এই replicationকে (সংশ্লেষ) Semi conservative replication। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান রাখার জন্য এই DNA replication প্রক্রিয়াটির প্রয়োজন হয়। এই DNA'র অংশ হ'ল জিন (Gene) আর এই জিনই প্রোটিনকে কোড্ (Code) করে।

* এই ছবিটি হ'ল প্রোটিন সংশ্লেষের (Synthesis)। এখানে দেখছো ধূসর রঙের প্রোটিন লাল রঙের DNA-র ওপর এসে বসার ফলে DNA-র তন্তু দু'টির প্যাঁচ খুলে গেল এবং নীল রঙের RNA তৈরী হ'ল। এই RNA-রা সাইটোপ্লাজমে বেরিয়ে রাইবোজমের কাছে চ'লে আসে। এখানেই প্রোটিন তৈরী হয়। পরের ছবি লক্ষ্য কর।

* এই ছবিতে দেখ প্রোটিন কিভাবে তেরী হ'চ্ছে। RNA রাইবোজমের টানেলের (Tunnel) মধ্যে দিয়ে যাবার সময় টানেলের অপর পৃষ্ঠে যেন এক-একটি পুঁথি জমতে জমতে মালার মত তৈরী হয়। এইভাবে যে মালাটি তৈরী হ'ল সেই মালাটিই একটি প্রোটিন। আর পুঁথিগুলি হ'ল এক-একটি অ্যামাইনো-অ্যাসিড।এই অ্যামাইনো-অ্যাসিড তৈরীতে যে RNA-রা সাহায্য ক'রছে তারা হ'ল t-RNA লক্ষ্য ক'রে দেখ তাদের মাথায় র'য়েছে তিনটে-তিনটে ক'রে খাঁজ (Codon)। এইভাবে DNA থেকে RNA তৈরীর পদ্ধতিকে বলে Transcription এবং RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়াকে Translation.

এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি প্রত্যেক কোষেই সব রকমের জিন আছে কিন্তু সর্বত্র সব জিন প্রকাশ (expression) পাচ্ছে না যেমন হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষেত্রে হৃদ্‌পিণ্ডের জিন প্রকাশিত হ'চ্ছে অথচ যকৃতের জিন থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ পাচ্ছে না। যকৃতের জন্য ঐ জিনটি প্রকাশিত হ'চ্ছে যথাস্থানে অর্থাৎ যকৃতেই।

যাই হোক আজ এই আলোচনা সভার সময় শেষ। এবিষয়ে যদি কিছু থাকে তাহ'লে যোগাযোগ ক'র। আর একটিমাত্র ছবি দেখিয়ে বক্তব্য শেষ ক'রব। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ইঁদুর, আরশোলা, ড্রসোফিলা ইত্যাদি প্রাণী নিয়ে গবেষণা ক'রে কি লাভ? এই ছবিতে দেখ একই জিন ঠিকমত কাজ না ক'রলে ইঁদুরে যে উপসর্গ দেখা যায় মানুষের মধ্যেও তা একইভাবে বর্তমান। কাজেই এটা প্রমাণিত হ'চ্ছে যে প্রাণী ও মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক র'য়েছে আমাদের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সমাজে এবং দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুর সঙ্গেই। আমরা তাদের নিয়ে ব্যবসা ক'রছি মাত্র।

এই ভাষণটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে বক্তা অধ্যাপক সুদীপ মণ্ডল বিদেশে গবেষণারত। অদ্যাবধি দেশে না ফেরায় সভায় প্রদর্শিত স্লাইডগুলির ছবি মুদ্রণ করা সম্ভব হ'ল না। উপরে স্লাইড প্রদর্শনের সময় কেবলমাত্র প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি পর্যায়ক্রমে মুদ্রিত হ'ল।

বিজ্ঞানসভার বক্তা পরিচিতি

সমীর ভট্টাচার্য

অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪২) নিজ ভূমে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজি থেকে ১৯৭০ সালে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময় কালে দীর্ঘদিন তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি ১৯৭১ সালে অধ্যাপক পদে বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই বিভাগে নানা দায়িত্বে ও পদমর্যাদায় আসীন হ'য়ে বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগের মান আরও উন্নত ক'রে জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়কালে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে পরপর দু'বার ফুলব্রাইট স্কলারশিপ সহ আমেরিকায় গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ। বিশ্বভারতীতে তাঁর গবেষণাগার থেকে ইতিমধ্যে ছাব্বিশ জন ছাত্রছাত্রী পি.এইচ.ডি. উপাধি লাভ ক'রে দেশে-বিদেশে গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। হাঁপানি ও প্রজনন হর্মোন এবং মধুমেহ রোগের প্রতিকার নিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের গবেষণা আজও অব্যাহত আছে। গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য কুড়িটিরও বেশী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারের ভূষিত হ'য়েছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রের অধীনস্থ ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজির ডিরেক্টর পদে যোগদান করেন এবং বর্তমানে ঐ পদেই নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে AOSCE'র (এশিয়া এবং ওসানিয়া সোসাইটি ফর কম্‌পারেটিভ এণ্ডোক্রিনোলজি) সভাপতি হিসেবে ২০০৪ সাল অবধি দায়িত্ব গ্রহণ ক'রেছেন।

শেলী ভট্টাচার্য

অধ্যাপিকা ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪৬) ১৯৫৯ সালে জামসেদপুর (টাটা) অন্তর্গত সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬১ সালে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে স্নাতক হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭১ সালে গবেষণার কাজ শেষ করেন। গবেষণা চলাকালীন ১৯৬৬ সালে কলকাতার সাউথ পয়েণ্ট স্কুলে এবং ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। গবেষণার কাজ শেষ হ'লে ১৯৭১ সালে বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। অধ্যাপনার সঙ্গে-সঙ্গে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গবেষণার কাজে আজও যুক্ত আছেন। তার গবেষণার মূল বিষয় পরিবেশবিদ্যা। পরিবেশের দূষণ, কীটনাশক বর্জ্য পদার্থের প্রতিক্রিয়া, উৎসেচক, প্লাজমাপর্দা ইত্যাদি নিয়ে আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণাগার থেকে উনিশটি ছাত্র-ছাত্রী পি-এইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্ত হ'য়ে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দীর্ঘদিন তিনি বিভাগের পরে ভবনের দায়িত্বে ছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগের মান উন্নীত ক'রতে অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে হাত লাগান। বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নত ক'রতে এঁদের সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

শিবনাথ মজুমদার

অধ্যাপক মজুমদার বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে ১৯৮৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান সহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৭ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর থেকে অধ্যাপক মজুমদার 'দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা' বিষয়টি নিয়ে নানান গবেষণাগারে গবেষণার কাজে যুক্ত থাকার পর ১৯৯৭ সালে চণ্ডীগড় 'মেডিক্যাল এণ্ড রিসার্চ' থেকে পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ করেন। এই সময় থেকে শ্রীমজুমদার স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ফেলোশিপসহ আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণা করেন। অধ্যাপক মজুমদার ১৯৯৯ সালের নভেম্বর থেকে অদ্যাবধি প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের উক্ত বিষয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। পূর্বে ১৯৯৩-৯৪ সালে রাজস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে যুক্ত ছিলেন।

সুদীপ মণ্ডল

১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতীর প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে জীনতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি গবেষণার কাজে আমেরিকায় র'য়েছেন। এজন্য বিস্তারিত পরিচিতি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না।

৪

প্রসঙ্গ : জীবন বিজ্ঞান প্রোজেক্ট

শান্তিনিকেতন ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার জলের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ

মধুসূদন হাজরা (২০০২)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

আমরা বিগত কয়েক বছর থেকে দেখে আসছি যে ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কিছু মানুষ পানীয় জলে আর্সেনিক থাকার জন্য তার কুপ্রভাবে পড়ে অসুস্থ হয়ে প'ড়েছেন এবং কিছু মানুষ মারাও গিয়েছেন। স্বভাবতই এবিষয়ে আমার মনে কৌতূহল জমে ছিল। আমি যখন নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উঠলাম তখন জীবনবিজ্ঞানের প্রজেক্ট করার সুযোগ পেলাম। আমি সেই সুযোগটি ব্যবহার ক'রে উপস্থিত প্রজেক্টটি রূপায়ণের চেষ্টা করলাম।

উপকরণ

যন্ত্রপাতি (ক) জেনারেটর বোতল, (খ) অ্যাবসরবার টিউব, (গ) পিপেট নল, (ঘ) টেস্ট টিউব, (ঙ) স্পেক্‌ট্রোফোটোমিটার যন্ত্র।

রাসায়নিক উপকরণ (ক) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, (খ) স্টেনাস ক্লোরাইড দ্রবণ, (গ) আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ জিঙ্ক, (ঘ) লেড অ্যাসিটেট, (ঙ) সিলভার ডাই-ইথায়িডাই-থায়ো কার্বমেট, (চ) জল— যেসব এলাকা থেকে সংগৃহীত। (i) অজয় নদ, (ii) কাছারীপট্টী, (iii) শিক্ষাসত্র, (iv) শান্তিনিকেতন হাতিপুকুর, (v) শান্তিনিকেতন গুরুপল্লী, (vi) উকিলপট্টী।

পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রথমে পিপেটের সাহায্যে ৩৫ মিলিমিটার সংগৃহীত জল একটি পরিষ্কার জেনারেটর বোতলে নেওয়া হ'ল এবং তারমধ্যে পিপেটের সাহায্যে ৫ মিলিলিটার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ২ মিলিলিটার পটাসিয়াম আয়োডাইড, ০.৫ মিলিলিটার স্টেনাস ক্লোরাইড দ্রবণ মিশ্রিত ক'রে একটি দ্রবণ তৈরি করা হ'ল। মিশ্রণটিকে একটি আলাদা জায়গায় ১৫ মিনিট রাখা হ'ল। কিছু পরিমাণ লেড অ্যাসিটেট, গ্লাসউল অ্যাডপ্‌টারের মধ্যে দিয়ে গ্লাসউলগুলির শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি করা হ'ল। এরপর অ্যাবসরবার টিউব নিয়ে তারমধ্যে ৪ মিলিলিটার সিলভার ডাইইথায়িডাইথায়ো কার্বমেট দ্রবণ নেওয়া হ'ল। গ্লাসউল অ্যাডেপ্‌টর ও অ্যাবসরবার টিউবকে যুক্ত করা হ'ল। (চিত্র ১)

জেনারেটর বোতলে রাখা দ্রবণটির মধ্যে ৩ গ্রাম আর্সেনিক-মুক্ত বিশুদ্ধ জিঙ্ক দেওয়া হ'ল। গ্লাসউল অ্যাডপ্‌টর ও অ্যাবসরবার টিউবটিকে জেনারেটর বোতলের সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল। কমপক্ষে ৩০ মিনিট বিক্রিয়াটি হওয়ার পর যখন বিক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেল তখন সিলভার ডাই-ইথায়িডাই-থায়ো কার্বমেট দ্রবণটি একটি টেস্টটিউবে নিয়ে স্পেক্‌ট্রোফোটোমিটার যন্ত্রে ৫৩৫

তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণ করা হ'ল।
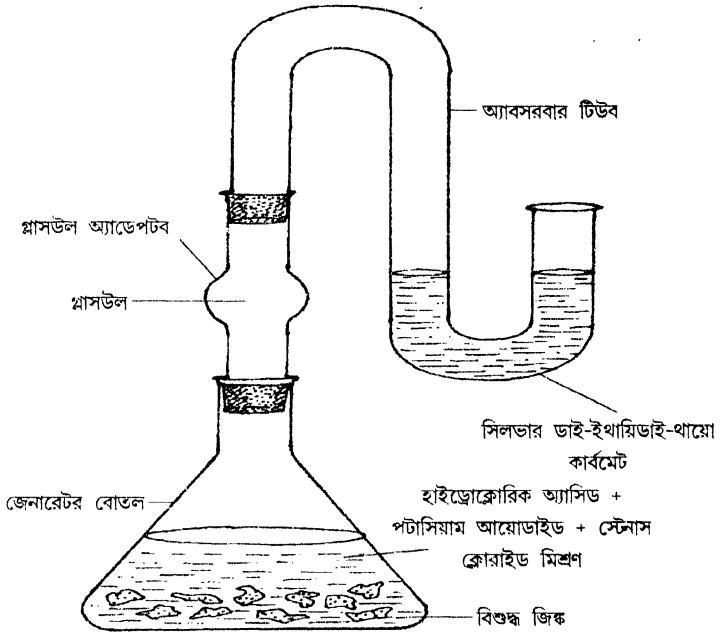
চিত্র ১. জলে আর্সেনিক নির্ণয় পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ

জেনারেটর বোতলে জিঙ্ক দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা যাবে যে বোতলটির ভিতরে বিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে। বিশুদ্ধ জিঙ্ক দ্রবণটির সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে বুদবুদ সহকারে আর্সিয়ান গ্যাস উৎপন্ন ক'রছে যা গ্লাসউল অ্যাডেপটরের মধ্য দিয়ে গিয়ে অ্যাবসরবার টিউবে রাখা সিলভার ডাইইথায়িডাইথায়ো কার্বমেট দ্রবণটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

কমপক্ষে প্রায় ৩০ মিনিট বিক্রিয়াটি হওয়ার পর যখন বিক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেল তখন আর্সিয়ান গ্যাসযুক্ত সিলভার ডাইইথায়িডাইথায়ো কার্বমেট দ্রবণটিকে ৫৩৫ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্পেক্ট্রোফোটোমিটার যন্ত্রে পরীক্ষা ক'রে নিম্নলিখিত জায়গাগুলির জল থেকে উল্লিখিত পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেল।

জায়গার নাম	আর্সেনিকের পরিমাণ
অজয় নদ (ফেরীঘাট অঞ্চল)	০.০৪৫ মাইক্রোগ্রাম / ৩৫ মিলি.লি
কাছারীপট্টী (চাপাকল)	০.০০৯ মাইক্রোগ্রাম / ৩৫ মিলি.লি
শিক্ষাসত্র (ট্যাঙ্ক)	০.০২২ মাইক্রোগ্রাম / ৩৫ মিলি.লি
শান্তিনিকেতন (হাতিপুকুর)	০.০০২ মাইক্রোগ্রাম / ৩৫ মিলি.লি
গুরুপল্লী (কুয়ো)	০.০০১ মাইক্রোগ্রাম / ৩৫ মিলি.লি
উকিলপট্টী (চাপাকল)	০.০০৪ মাইক্রোগ্রাম / ৩৫ মিলি.লি

তালিকা ১. সংগৃহীত নমুনায় আর্সেনিকের পরিমাণ

গাণিতিক সূত্র $\frac{MgAs}{L} = \frac{\mu As (4ml SDDC)}{ml sample (35 ml)}$ কে ব্যবহার ক'রে আমার সংগ্রহ করা জলগুলি থেকে আর্সেনিকের পরিমাণ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটারে প্রকাশ ক'রতে সক্ষম হয়েছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত জলের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণগুলি হ'ল নিম্নরূপ :

জায়গার নাম	আর্সেনিকের পরিমাণ
অজয় নদ (ফেরীঘাট অঞ্চল)	২৯.৯৫ মাইক্রোগ্রাম / লি
কাছারীপট্টী (চাপাকল)	৭.৪ মাইক্রোগ্রাম / লি
শিক্ষাসত্র (ট্যাঙ্ক)	১৫.৫৩ মাইক্রোগ্রাম / লি
শান্তিনিকেতন (হাতিপুকুর)	৩.০ মাইক্রোগ্রাম / লি
গুরুপল্লী (কুয়ো)	২.৪ মাইক্রোগ্রাম / লি
উকিলপট্টী (চাপাকল)	৪.২৬ মাইক্রোগ্রাম / লি

তালিকা ২. প্রতি লিটারে আর্সেনিকের পরিমাণ

উপরের ছকটি থেকে বোঝা যায় যে অজয় নদে আর্সেনিকের পরিমাণ সব থেকে বেশী এবং গুরুপল্লীতে আর্সেনিকের পরিমাণ সবথেকে কম। কিন্তু ঠিক কতটা কম বা বেশী সেই পরিমাণটাকে আমরা জোর দিয়ে প্রকাশ ক'রতে পারি না। কারণ :

জল একবার মাত্র সংগ্রহ ক'রে একবার পরীক্ষা ক'রে আর্সেনিকের পরিমাণগুলি পাওয়া গিয়েছে। জলের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ সঠিক নির্ণয় হ'তে পারে তখনই যখন জায়গাগুলির থেকে ওই পৃথক-পৃথকভাবে জল সংগ্রহ ক'রে আট থেকে দশবার পৃথক-পৃথকভাবে পরীক্ষা ক'রে সেখান থেকে পাওয়া আর্সেনিকের পরিমাণগুলির একটা গড় ক'রে, নির্দিষ্ট অঙ্কে আর্সেনিকের পরিমাণগুলি প্রকাশ করা হ'ত।

কিন্তু পরীক্ষাটি আট থেকে দশবার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কারণ পরীক্ষায় ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি খুবই খরচসাপেক্ষ এবং প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব। ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ

অর্গানাইজেশন বা W.H.O.-এর সমীক্ষা অনুসারে, যদি প্রতি লিটার জলে ১০ মাইক্রোগ্রাম বা তার কম পরিমাণে আর্সেনিক থাকে তবে সেই জল পানীয় বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার ক'রলে কোনো ক্ষতি হয় না; যদি প্রতি লিটার জলে ১০ মাইক্রোগ্রামের বেশী আর্সেনিক থাকে তবে তা পানীয় হিসাবে ব্যবহার ক'রলে দেহে চর্মরোগ ও পেটের মধ্যে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

আমি পরীক্ষাটি করার পর দেখলাম যে অজয় নদ ও শিক্ষাসত্রের জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ১০ মাইক্রোগ্রামের থেকে বেশী, তাই এই দুই জায়গার জল পানীয় বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার না করার প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রছি (তালিকা ১ ও ২)।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উপরের পরীক্ষাটি থেকে এইরকম সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শান্তিনিকেতন ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জলের মধ্যে কম বেশী আর্সেনিক আছে।

সতর্কতা

(i) রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে পিপেট নলের সাহায্যে ঠিক-ঠিক পরিমাণ মত নিয়ে জেনারেটর বোতলে দিতে হবে। পরিমাণ একটু কমবেশী হয়ে গেলে বিক্রিয়ার বেগের মধ্যে তার প্রভার পড়ে।

(ii) গ্লাসউলে লেড অ্যাসিটেট বেশী দেওয়া উচিত নয়। কারণ বেশী দিলে গ্লাসউল অ্যাডেপটর-এর মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে লেড অ্যাসিটেট জেনারেটর বোতলের মধ্যে প'ড়তে পারে।

(iii) জেনারেটর বোতল জিঙ্ক দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গ্লাসউল অ্যাডেপটর ও অ্যাবসরবার টিউবটিকে জেনারেটর বোতলের সঙ্গে সেট ক'রতে হবে। কারণ জেনারেটর বোতলে জিঙ্ক দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিক্রিয়াটি শুরু হয়ে আর্সিয়ান গ্যাস উৎপন্ন ক'রে।

(iv) পরীক্ষায় ব্যবহৃত কাঁচের যন্ত্রপাতিগুলি সযত্নে ব্যবহার ক'রতে হবে।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রজেক্টটি রূপায়ণের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব বিশ্বভারতী প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রতাপকুমার পাটী এবং ওই একই বিভাগের শিবনাথ মজুমদার মহাশয়ের কাছে।

এছাড়াও আমি আমার পরম পূজনীয় বাবা-মা এবং বিশেষত আমার গৃহশিক্ষকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, যারা আমাকে এই প্রজেক্টটি রূপায়ণে যথাসম্ভব উৎসাহ যুগিয়েছেন।

মাগুর মাছের দেহে Aeromonous bacteria-র প্রভাব

অনির্বাণ রায় (২০০২)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যের তালিকায় মাগুর মাছ একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য; তাছাড়া রোগীর পথ্য হিসেবে এর বাণিজ্যিক মূল্যও যথেষ্ট। আমি শুনেছি মাছের দেহে ঘা সম্পর্কে এবং ঘা হওয়া মাছ খাওয়া অস্বাস্থ্যজনক। বর্তমানে মাগুর মাছের দেহে ঘা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই বিষয় দিয়ে পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা গবেষণাও ক'রছেন। বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিতভাবে ব'লতে পারেন নি মাগুর মাছের দেহে কি কারণে এই ঘা-এর সৃষ্টি হয় যাকে E.U.S. (Epizootic Ulcerative Syndrome) বলে। বহু বিজ্ঞানীর মতে এটি ব্যাকটেরিয়া-জনিত। আমার এই কাজটি সম্পূর্ণ নতুন। আমাদের বিদ্যালয়ে এর আগে এই ধরনের কাজ হয় নি। তাই এই বিষয়ে পরীক্ষাভিত্তিক গবেষণা-সংক্রান্ত উপস্থিত প্রকল্পটি নতুনত্বের দাবী রাখে। মাগুর মাছ (*Clarius batrachus*) একটি মূল্যবান মাছ। মাগুর মাছ (*Clarius batrachus*) যেহেতু একটি অতি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মাছ সেজন্য এদের বাঁচানোর উপায় জানার উদ্দেশ্যে উপস্থিত প্রোজেক্টের কাজটি ক'রেছি।

উদ্দেশ্য

প্রত্যেক সজীব প্রাণী সাধারণ অবস্থায় সুস্থ স্বাভাবিক। তখনই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে যখন তার মধ্যে কিছু জীবাণু প্রবেশ ক'রে। জীবাণু ব'লতে ব্যাকটিরিয়া (Bacteria), ভাইরাস (Virus) প্রভৃতি। Rhino Virus-এর প্রভাবে সর্দিকাশি, যেমন Tuberculosis এর প্রভাবে মানবদেহে যক্ষা হয়। এটা সুস্পষ্ট যে বিশেষ কোনো ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসের প্রবেশের জন্যই মাগুরমাছের দেহে ওই ঘা পরিলক্ষিত হয়। উপস্থিত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল মাগুরমাছের দেহে যে ঘা (Ulcer) হয় যাকে E.U.S. (Epizootic Ulcerative Syndrome) বলে তার Causative Organism বা কারণঘটিত জীবটি কি?

কাজের পদ্ধতি

সমগ্র কাজটি তিনটি পর্যায়ে ক'রেছি : (ক) পরীক্ষা ও পদ্ধতি, (খ) পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল সংগ্রহ, (গ) আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

(ক) পরীক্ষা (Experiment)

প্রয়োজনীয় উপকরণ (Materials) : কিছু মাগুরমাছ; Nutrient Agar; B.H.I. মিডিয়াম বা Brain Heart Infusion Broth; Petridishes; Conical Flasks; Taste Tubes; Pippets;

Culture hood, Incubator; High speed centrifuge.

প্রথমে Nutrient Agar তৈরি করা হ'ল সংক্ষেপে Nutrient Agar প্রস্তুতির পদ্ধতি এইরকম : একটি Conical Flaskএ Nutrient Agar Double distilled জলে দেওয়া হয়। জলকে ফোটানো হয় যাতে Nutrient Agar গুলে যায়। তারপর Conical Flaskটি তুলোর সাহায্যে মুখ বন্ধ ক'রে Autoclave-এ 15lb. pressure-এ 15 min. রাখা হয়। অতঃপর Nutrient Agar ঠাণ্ডা ক'রে Culture hood-এর ভিতরে Sterile petridishএ রাখা হয়। এবার petridishগুলি সারারাত্রি ধ'রে Incubator-এ রাখা হয় কোনো growth আছে কিনা দেখার জন্য। প্রথমে একটি ঘা-হওয়া মাগুরমাছের ঘা-এর অংশ থেকে অংশবিশেষ একটি পেট্রিডিসে 'A' এবং একটি সুস্থ স্বাভাবিক (ঘা-বিহীন) মাগুরমাছের দেহ থেকে সামান্য অংশ চেঁছে অপর Petridish 'B'-এ রাখা হ'ল। এরপর Petridish দুটিকে 30°C উষ্ণতায় Incubator-এর মধ্যে সারা রাত্রি রাখা হ'ল। পরদিন সকালে দেখা গেল 'A' Petridish-এর Nutrient Agar মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার কলোনী (Colony) তৈরি হ'য়েছে কিন্তু 'B' Petridish-এ Nutrient Agar যেমন ছিল তেমনই আছে, অর্থাৎ কলোনী তৈরি হয় নি। বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেল যে Colonyগুলি Aeromonous ব্যাকটিরিয়া গঠিত।
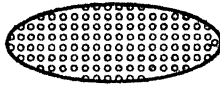
চিত্র ১ পেট্রিডিসে ব্যাক্টেরিয়া কলোনী (Colony) উৎপাদন

এবার এই Aeromonous ব্যাকটিরিয়ার Petridish 9-10 ঘন্টা ইনকুবেটরে রাখার পর উক্ত ব্যাকটিরিয়ার সর্বোচ্চ বংশবৃদ্ধির পর্যায় Exponential Growth লক্ষ্য করা গেল।
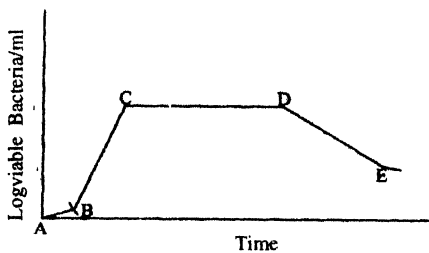
চিত্র ২ সর্বোচ্চ বংশবৃদ্ধির লেখচিত্র

এইভাবে নির্দিষ্ট ব্যাক্টেরিয়া উৎপন্ন হওয়ার পর Petridish A থেকে Aeromonous ব্যাকটিরিয়া নিয়ে Culture Medium (B.H.I. medium)-এ innoculate করা হ'ল। 9 থেকে

10 ঘন্টা ধরে Culture Medium-এ Aeromonous ব্যাকটিরিয়া রেখে আলাদা-আলাদা কয়েকটি Test-tube-এ সংগ্রহ করা হ'ল। এরপর Test-tubeগুলিকে Centrifuge machine-এ 7000 RPM-এ ঘোরানো হ'ল। Centrifuge করার পর দেখা গেল Test tubeগুলিতে Pellette তৈরি হ'য়েছে। এই Pelletteগুলিকে একত্র ক'রে Immuno-biology Laboratoryতে CFU-এ গোনা হ'ল। Innoculation দেবার 9-10 hr. পরে 1 ml ক'রে bacterial culture নিয়ে spectophotometre যন্ত্রে 600 nm. wavelength-এ দেখা হ'ল। তুলনা করার জন্য blank হিসাবে Sterile B.H.I. নেওয়া হ'ল। Spectophotometre-এ reading দেখে হিসাব ক'রে দেখা গেল, O.D পাঠ যখন 1.1 তখন 3.5×10^8 সংখ্যক colony তৈরি হয়েছে। সেই অনুসারে সুস্থ মাছকে বিভিন্ন ঘনত্বে ব্যাকটিরিয়া inject করা হ'ল। কিছু মাছকে কোনপ্রকার ব্যাকটিরিয়া inject করা হয় নি এবং কিছু মাছকে মৃত ব্যাকটিরিয়া (heat killed, 100°C এ $^1/_2$ hr. boil) দিয়ে inject করা হ'ল।

(খ) পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল সংগ্রহ

নিম্নলিখিত চারটি দলে ভাগ ক'রে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যাকটেরিয়া ইনজেক্‌সন ১ থেকে ৪-এ উল্লেখিত করা হ'ল। সন্ধ্যা 6টায় মাছগুলিতে ব্যাকটিরিয়া inject করা হয়েছিল। এর প্রত্যেক 24 ঘন্টা অন্তর মাছের উপর ব্যাকটিরিয়ার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হ'তে লাগল। নিম্নলিখিত রূপে পর্যবেক্ষিত হ'ল :

চিত্র ৩. 24 hrs. পর

১ = 10^{10} cfu/100 ml (injected), ২ = 10^{9} cfu/100 ml (injected), ৩ = Heat killed (100°C-এ 1/2 hr. boil) ব্যাকটিরিয়া injected, ৪ = inject করা হয় নি।

২৪ ঘন্টা পর দেখা গেল ১ নং মাগুরের যেখানে ঘা হয়েছে ঐ স্থানে Aeromonous bacteria inject করা হয়েছিল। ২ নং মাগুরেও ঐ একই স্থানে ঘা দেখা গেলেও অপেক্ষাকৃত কম। ৩ নং ও ৪ নং মাগুরে কোনও ঘা পরিলক্ষিত হ'ল না (চিত্র ৩)। অনুরূপভাবে পরের বার পরীক্ষার জন্য ৪৮ ঘন্টা অপেক্ষা করা হ'ল।

চিত্র ৪. **48 hrs. পর**
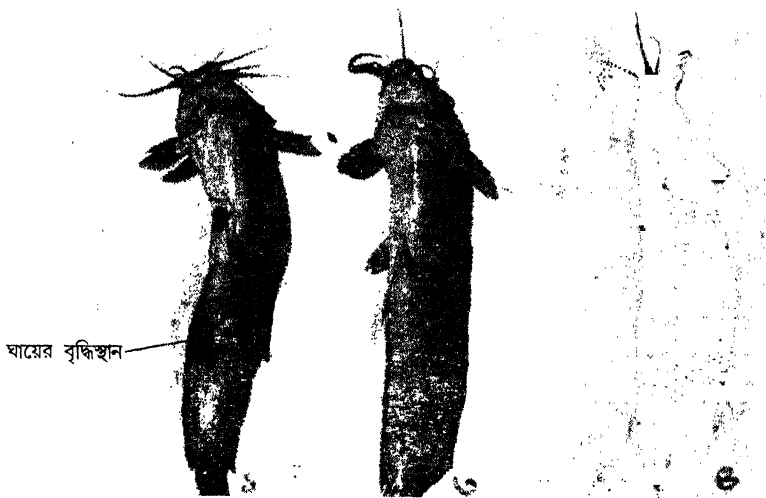
১ = 10^{10} cfu/100 ml (injected), ২ = Heat killed ব্যাকটিরিয়া injected, ৩ = inject করা হয় নি।

দ্বিতীয় পরীক্ষা অর্থাৎ ৪৮ ঘন্টা পর দেখা গেল যে ১ নং মাগুরের দেহে ঘা-এর পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি দেহের মাংস খসে পড়ছে। কিন্তু ৩ নং ও ৪ নং মাগুরের দেহে কোনো ঘা হয় নি, তারা সুস্থ ও সতেজ রয়েছে, যেখানে ১ নং মাছ প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছে (চিত্র ৪)।
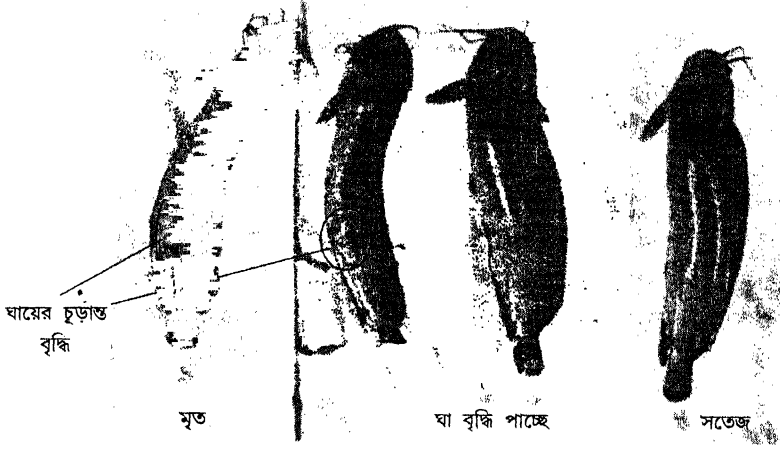
চিত্র ৫. **96 hrs.** পর

১ = 10^{10} cfu/100 ml (injected), ২ = 10^{9} cfu/100 ml (injected), ১ = Heat killed (100°C-এ 1/2 hr. boil) ব্যাকটিরিয়া injected, ৪ = inject করা হয় নি।

ইনজেক্‌শন দেওয়ার ৯৬ ঘন্টা অর্থাৎ ৪ দিন পর দেখা গেল ১ নং মাগুরের দেহ ঘা-এ ভর্তি। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল মাছটি মৃত। বলা বাহুল্য, এটাই Aeromonous bacteria-র চূড়ান্ত প্রভাব। এদিকে ২ নং মাছে ঘা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ৩ নং ও ৪ নং মাগুরে এখনো ঘা পরিলক্ষিত হ'ল না। সুতরাং বলা যেতে পারে ওরা সুস্থ ও সতেজ।

(গ) আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (Discussion and conclusion)

মাগুরমাছের দেহে Aeromonous bacteria inject করার ফলে মাগুরমাছের ঘা হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ যেসমস্ত মাছে inject করা হয় নি এবং যে সমস্ত মাছে মৃত Aeromonous bacteria inject করা হয়েছিল তাদের কেউই ঘায়ে আক্রান্ত হয় নি। তাই উপরোক্ত পরীক্ষার মাধমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয় যে, সুস্থ স্বাভাবিক মাগুর মাছের (*Clarius batrachus*) দেহে Aeromonous bacteria প্রবেশ ক'রলে দেহত্বকে একপ্রকার ঘায়ের সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত ঘা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার অন্তিম পরিণাম মৃত্যু। ব্যাক্‌টেরিয়া-ঘটিত এই রোগ দ্রুত বিস্তার ঘটিয়ে মহামারীর আকার ধারণ ক'রতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. জীবনবিজ্ঞান পরিচয়— চৌধুরী, ভট্টাচার্য সাঁতরা
২. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
৩. Microbiology— Davis et al.

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, স্বল্প পরিসর বৌদ্ধিক বিকাশ নিয়ে আমি আমার সমীক্ষা চালিয়েছি। সমগ্র কাজটি সুষ্ঠ রূপায়ণের জন্য আমি বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগের Immunobiology বিষয়ের অধ্যাপক শিবনাথ মজুমদার মহাশয় ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় জলশোষণের হার

সঞ্চারী মিশ্র (২০০২)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

উদ্ভিদের জীবনচক্রের শুরু বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম দিয়ে। বীজ হ'ল পরিণত ডিম্বাণু যা ফলের মধ্যে থেকে পূর্ণাবস্থা লাভ করে। এই অবস্থায় বীজের মধ্যে ভ্রূণের গঠন সম্পূর্ণ হয়। পাশাপাশি ভ্রূণকে পুষ্টি যোগানোর জন্য খাদ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তৈরি হয়। ওই ভাণ্ডার কোনো-কোনো বীজের ক্ষেত্রে শস্যের মধ্যে থাকে। আবার কোনো ক্ষেত্রে বীজপত্রে গিয়ে জমা হয়। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শস্যের মধ্যে, খাদ্যভাণ্ডার থাকে। অন্যদিকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে বীজপত্রের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত খাদ্যের রাসায়নিক প্রকৃতি বীজ-অনুযায়ী ভিন্ন রকমের হয়। কোনো-কোনো বীজের ক্ষেত্রে শর্করা-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়। আবার কোথাও প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন, ডাল-জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে বীজপত্রে প্রোটীনের পরিমাণ বেশি মাত্রায় থাকে। তেলবীজের ক্ষেত্রে বীজপত্রে স্নেহজাতীয় পদার্থের ভাণ্ডার থাকে। এই খাদ্যসঞ্চয় বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় বেড়ে ওঠা ভ্রূণে পুষ্টি যোগাতে থাকে, যতক্ষণ না এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাবার তৈরি ক'রতে সক্ষম হয়। বীজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল বীজত্বক, যা বীজকে ঘিরে থাকে এবং প্রতিকূল আবহাওয়াতে ভ্রূণ এবং সংলগ্ন কোষসমূহকে রক্ষা করে। সাধারণ বীজত্বক দুটি স্তর নিয়ে গঠিত, যথা অন্তস্ত্বক ও বহিস্ত্বক। অনেকক্ষেত্রেই বীজত্বক এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়, যা জলশোষণে বাধা দেয়। ডাল জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রে বীজত্বক ভীষণ রকমের জলবিরোধী হয়। এইসব ক্ষেত্রে জলশোষণের একমাত্র রাস্তা বীজের গায়ের যে রন্ধ্র অর্থাৎ ডিম্বকরন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল ওই রন্ধ্র ডিম্বক-নাভি সংলগ্ন হয়। অবশ্য এইরকম সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়ে জলপ্রবেশ অত্যন্ত ধীরে ঘটে। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এর সূত্রপাত হয় জলশোষণ দিয়ে। জলশোষণের হার বীজ-অনুযায়ী ভিন্ন হয় নানারকম কারণে। বর্তমান পরীক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের বীজের জলশোষণের হার পরিমাপ করা। এবং বীজের গঠনের সঙ্গে শোষণের হারের সম্পর্ক খুঁজে বের করা।

উপকরণ ও পদ্ধতি

এই পরীক্ষাতে ছয় রকমের বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। বীজগুলি হ'ল যথাক্রমে :

(ক) ধান, (খ) ভুট্টা, (গ) মুগ, (ঘ) ছোলা, (ঙ) সরষে, (চ) বাদাম।

এদের মধ্যে ধান ও ভুট্টাতে সঞ্চিত খাদ্য প্রধানতঃ শর্করা জাতীয় যা শস্যের মধ্যে জমা থাকে। মুগ ও ছোলা ডাল জাতীয় শস্য এবং বীজপত্রে প্রোটীন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয় থাকে। সবশেষে সরষে এবং বাদামের ক্ষেত্রে সঞ্চিত খাদ্য স্নেহজাতীয় (তেল) যা বীজপত্রে জমা থাকে।

প্রত্যেক প্রকার বীজের সংগ্রহ থেকে পাঁচটি ক'রে সুস্থ বীজ বেছে নেওয়া হ'ল। এদের আলাদা ক'রে ওজন নেওয়া হ'ল। এরপর প্রতিটি ক্ষেত্রে বীজগুলিকে পেট্রিডিশে ভেজা ফিল্টার পেপারের ওপর রাখা হ'ল এবং প্রয়োজনমতো জল দেওয়া হ'ল। একঘন্টা অন্তর প্রতিটি পেট্রিডিশ থেকে বীজ তুলে ব্লটিং পেপারে বীজের গায়ের জল শুষে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওজন নেওয়া হ'ল। ওজন নেওয়ার পরমুহূর্তেই আবার পূর্বের অবস্থায় পেট্রিডিশে ভেজা ফিল্টার পেপারের উপর রাখা হ'ল। এইভাবে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ওজন নেওয়া হ'ল।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

প্রতি ঘন্টায় জল শোষণের ফলে ওজন বৃদ্ধির হার বীজ-অনুযায়ী হিসাব ক'রে ছকের আকারে নীচে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক রকম বীজের ক্ষেত্রে ওজন বৃদ্ধির শতকরা হিসাব লেখচিত্রের আকারে প্রকাশ করা হ'ল। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে জল শোষণের শতকরা হার ছোলার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি। মুগের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে ধীরে হ'লেও পরের দিকে ওজন বৃদ্ধির হার প্রায় ছোলার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ভুট্টা এবং ধানের ক্ষেত্রে জলশোষণের হার বেশ কম। সরষে এবং বাদামের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার মাঝামাঝি।

	জলশোষণের সময় (ঘন্টা)					
বীজ	0	1	2	3	4	5
ধান	99.8	104.8	106.0	107.7	109°.0	109.9
ভুট্টা	1524.8	1609.5	1644.6	1671.3	1696.2	1718.1
মুগ	166.5	186.8	206.3	229.1	232.8	271.8
ছোলা	756.0	1070.0	1221.2	1345.8	1403.2	1432.0
সরষে	17.5	19.6	23.2	25.0	25.9	26.6
বাদাম	2317.3	2730.5	3036.3	3337.2	3499.1	3517.7

সারণী ১. ছয় রকম বীজের ক্ষেত্রে জলশোষণের সময় প্রতিঘন্টায় ওজন বৃদ্ধির পরিমাপ
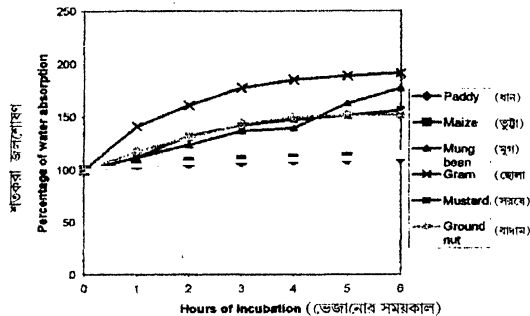
লেখচিত্র ১. বিভিন্ন বীজের জলশোষণের হার
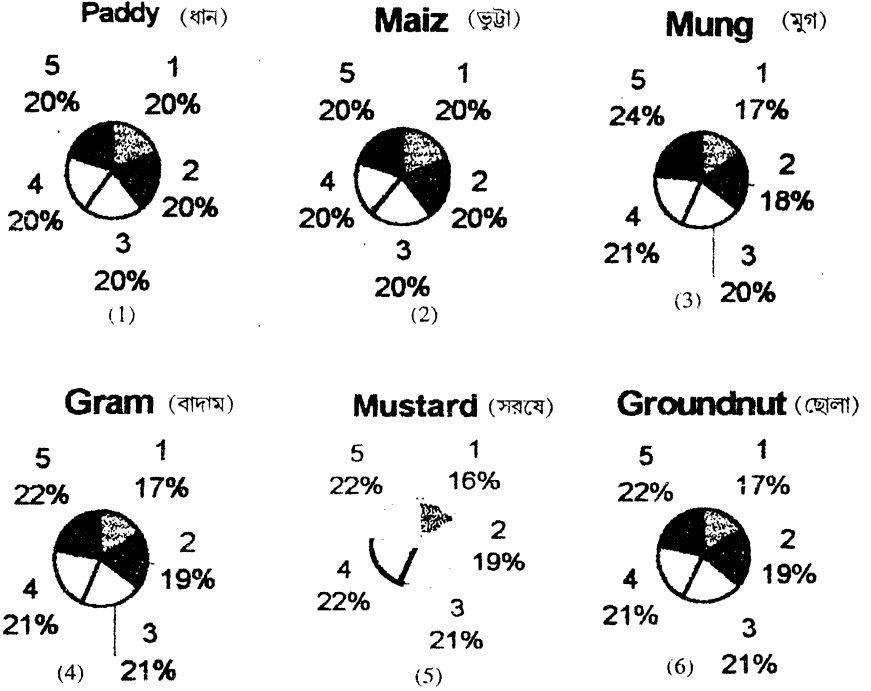
লেখচিত্র ২. 1–6 শতকরা জলশোষণের পরিমাণ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

সাধারণত বীজের জলশোষণের মাত্রা নির্ভর করে সঞ্চিত পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি, পরিমাপ এবং বীজত্বকের জলের প্রতিভেদ্যতার ওপর। বর্তমান পরীক্ষায় ছোলার সঞ্চিত পদার্থ মূলতঃ প্রোটীন ও শর্করাজাতীয়, যা প্রচুর পরিমাণে জলশোষণ ক'রতে পারে। মুগবীজে প্রোটীনের সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি থাকলেও এর বীজত্বকের গাত্রে জলনিরোধক মোমজাতীয় (Waxy) আচ্ছাদন থাকায়, শুধুমাত্র ডিম্বকরন্ধ্র দিয়ে ধীরে-ধীরে জল প্রবেশ করে। তাই প্রথমদিকে জলশোষণের হার কম। পরের দিকে জলপ্রবেশের পথ সুগম হয়ে যাওয়ায় শোষণের হার বৃদ্ধি পায়। সরষে এবং বাদামে সঞ্চিত খাদ্যে প্রধানতঃ স্নেহজাতীয় পদার্থ (তেল) থাকে, যা কিন্তু জলশোষণ করে না। তবে শুষ্ক বীজের কোষের কোষপ্রাচীর ও সাইটোপ্লাজমে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা ও প্রোটীন থাকায় জলশোষণ মোটামুটি হয়। ধান ও ভুট্টার ক্ষেত্রে শর্করা জাতীয় খাদ্যের সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও জলশোষণের হার আশ্চর্যজনক ভাবে কম। এর কারণ হিসাবে বলা যায় এই দুইরকম বীজের ক্ষেত্রে বীজত্বক সম্ভবতঃ ভীষণভাবে জলনিরোধী, ফলে শোষণের হার বেশ কম।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

বর্তমান প্রকল্পটি (বিভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় জল শোষণের হার) অনেক ব্যক্তির সহায়তায় সম্পাদিত হয়েছে। আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রূপকুমার কর মহাশয়কে যাঁর উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও ল্যাবরেটরীর ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে প্রকল্পটি সার্থকভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া ল্যাবরেটরীর সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষক অরিজিৎ সিন্‌হাবাবুকে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি বাড়ির গুরুজনদের। যাঁদের অকৃপণ ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ ছাড়া প্রকল্পটি সম্ভব হ'ত না। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রতে হয় আমার স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের এবং আমাদের সহপাঠীদের প্রতি, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাকে এই প্রকল্পটি রূপায়ণে সাহায্য ক'রেছেন।

বরবটিকাণ্ডের ছেদিত অংশের গোড়া থেকে অস্থানিক মূল গঠনে অক্‌সিনের ভূমিকা

শুভাপ্রসন্ন দত্ত (২০০২)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা (Introduction)

একটি কাণ্ডের ছেদিত অংশ থেকে উপযুক্ত অস্থানিক মূল তৈরি হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনগত প্রক্রিয়া যা ছেদিত কাণ্ডটির বা উদ্ভিদটির বেঁচে থাকার ও বৃদ্ধির সহায়ক। কাণ্ডের ছেদিত অঞ্চল থেকে নতুন অস্থানিক মূল তৈরি হওয়া একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা, যেখানে প্রচুর-সংখ্যক কোষ বিভাজিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ মূল গঠন করে। এই প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদমধ্যস্থ বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তিয় আন্তঃ উপাদান (Endogenous Factor) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইসকল আন্তঃ-উপাদানগুলির মধ্যে অক্‌সিন (Auxin) হ'ল মূল তৈরির জন্য প্রাথমিক উপাদান (Prime Trigger)।

উপকরণ ও পদ্ধতি (Tools & Materials)

বরবটি (Cow Pea) গাছের *Vigna Catjang* বীজ, বালি (Sand), প্লাস্টিকের ট্রে (Tray), বীকার (Beaker), টিউব লাইট (Tube Light), পাতিত জল (Distilled Water), টেবিল (Table), থার্মোমিটার (Thermometer), ব্লেড (Blade), পিপেট (Pipette), মাপন চোঙ (Measuring Cylinder), নোটবুক এবং পেনসিল (Note Book & Pencil), মার্কার পেন (Marker Pen), স্কেল (Scale), চিমটে (Forceps), ইথানল (Absolute Alcohol), ইন্ডোল বিউটাইরিক অ্যাসিড (IBA) Molecular Weight- 203.24, এবং ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (NAA) Molecular Weight-186.2।

NAA (Naptholioc Acitic Acid) এবং IBA (Indol Butiric Acid)-এর বিভিন্ন ঘনত্বে তৈরির পদ্ধতি

NAA-এর Molecular Weight 186.2 অর্থাৎ 1000 বা 10^3 ml. পাতিত জলে 186.2 mg. বিশুদ্ধ NAA-এর মিশ্রণই হ'ল NAA-এর 10^{-10} M ঘনত্ব। এইভাবে 100 mg. জলে 10 mg. NAA-এর 10^{-3} M ঘনত্বের দ্রবণ মিশিয়ে NAA 10^{-4} M দ্রবণ তৈরি হ'ল। এইভাবে 10^{-5} M, 10^{-6} M এবং 10^{-7} M প্রভৃতি বিভিন্ন ঘনত্বের NAA ও IBA-এর দ্রবণ তৈরি করা হ'ল।

WATER	+	IBA	=	IBA 10^{-3} M
(1000 ml)		(203.2 mg)		
WATER	+	IBA 10^{-3} M	=	IBA 10^{-4} M
(90 ml)		(10 ml)		
WATER	+	IBA 10^{-4} M	=	IBA 10^{-5} M
(90 ml)		(10 ml)		
WATER	+	IBA 10^{-5} M	=	IBA 10^{-6} M
(90 ml)		(10 ml)		
WATER	+	IBA 10^{-6} M	=	IBA 10^{-7} M
(90 ml)		(10 ml)		

তালিকা ১

WATER	+	NAA	=	IBA 10^{-3} M
(1000 ml)		(186.2 mg)		
WATER	+	NAA 10^{-3} M	=	NAA 10^{-4} M
(90 ml)		(10 ml)		
WATER	+	NAA 10^{-4} M	=	NAA 10^{-5} M
(90 ml)		(10 ml)		
WATER	+	NAA 10^{-5} M	=	NAA 10^{-6} M
(90 ml)		(10 ml)		
WATER	+	NAA 10^{-6} M	=	NAA 10^{7} M
(90 ml)		(10 ml)		

তালিকা ২

চিত্র ১.
বালিতে চারা তৈরির পর
৩ সেমি. ক'রে কাটা হ'ল।

বরবটি বীজগুলিকে ভালোভাবে সাধারণ জলে ও পরে পাতিত জলে ধুয়ে নেওয়া হ'ল। এই ধৌত বীজগুলিকে বালিভর্তি বড় প্লাস্টিকের ট্রেতে ছড়িয়ে দেওয়া হ'তে থাকল। বীজ থেকে গাছের চারার জন্ম হ'ল এবং গাছগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকল। ছয়দিন পর গাছগুলিকে বালি থেকে তুলে নিয়ে বীজপত্র থেকে মূলের দিকে (hypocotyls) তিন সেমি. ক'রে ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলা হ'ল (চিত্র ১)। শুকনো বীজপত্রগুলিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এরপর ছেদিত চারাগাছগুলিকে (যাদের hypocotyls এবং একজোড়া প্রাথমিক পত্র বা প্রাইমারি লিফ্-যুক্ত epicotyls বর্তমান) বর্তমান পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হ'ল।
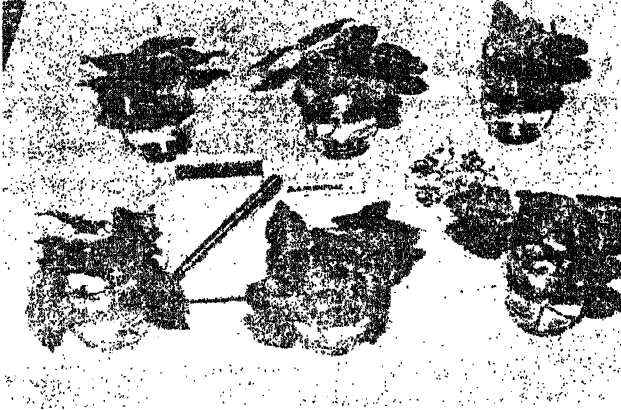
চিত্র ২. **IBA**-এর বিভিন্ন ঘনত্বের রাখা ছেদিত চারা
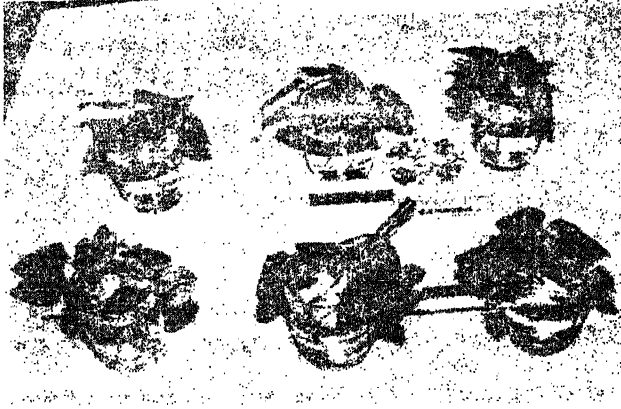
চিত্র ৩. **NAA**-এর বিভিন্ন ঘনত্বের রাখা ছেদিত চারা

এই সতেজ ছেদিত শাখাগুলিকে কাঁচের বীকারে 100 মিলিলিটার পাতিত জল (distilled water) এবং পরীক্ষামূলক দ্রবণের মিশ্রণে অর্থাৎ ইন্ডোল-বিউটাইরিক অ্যাসিড (IBA) এবং ন্যাপথালিন-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (NAA) এ হাইপোকোটিল অঞ্চলটিকে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতিটি বীকারে পাঁচটি ক'রে ছেদিত চারাগাছ ডোবানো হ'ল (চিত্র ২ ও ৩)। এই বীকারগুলিকে টিউবলাইটের নীচে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হ'ল। এইভাবে প্রতিদিন 16 ঘন্টা আলো ও 8 ঘন্টা অন্ধকার ক'রে দেওয়া হ'ল এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা লক্ষ্য করা হ'ল যা (24°) থেকে (26°) এর মধ্যে পরিবর্তিত হ'ল। এইভাবে 12দিন পর যে মূল তৈরি হ'ল সেগুলি ফরসেপের সাহায্যে ছাড়িয়ে স্কেলের সাহায্যে তার দৈর্ঘ্য মাপা ও সংখ্যা গোনা হ'ল।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল (Observation and Results)

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণের পর বোঝা যাচ্ছে যে, বরবটির ছেদিত অঞ্চল থেকে NAA এবং IBA উভয়েরই মোট মূলসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, (control) বা পাতিত জলের থেকে। যদিও IBA এর উপকারিতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি দেখা গেল NAA এর থেকে। তালিকা ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে NAA দ্রবণের বিভিন্ন ঘনত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে 10^{-3} M, 10^{-4} M ও 10^{-5} M এ রাখা গাছগুলির মূল কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু 10^{-6} M ও 10^{-7} M দ্রবণে রাখা গাছগুলির মোট অস্থানিক প্রাথমিক মূল সংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ। এই অবস্থায় কোনো গৌণ অস্থানিক মূল (secondary adventitious roots) তৈরি হ'তে পারে নি। অন্যদিকে প্রাথমিক মূলের দৈর্ঘ্যের খুব একটা বৃদ্ধিও ঘটেনি। কিন্তু মোট মূলের দৈর্ঘ্য control এর থেকে বেড়েছে। 10^{-3} M ও 10^{-4} M NAA-এর দ্রবণে গাছগুলি প্রথম থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ NAA এর ঘনত্ব এই দুটিতে বেশি হওয়ায় গাছগুলির উপর বিষক্রিয়ার (toxic effect) সৃষ্টি ক'রেছে।

NAA	গড় প্রাথমিক অস্থানিক-মূলের সংখ্যা	গড় গৌণ অস্থানিক-মূলের সংখ্যা	প্রাথমিক অস্থানিক-মূলের মোট দৈর্ঘ্যের গড় (cm)
10^{-3} M	...	...	...
10^{-4} M	...	...	...
10^{-5} M	...	...	...
10^{-6} M	40.4	...	43.9
10^{-7} M	42.2	...	49.6
Control	10.8	19.4	15.5

তালিকা ৩. বিভিন্ন NAA দ্রবণের মাত্রায় উৎপন্ন মূলের গড় সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

অপরদিকে 10^{-5} M NAA এর দ্রবণে গাছগুলির প্রথমাবস্থায় বীজপত্রের নিম্নঅঞ্চল অর্থাৎ hypocotyle অংশটি থেকে খুব ঘন অসংখ্য ছোট-ছোট প্রাথমিক অস্থানিক মূল বের হওয়ায় hypocotyleটি ফেটে যায়। ফলে মূলগুলির বৃদ্ধি না ঘটায় গাছগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং

10^{-5} M NAA দ্রবণটিও গাছের পক্ষে অনুপযুক্ত বা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রেছে। 10^{-6} M (40.4) ও 10^{-7} M (42.2) NAA দ্রবণে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোট মূলের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে, যদিও প্রত্যেকটিতে দৈর্ঘ্যের সেরকম বৃদ্ধি ঘটেনি। অর্থাৎ এর থেকে মন্তব্য করা যেতে পারে যে NAA 10^{-6} M ও 10^{-7} M দ্রবণদুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বেশি সংখ্যক অস্থানিক মূল উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু মূলগুলির দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। অর্থাৎ NAA বরবটি গাছের hypocotyle এর ছেদিত অংশে নতুন কোষ তৈরি ক'রে প্রাথমিক মূল গঠন করে ঠিকই কিন্তু মূলগুলির কোষবিভাজন ঘটাতে সাহায্য না করায়, মূলগুলির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

IBA	গড় প্রাথমিক অস্থানিক-মূলের সংখ্যা	গড় গৌণ অস্থানিক-মূলের সংখ্যা	প্রাথমিক অস্থানিক-মূলের মোট দৈর্ঘ্যের গড় (cm)
10^{-3} M	...	...	...
10^{-4} M	50.4	...	50.4
10^{-5} M	36.2	...	35.2
10^{-6} M	16.2	91.2	48.1
10^{-7} M	12.2	50.8	36.8
Control	10.8	19.4	15.5

তালিকা ৪. বিভিন্ন মাত্রার IBA দ্রবণে উৎপন্ন মূলের গড় সংখ্যা ও দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

তালিকা-৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে 10^{-3} M IBA দ্রবণে গাছগুলি নষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ অনুপযুক্ত ঘনত্বের দ্রবণটি (10^{-3} M) গাছের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি ক'রছে। অন্যদিকে মোট প্রাথমিক মূল সংখ্যা গঠনে 10^{-4} M (50.4), 10^{-5} M (36.2), 10^{-6} M (16.2) এবং 10^{-7} M (12.2) ঘনত্বের দ্রবণগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সহায়তা ক'রছে বিশেষভাবে 10^{-4} M (50.4) IBA দ্রবণটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ক'রছে। অস্থানিক গৌণমূল (secondary adventitious roots) গঠনের ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে যে IBA 10^{-3} M (91.2) ও NAA 10^{-7} M (50.8) দ্রবণদুটির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

অস্থানিক মূলের মোট দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 10^{-4} M (50.4), 10^{-5} M (35.2), 10^{-6} M (48.1) এবং 10^{-7} M (36.8) ঘনত্বের দ্রবণগুলি প্রত্যেকেই control-এর তুলনায় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

অতএব উপরোক্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার যে অক্সিন দুটির মধ্যে অস্থানিক মূল গঠনে NAA এর থেকে IBA হচ্ছে বেশি উপকারী।
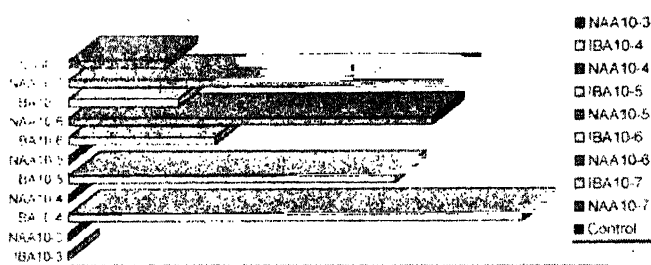
লেখচিত্র ১. প্রাথমিক অবস্থানিক মূলের গড় সংখ্যা
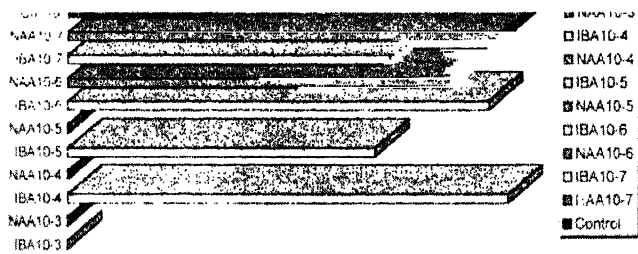
লেখচিত্র ২. প্রাথমিক অবস্থানিক মূলের গড় দৈর্ঘ্য (cm)
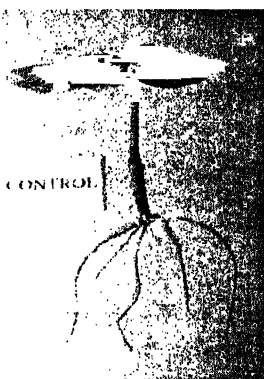
চিত্র ৪. বিভিন্ন মাত্রায় এবং প্রয়োগে হাইপোকটাইলের ছেদিত অংশের মূলের বৃদ্ধি (ক⟶ছ)।
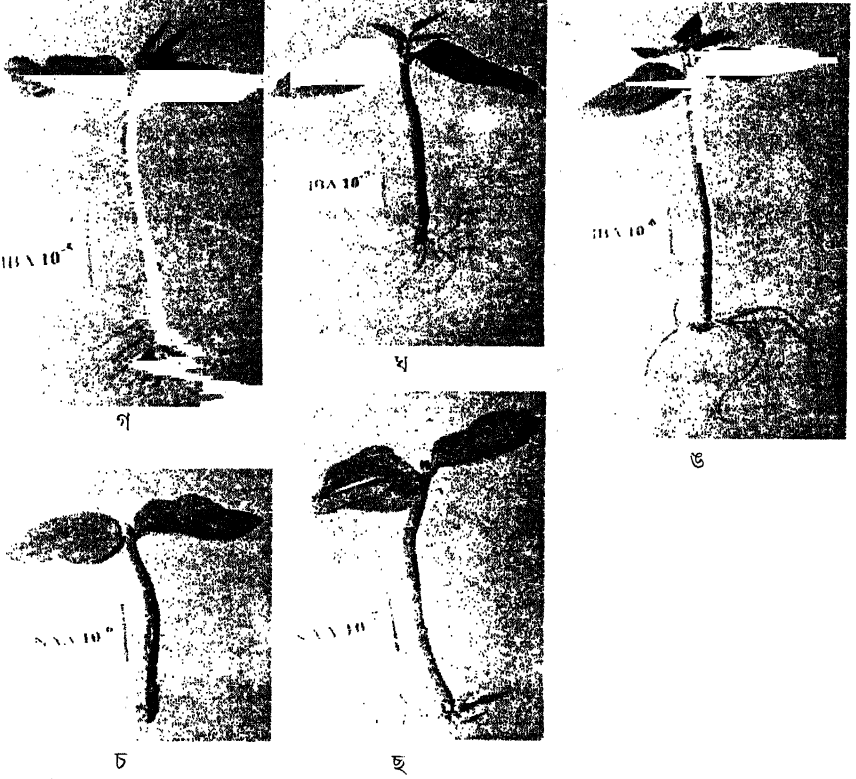
চিত্র ৪. বিভিন্ন মাত্রায় এবং প্রয়োগে হাইপোকটাইলের ছেদিত অংশের মূলের বৃদ্ধি (ক—>ছ)।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (Discussion and Conclusion)

উপরোক্ত পরীক্ষার থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছি যে NAA (Napthoilic Acitic Acid) এর চেয়ে IBA (Indol Butiric Acid) এ মূল ভালো। IBA এর দ্রবণগুলির মধ্যে আবার 10^{6} ঘনত্বে সবথেকে ভালো মূল গজিয়েছে, তাই মূল গঠনে IBA-র 10^{-6} ঘনত্ব বিশিষ্ট দ্রবণের কার্যকারিতা সর্বাধিক।

যদিও NAA গাছের অসংখ্য মূল সৃষ্টিতে সাহায্য ক'রেছে। তাহ'লেও মূলের দৈর্ঘ্য সেরকম বাড়াতে পারছে না। সেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে IBA মূলের দৈর্ঘ্য বাড়াতে বেশি সক্ষম। অতএব আমার ধারণা, হয়ত NAA-র 10^{-7} ঘনত্ব বিশিষ্ট দ্রবণের সঙ্গে IBA-র 10^{-6} দ্রবণের মিশ্রণ ঘটালে (যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া না হয়) গাছের ছেদিতাংশ থেকে অসংখ্য উপযুক্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মূল বের হ'তে পারে।

সুতরাং উপস্থিত পরীক্ষার সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী যদি আমরা এই Hormone গুলিকে ব্যবহারিক জীবনে দাবা কলম, শাখা কলম, গুটি কলম প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যবহার ক'রতে পারে তাহ'লে

চারা তৈরির ক্ষেত্রে আরও ভালো ফল আশা ক'রতে পারি।

তথ্য সংগ্রহ (Information Source)

এই Project-এর কাজে আমি আমাদের পাঠ্যবই চৌধুরী, ভট্টাচার্য, সাঁতরা-এর "জীবনবিজ্ঞান পরিচয়" (IX - X) এবং অধ্যাপক চক্রবর্তী ও চক্রবর্তী-এর সহযোগিতায় ডি. সাঁতরা-এর উচ্চ-মাধ্যমিক জীববিদ্যা বই-এর থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। এছাড়াও yahoo.com এই Websiteটির Biological Group-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার (Acknowledgements)

এই Project-এর কাজে বিদ্যালয় ছাড়াও আমার দিদি ও জামাইবাবু আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন প্রজাতির লেবু ফলের তুলনামূলক pH এর মাত্রা

কোহিনূর খাতুন (২০০২)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

লেবু-জাতীয় ফল (Citurs group of fruits) সাধারণত স্বাদে টক হয়। কিছু-কিছু লেবু অবশ্য স্বাদে মিষ্টি হয়। যেমন-মুসাম্বী (Sweet orange), কমলালেবু (Mandarine), আবার কোনো-কোনো লেবু পাকলেও স্বাদে টক থেকে যায়, যেমন- পাতিলেবু (Lime), গন্ধরাজ লেবু (Lemon)

লেবু টক হওয়ার কারণ হ'ল এর মধ্যে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের উপস্থিতি যেমন- সাইট্রিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড, অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড (Vitamin) ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রধানত সাইট্রিকঅ্যাসিড অধিক পরিমাণে থাকে। বর্তমানে উপস্থিত প্রোজেক্টির উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন লেবুর অম্লমাত্রা (Acidity) নির্ণয় করা।

কোনো দ্রবণের Log $[H^+]$ বা $[H^+] = 10^{-pH}$ এখানে $[H^+]$ হ'ল H^+ আয়নের মোলার গাঢ়ত্ব। এই গাঢ়ত্বকে মোল বা গ্রাম আয়ন / লিটার একককে প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন দ্রবণে pH-এর মান '0' থেকে '14' পর্যন্ত হ'তে পারে। দ্রবণের pH জানা থাকলে দ্রবণটি প্রশম, আম্লিক না ক্ষারীও তা জানা যায়। 0 থেকে 6.9 পর্যন্ত pH-এর মান হ'লে তাকে আম্লিক এবং 7.1 থেকে 14 পর্যন্ত pH-এর মানকে ক্ষারীও বলে। pH 7 কে প্রশম (Neutral) বলা হয়। পাতিত জলের pH 7 হয়।

উপকরণ ও পদ্ধতি

1) পাঁচ ধরনের লেবু — (a) পাতিলেবু (Lime) (b) গন্ধরাজলেবু (Lemon), (c) বাতাবীলেবু (Pomolo), (d) কমলালেবু (Mandarine), (e) মুসাম্বী (Sweet Orange), এবং 2) পেট্রিডিশ (পাঁচটি), 3) pH পেপার, 4) চিমটে (Forceps), 5) ছুরি (Knife).

প্রত্যেকটি লেবুকে ছুরির সাহায্যে কাটা হ'ল এবং প্রত্যেকটি লেবুর নির্যাস নিষ্কাশন ক'রে আলাদা-আলাদা পেট্রিডিস সংগ্রহ করা হ'ল। এবার pH পেপারটিকে চিমটের সাহায্যে ধরে সংগৃহীত নির্যাসের মধ্যে ডুবিয়েই তুলে নেওয়া হ'ল। এইরূপ পাঁচটি লেবুর নির্যাসে আলাদাভাবে pH পেপার ডুবিয়ে তুলে নেওয়া হ'ল। pH পেপার লেবুর নির্যাসে ডোবানোর ফলে পেপারের pH রঙের যে পরিবর্তন হ'ল তা pH পেপারের বর্ণতালিকার (colour chart) সঙ্গে তুলনা করা হ'ল। প্রদত্ত তালিকা এবং পরীক্ষালব্ধ pH কাগজের পরিবর্তিত রঙ এক হয়ে মিলে যাওয়া (colour match মাত্রাগুলি লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি ক'রে যে গড় পরিমাণ pH লেবু বিশেষে পাওয়া গেল তা নিম্নরূপ। প্রদত্ত তালিকা থেকে একটি লেখচিত্র প্রস্তুত করা হ'ল যাতে একনজরে বিভিন্ন লেবুর pH এর তুলনামূলক দিকটি পরিলক্ষিত হয়।

pH— লেবু, 2.8 পাতিলেবু, 2.8 গন্ধরাজলেবু, 3.1 বাতাবীলেবু, 3.4 কমলালেবু, 3.4 মুসাম্বী
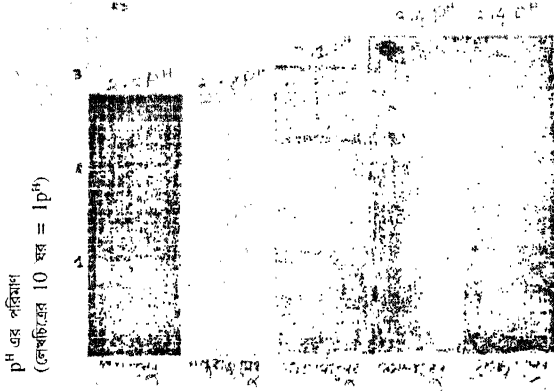
বিভিন্ন লেবুর pH এর প্রকারভেদ

সিদ্ধান্ত ও আলোচনা

উপরের ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পরীক্ষণীয় পাঁচটি লেবুর মধ্যে গন্ধরাজলেবু ও পাতিলেবু তুলনায় স্বাদে বেশী টক এবং কমলালেবু ও মুসাম্বীলেবু স্বাদে তুলনামূলকভাবে বেশি মিষ্টি। বাতাবীলেবুর অম্লমাত্রা গন্ধরাজলেবুর থেকে কম, কিন্তু কমলালেবু ও মুসাম্বীলেবুর তুলনায় অম্লমাত্রা বেশি। অতএব যেসব লেবুর pH এর মান কম তাদের অম্লমাত্রা বেশি যেমন পাতিলেবু ও গন্ধরাজলেবু। এবং যেসব লেবুর pH এর মান বেশি তাদের অম্লমাত্রা কম যেমন কমলালেবু। পরিশেষে বলা যায় লেবুর এই অম্লত্বের পার্থক্যযুক্ত পরীক্ষালব্ধ ফলাফল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পছন্দমত লেবু ক্রয়ে সাহায্য ক'রবে সেই সঙ্গে রোগীর পথ্যে লেবু নির্বাচনে সাহায্য ক'রবে।

সাবধানতা

i) একটি লেবু ছুরির সাহায্যে কাটার পর ছুরিটিকে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে, তারপর অপর লেবুটি কাটা উচিত।

ii) p^H paperটি হাতে ক'রে না ধ'রে চিমটে দিয়ে ধরা উচিত।

iii) ফু-দিয়ে p^H paper শোকানো উচিত নয়, এতে প্রাপ্ত রঙ পাল্টে যেতে পারে।

iv) পর্যাপ্ত আলোতে পরীক্ষাটি করা উচিত, না হলে Colour shedগুলির সাহায্যে তুলনা ক'রতে অসুবিধা হবে।

তথ্য সংগ্রহ

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন— ভট্টাচার্য, মাইতি, গাঙ্গুলি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রকল্পটি (Project) সুসম্পন্ন করার জন্য আমি শিক্ষাসত্রের বিজ্ঞানের শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কেঁচোসার প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে স্প্রিংটেলের উপস্থিতির হার

শঙ্খমিত্র রায়, দেবব্রত দাস, মধুমিতা রায় (২০০২)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

কৃষিনির্ভর দেশ ভারতবর্ষ। এখানে শতকরা ৬০ জন মানুষ চাষাবাদ করে। সুতরাং ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার এক বড় অংশ হ'ল কৃষক শ্রেণী। কৃষির সঙ্গে অপর আর যে-দুটি কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হ'ল মাটি ও সার। এই মাটি ও সারের উপর নির্ভর করে যে-কোনও দেশের ফসল, শস্য তথা অর্থনীতি। পূর্বে যে সার ভারতে ব্যবহৃত হ'ত তা গোবর সার, পাতা পচা বা ঐজাতীয় কিছু সার। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেশের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই বর্তমানে উন্নতমানের রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জমির কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্য জৈব সারের প্রয়োগ পুনরায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে . । মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে মাটিতে বসবাসকারী কিছু সহায়ক জীব কৃষকের বন্ধু ব'লে পরিচিত। কেঁচোর নাম আমাদের সকলের জানা। আরও কিছু আণুবীক্ষণিক জীব যারা একই কাজ করে, অথচ আমরা তাদের খোঁজও রাখি না। 'স্প্রিংটেল' হ'ল এরকমই কৃষকের বন্ধু যারা পতঙ্গশ্রেণীর এক আণুবীক্ষণিক জীব। ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতেই এরা থাকতে বেশি পছন্দ করে।

বর্তমান যুগে রাসায়নিক সারের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন রকমের কীটনাশক ঔষধের প্রয়োগ খুব বেড়ে গেছে। কিন্তু অতিরিক্ত রাসায়নিক সার দীর্ঘদিন প্রয়োগে মাটি অ্যাসিডিক হয়ে পড়ে এবং কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারে মাটিতে বসবাসকারী প্রাণী যারা মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে তোলে, যেমন, কেঁচো, স্প্রিংটেল, ডাইপ্লিউরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবেরা মারা যায়। ফলস্বরূপ মাটির উর্বরতা ও জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। সুতরাং রাসায়নিক সারের এইসমস্ত ক্ষতিকারক দিকগুলি এড়িয়ে চলার জন্য জৈব সার, যেমন— গোবর সার, প্রাণীদের মলমূত্র থেকে উৎপাদিত সার, কেঁচোর দ্বারা উৎপাদিত সার (Vermicompost) ইত্যাদিই শ্রেয়।

তাই বর্তমান প্রজেক্টে আমি Vermicompost-কে বেছে নিয়ে ওই জৈবসারে বসবাসকারী স্প্রিংটেলের (কোলেম্বোলার) উপস্থিতি পর্যালোচনা ক'রতে চেয়েছি।

আমাদের বাড়ির দৈনন্দিন ফেলে-দেওয়া জৈব পদার্থ অর্থাৎ তরকারির খোসা, চা-পাতা ডিমের খোসা, খড়, গোবর ইত্যাদি বর্জ্যপদার্থের সঙ্গে (i) *Eisenia foetide*, (ii) *Lumbricus rubellus*, (iii) *Eudrillus eugniae* প্রভৃতি যে-কোনো একপ্রকার কেঁচো ছেড়ে দিলে এবং 10-30°C উষ্ণতায় স্যাঁতসেঁতে ছায়া জায়গায় রেখে দিলে খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ প্রায় 40 দিনের মধ্যে বর্জ্য পদার্থগুলি জৈবসারে পরিণত হবে।

Vermicompost উৎপাদনে কেঁচোর ভূমিকা সর্বাধিক তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই Vermicompost উৎপাদনে কেঁচো ছাড়াও আরও বেশ কিছু উপকারী প্রাণী আছে যারা মাটিতে

উপস্থিত থেকে স্বাভাবিক উর্বরতা ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এদের মধ্যে স্প্রিংটেলের (কোলেম্বোলা) নাম অন্যতম। এছাড়া কোলেম্বোলা মাটির উর্বরতাসূচক-রূপেও জ্ঞাত। অর্থাৎ মাটিতে উপস্থিত কোলেম্বোলার সংখ্যা এবং বিভিন্নতার উপর নির্ভর ক'রে মাটির উর্বরতা, অনুর্বরতা এবং অ্যাসিডিক বা ক্ষারকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারা যায়।

তাই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ যেমন *Bucher et al* (1972), *Lebrun* (1979) কোলেম্বোলাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রেছেন এবং বর্তমানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও কোলেম্বোলাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা চ'লছে।

উপকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি

(i) পার্শ্বছিদ্র-বিশিষ্ট ১০ ইঞ্চি মাপের দুটি টব। (ii) ২ কেজি ছোট মাপের কাটা খড়। (iii) ২ কেজি পুরোনো গোবর। (iv) জুটের বস্তা। (v) পরিমাণ মত জল। (vi) 25টা কেঁচো। (vii) 15w (ওয়াট্)-এর দুটি বৈদ্যুতিক বাতি। (viii) 4টি 6 ইঞ্চি মাপের ফানেল। (x) 4টি তারজালি। (x) 20টি ছোট কৌটো। (xi) 1 লিটার 80% অ্যালকোহল। (xii) স্লাইড। (xiii) কভার গ্লাস। (xiv) পেট্রিডিশ। (xv) নিডল্। (xvi) Dessecting Binoculer Microscope এবং (xvii) ল্যাকটোফেনল।

(A) Vermicompost তৈরি : দুটি বড় মাপের টবে সমপরিমাণ খড় ও গোবরের মিশ্রণ (1 কেজি খড় ও 1 কেজি গোবর) ভর্তি ক'রে রাখা হ'ল (চিত্র ১)। তারপর উপরে কিছু পরিমাণ গোবর জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। উক্ত টব দুটির উপর ভেজা বস্তা চাপিয়ে 10 দিনের জন্য স্যাঁতসেঁতে, ছায়া জায়গাতে রাখা হ'ল। সার পচনের জন্য ঐ টবগুলিতে মাঝেমাঝে জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। 10 দিন পর একটি টবে 25টি কেঁচো (Red worm) ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অন্যটি কেঁচোবিহীন অবস্থায় রাখা হ'ল। 40 দিন পর উভয় টবের মাটি পরীক্ষা করা হ'ল।

চিত্র ১. কেঁচো সার **Vermicompost** তৈরি।

(B) মাটি পরীক্ষা : Tullgren Funnel-এর উপরের দিকে দুটি বাল্বের ব্যবস্থা করা হ'ল। ফানেল 4টির প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে তারজালি দিয়ে তার উপর বর্তমান পরীক্ষায় প্রস্তুত দুটি ফানেলে কেঁচোযুক্ত জৈবসার ও দুটিতে কেঁচোবিহীন জৈবসার সমপরিমাণ (200 gm ক'রে) দেওয়া হ'ল। উভয়প্রকার মাটি ফানেলের উপর দেওয়ার পর প্রত্যেকটি ফানেলের নীচে 1টি ক'রে ছোটো কৌটো রেখে প্রত্যেকটিতে সামান্য পরিমাণ ক'রে অ্যালকোহল ঢেলে দিয়ে 10 দিন অপেক্ষা করা হ'ল।

চিত্র ২. Tullgren Funnel এ মাটি পরীক্ষা

মাটিতে অবস্থিত প্রাণী তার স্বভাবজনিত কারণে আলো এবং তাপ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে চায়। Tullgren Funnel-এর বালিতে রাখা মাটির উপরের বাল্ব থেকে যে আলো এবং সামান্য পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় তা সারে অবস্থিত প্রাণী সহ্য ক'রতে পারে না। ফলে তারা ফানেলের পার্শ্বদেশ অবলম্বন ক'রে নীচের দিকে ক্রমশ নামতে থাকে। অবশেষে অ্যালকোহল ও ফানেলের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে কোনো অবলম্বন না পেয়ে এবং নীচের কৌটোতে অবস্থিত অ্যালকোহলে প'ড়ে মারা যায়। আর এই অ্যালকোহলে সঞ্চিত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত প্রাণীগুলি পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। এইভাবে 0, 10, 20, 30 ও 40 তম দিনগুলিতে কেঁচোযুক্ত জৈবসার এবং কেঁচোবিহীন জৈবসার থেকে Tullgren Funnel-এর সাহায্যে সারে অবস্থিত প্রাণীদের অ্যালকোহলে সংগ্রহ করা হ'ল।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

সংগৃহীত প্রাণীগুলিকে Dissecting Binoculer Microscope দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা গেল কৌটোগুলিতে সর্বাধিকসংখ্যক স্প্রিংটেল (কোলেম্বোলা) ছাড়াও বেশ কিছু ডাইপ্লিউরা, প্রোটিউরা, মাইট এবং পিঁপড়ে অন্যান্য কীটপতঙ্গও আছে।

এরপর কোলেম্বোলাগুলিকে DB Microscope এর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ক'রে বেছে-বেছে আলাদাভাবে মাউন্ট হ'ল। মাউন্ট-করা কোলেম্বোলাগুলিকে Gisin এবং Hopkins-এর Key অবলম্বন ক'রে Family Level পর্যন্ত চিহ্নিত ক'রে দেখা গেল যে বেশ কিছু Isotomidae, Hypogastruridae এবং অল্পসংখ্যক Entomobryidae জাতীয় কোলেম্বোলা রয়েছে।

নাম	0 দিন	10 দিন	20 দিন	30 দিন	40 দিন
Entomobriydae	1	0	2	2	6
Isotomidae	218	291	373	394	487
Hypogastruridae	173	253	289	302	218

তালিকা ১ :. কেঁচোবিহীন জৈবসারে অবস্থিত কোলেম্বোলার সংখ্যা
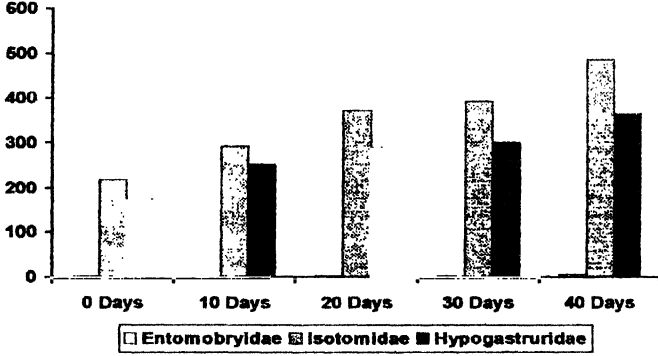
তালিকা ১ :. কেঁচোবিহীন জৈবসারে অবস্থিত কোলেম্বোলার উপস্থিতি

নাম	0 দিন	10 দিন	20 দিন	30 দিন	40 দিন
Entomobriydae	3	3	1	5	7
Isotomidae	231	353	432	541	693
Hypogastruridae	173	253	289	302	218

তালিকা ২ :. কেঁচোযুক্ত জৈবসারে অবস্থিত কোলেম্বোলার সংখ্যা
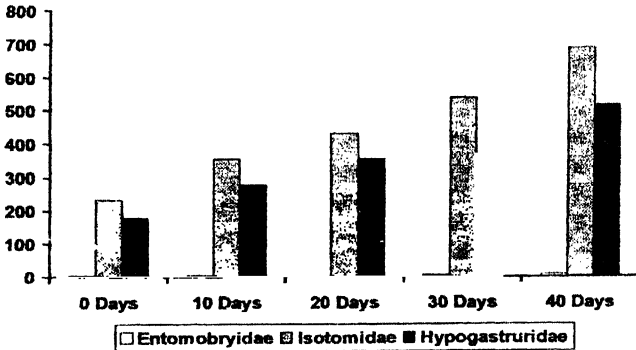
তালিকা ২ :. কেঁচোযুক্ত জৈবসারে অবস্থিত কোলেম্বোলার উপস্থিতি

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উপরের পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোলেম্বোলা কেঁচোযুক্ত মাটিতে বসবাস ক'রতে বেশি পছন্দ ক'রে। সেজন্যই কেঁচোযুক্ত মাটিতে কোলেম্বোলার সংখ্যা, কেঁচোবিহীন মাটির থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি। অতএব এদের পারস্পরিক অবস্থান খুবই সম্পর্কযুক্ত। এই পরীক্ষা থেকে এটাও জানা যায় যে, কেঁচোযুক্ত বা কেঁচোবিহীন গোবরযুক্ত মাটিতে Isotomoidae-এর সংখ্যা সর্বাধিক। তাছাড়া কেঁচোযুক্ত ও কেঁচোবিহীন উভয়প্রকার জৈব সারের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে কোলেম্বোলার সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

সাবধানতা

(i) অ্যালকোহল অবশ্যই 70-80% এর মধ্যে হ'তে হবে। কারণ এই অ্যালকোহলে কোলেম্বোলা পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। (ii) কৌটোতে মাঝেমাঝে অ্যালকোহল ঢেলে দিতে হবে। কারণ অ্যালকোহল খুব দ্রুত উবে যায়। (iii) প্রথম দিন কেবলমাত্র একটি বাল্ব জ্বালাতে হবে, না হ'লে হঠাৎ ক'রে বেশি আলো ও তাপে Socke পেয়ে মাটির মধ্যে স্প্রিংটেল মারা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে নীচে রাখা অ্যালকোহলে নামার প্রশ্নই থাকবে না। (iv) অবশ্যই প্রতিটি কৌটো চিহ্নিত ক'রতে হবে। (v) কৌটোতে অ্যালকোহল ঢালার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে অ্যালকোহল ফানেলে স্পর্শ না ক'রে। (vi) সার প্রস্তুত করার সময় কাঁচা গোবর দেওয়া যাবে না। কারণ কাঁচা গোবর কেঁচো ও স্প্রিংটেলের বসবাসের ক্ষেত্রে খুবই অনুপযুক্ত। (vii) টবের নীচে যেন জল জমে না থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

(i) জীবন বিজ্ঞান পরিচয় - মিত্র, চৌধুরী, সাঁতরা,
(ii) A Key to the Springtails of Britain and Ireland (Steven Hopkin),
(iii) Collembolen Fauna Europas (Harmann Gisin)

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

Vermicompost-এর বিভিন্ন পর্যায়ে স্প্রিংটেলের (কোলেম্বোলা) উপস্থিতি পর্যবেক্ষণে প্রজেক্টটি সম্পন্ন ক'রতে যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রজেক্টটির সাফল্যের পিছনে পল্লী-শিক্ষাভবনের শ্রদ্ধেয় গুণীনদার নাম সবাগ্রে। এছাড়াও আমাদের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ, প্রজেক্টটি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সম্পন্ন ক'রতে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন।

জলজ বাস্তুতন্ত্র

আবিদ হোসেন মোল্লা (২০০১)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

পৃথিবীতে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বসবাস করে। জীব এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে বিশেষ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া সবসময়ই দেখা যায়। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীব ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক আলোচিত হয় তাকে বাস্তুবিদ্যা বা ইকোলজি বলে।

বাস্তুবিদ্যার মূল কার্যকরী একক হ'ল ইকোসিস্টেম অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি। সুতরাং বাস্তুতন্ত্র হ'ল কোনো প্রণালী বা নিয়মের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায় এবং ঐ স্থানের অজীব উপাদানগুলির পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় উদ্ভূত নির্দিষ্ট উপাদানের বিনিময়। পরিবেশের বিভিন্ন ভৌতপ্রভাব (জল, আলো, বাতাস, তাপমাত্রা ইত্যাদি) গুলি আন্তঃক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বর্তমানে বায়োডাইভার্সিটি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যিক। বিভিন্ন পরিবেশে বাস্তুরীতির প্রকৃতিও ভিন্ন।

মূলতত্ত্ব

বাস্তুতন্ত্রের উপাদান হ'ল অজীবজাত উপাদান ও জীবজাত উপাদান। (ক) অজীবজাত উপাদান: আলো, বায়ু, মাটি, জল ও উষ্ণতা; (খ) জীবজাত উপাদান: সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদক, প্রাণী বা খাদক এবং জীবাণু বা বিয়োজক। এই উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য

পরিবেশের অন্তর্গত জীবজাত (biotic) এবং অজীবজাত (abiotic) উপাদানগুলি একত্রে পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে। একটি নির্দিষ্ট পুকুরের পরিবেশে জীবজাত উপাদান ও অজীবজাত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও উৎপাদকদের প্রাচুর্যতা পর্যবেক্ষণ করা হ'ল বর্তমান সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

কাঁচি, স্ক্যালপেল, ব্লেড, নিডল, হ্যান্ড ফ্লাস্ক, পলিথিন প্যাকেট এবং ক্যামেরা।

জলাশয়ের ভৌগোলিক অবস্থান

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর মহকুমাস্থিত সাত্তোর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন যাদবপুর গ্রামে (চিত্র ১)।
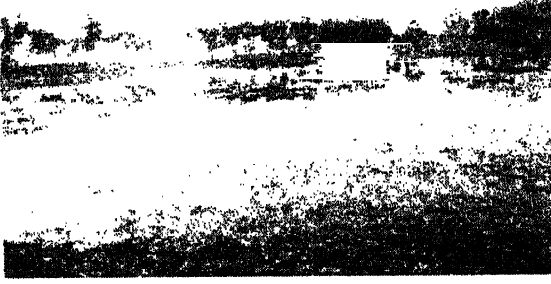
চিত্র ১

পদ্ধতি

একটি বড় জলাশয় বা পুকুর বেছে নেওয়া হ'ল। ঐ পুকুরের আয়তন (৪৬ বিঘা, গভীরতা ৫.৫ মিটার)। পুকুর বা জলাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রাণী ও প্ল্যাঙ্কটন যথাসম্ভব সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সনাক্ত করা হ'ল। সবশেষে তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা হ'ল। পুকুরটি যথেষ্ট সূর্যালোকযুক্ত। এছাড়া পুকুরটি ফাঁকা জায়গায় হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অজীবজাত উপাদানগুলির ঘাটতি থাকে না। জলের BOD-র (Biological oxygen demand) পরিমাণও যথেষ্ট। পুকুরটি মোটামুটি দুষণমুক্ত। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও ভালো। প্রথমে জীবজাত উপাদানগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হ'ল। পুকুরের কিনারা থেকে মধ্যস্থান অবধি বিভিন্ন জায়গার নমুনা সংগ্রহ এবং সনাক্ত করা হ'ল। সবক্ষেত্রেই ক্যামেরার সাহায্যে ছবি নেওয়া হয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২

পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা

পুকুরটিতে নিম্নলিখিত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলি দেখা গিয়েছে।

ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন: উডোগোনিয়াম, স্পাইরোগাইরা, কারা এবং কিছু (Macrophyte) বড় আকারের শ্যাওলা।

ছোটো উদ্ভিদ: হাইড্রিলা, ভ্যালিসনেরিয়া, ওটেলিয়া, পোটামোগিটন, অ্যাপোনোগিটন, জাসিয়া, সারপাস, লিমনোফিল, অ্যাজোলা, আরসিলিয়া, সালভিনিয়া।

মাঝারি লতানো উদ্ভিদ: নেপচুনিয়া, নিমফয়ডিস্

আকারে বড় উদ্ভিদ: নিমফিয়া, নিলামেথা।

প্রাণী যথাসম্ভব: বিভিন্ন ধরনের প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে পতঙ্গশ্রেণী (২-৩ রকম) শামুক, ঝিনুক, ল্যাঠা, কই, মাগুর, মৃগেল, কাতলা, রুই, ব্যাঙ, জলের সাপ উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদগুলি বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায় (জলের অবস্থান অনুসারে) যথা:

সম্পূর্ণ নিমজ্জিত: ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, ওটেলিয়া।

আংশিক নিমজ্জিত: হাইড্রিলা, ভ্যালিসনেরিয়া।

আংশিক ভাসমান: পোটামোগিটন, অ্যাপোনোগিটন।

সম্পূর্ণ ভাসমান: জাসিয়া, আজোলা, সালভিনিয়া, নেপচুনিয়া, নিমফয়ডিস, নিমফিয়া ও নিলম্বো।

এছাড়া মারসিলিয়া, সারপাস ও লিমনোফিলা পুকুরের কিনারার দিকে পাওয়া গেছে। বাহ্যিক গঠন ও অবস্থান-অনুসারে প্রাচুর্যতা-অনুযায়ী বর্তমান সমীক্ষার নির্বাচিত পুকুরটির **উৎপাদক শ্রেণী**কে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, আংশিক নিমজ্জিত, আংশিক ভাসমান, সম্পূর্ণ ভাসমান, কিনারার উদ্ভিদ।

খাদক অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে ঝিনুক ও শামুক জলের নীচে থাকে এবং অন্যান্য প্রাণী, যেমন, ব্যাঙ, সাপ, মাছ, পতঙ্গ ইত্যাদি জলের বিভিন্ন গভীরতর স্তরে সাঁতার কেটে বেড়ায়। সেই হিসাবে শামুক ও ঝিনুক বেনথস এবং বাকী প্রাণীদের নেকটন বলা যেতে পারে।

উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ হ'তে পুকুরটিতে নিম্নলিখিত খাদ্যশৃঙ্খলগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন → ছোটপতঙ্গ

ক্ষুদ্র মাছ বা প্রাণী → ছোটোমাছ → বড়মাছ

ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন → বড়মাছ।

ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন → ছোটপতঙ্গ → ব্যাঙ → সাপ → ছোটোমাছ →

বিয়োজক, বিভিন্ন রকম ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া।

উপসংহার

বর্তমান সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পুকুরটিতে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ দেখা গেছে তারা যথেষ্ট পরিমাণে আলো, বাতাস ও তাপমাত্রা পাওয়ার পুকুরের গভীরতা অনুযায়ী

উক্ত উদ্ভিদগুলির প্রাচুর্যতা ও অবস্থান ভিন্ন হয়েছে। প্রতিটি উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীগুলির নিবিড় সম্পর্ক থাকার ফলে সুস্পষ্ট খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

গ্রন্থপঞ্জী

Verma & Agarwal, Environmental Biology, S. Chand Company & Ltd. New Delhi.

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রকল্প তৈরি ক'রতে আমি যাঁদের কাছে উৎসাহ, সাহায্য, সহযোগিতা এবং মতামত পেয়েছি তাঁদের এবং বিশ্বভারতীর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অশোকদাকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া শ্রেণীশিক্ষক ও শ্রেণীশিক্ষিকা আমার এই সমীক্ষাটির কাজে নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আদিবাসীদের ভেষজ চিকিৎসাব্যবস্থা

অভীক ঘোষ ও চিত্তপ্রিয় চৌধুরী (২০০১)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

জীব-বিবর্তনের বহু পরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষ প্রথমে বনে বাস ক'রত, এমনকি এখনও ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার গভীর বনে মানুষ বাস করে। আদিমকাল থেকে বাস ক'রে আসছে ব'লে এদের আমরা আদিবাসী বলি। এছাড়াও পাহাড়ের গায়ে গ্রাম থেকে দূরে এক কোণে এদের বসবাস ক'রতে দেখি। আদিবাসীরাই হ'ল প্রকৃত ভারতীয়। ভারতে সর্বপ্রথম এই উপজাতিরাই বসবাস ক'রতে শুরু করে। আদিমযুগে চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল না। তখনকার মানুষ পাথরের ঘর্ষণে যে আগুনের ফুলকি সৃষ্টি হয় তা দেখে ভয় পেত। তারা আকাশের বিদ্যুৎ দেখলে ভয় পেত। সাপ, পোকামাকড় বা কুকুর ঐ জাতীয় কোনো প্রাণী কামড়ে দিলে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। যেহেতু তারা জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় বসবাস ক'রত, তাই বেশ কিছু দিন পর নানা ঘটনার মাধ্যমে মানুষ অনেকরকম ঔষধ আবিষ্কার ক'রতে থাকে। যেমন, তারা দেখেছিল সাপের সঙ্গে নেউলের লড়াই। মাঝে-মাঝে সাপ নেউলকে কামড়ে দেয়, তাই সেই সাপের বিষ থেকে বাঁচার জন্য নেউলেরা কোনো গাছের শিকড় গিয়ে কামড়াত। এইভাবে কোনো মানুষকে কোনো সাপে কামড়ে দিলে সেই মানুষটি সেই গাছের শিকড়কে নিজের দেহের উপর প্রয়োগ ক'রত। এইভাবে তারা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে নিত্যনতুন গাছপালা এবং লতাপাতা ঔষধ হিসাবে জোগাড় ক'রতে থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সূচনা

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার মোটামুটি দুটি ভাগ। যেমন- এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক। এই ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থা আদিমযুগে প্রচলিত ছিল না। সেই কারণে লতাপাতা ও গাছপালার উপর মানুষ নির্ভর ও বিশ্বাস ক'রতে থাকে। কারণ সেই যুগে গাছপালার প্রাচুর্য ছিল উল্লেখযোগ্য। যখন আদিম মানুষ উন্নত হ'তে শিখল, তারা প্রথম-প্রথম বিভিন্ন ক্ষতস্থানের উপর বা বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন গাছপালা এবং লতাপাতা প্রয়োগ ক'রতে থাকে এবং ধীরে-ধীরে তারা কোনও ক্ষতস্থানের উপর কি গাছ বা গাছের অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে তার হদিশ পায়। এইভাবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সূচনা হয়।

কিভাবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমান

এখনও পর্যন্ত যত আদিবাসী আছে, তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ শিক্ষিত এবং ৫০ শতাংশ নিরক্ষর। এই শিক্ষিত লোকেরা আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার উপর নির্ভর করেন। এঁদের মধ্যেও কিছু ব্যক্তি

আছেন যারা এখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করেন। বাকী ব্যক্তি পুরোপুরিই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপর নির্ভর করেন। আমি নিজে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছি যে এদের মধ্যে বিভিন্ন পাড়ায় একজন ক'রে কবিরাজ থাকেন। তারা ঐ গাছপালা এবং লতাপাতা নির্মিত ঔষধ রোগীদের দেন। এইভাবেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমান।

আদিবাসীদের কিছু ঔষধপত্র এবং তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য ব্যবহৃত কিছু ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ

লঙ্কাশিরে

লঙ্কাশিরে: গাছটি ব্যথার পক্ষে ভালো। গাছটির মধ্যে কোনো পাতা নেই। একমাত্র একটা সরু ডাল থেকে অন্য ডাল উৎপন্ন হ'য়েছে এবং ডালগুলি সবুজবর্ণের। ঐ ডালগুলোকে একটু মোচ্‌কে দিলে ওর মধ্যে থেকে একটা সাদা আঠা বের হয়। হাত বা পায়ের কোনো ছোটো হাড় নড়ে গেলে ঐ আঠাকে ক্ষতস্থানের উপর ব্যবহার ক'রলে উপশম হয়।

ধুতরো
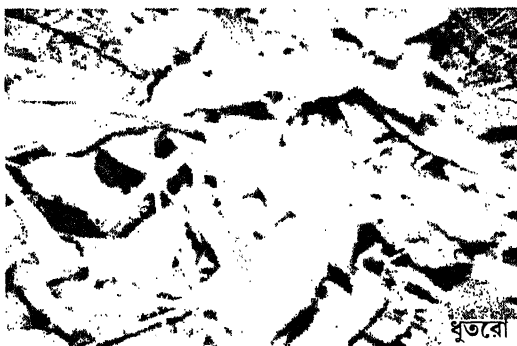
ধুতরো: গাছটি সহজেই নানা স্থানে পাওয়া যায়। গাছটির পাতাগুলি একটু বড়। কাঁটাদার ফল হয়। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সর্দিকাশি বা মাথার যে-কোনো অসুখে পাতার মধ্যে তেল লাগিয়ে পাতাটি মাথার মধ্যে ধ'রতে হয়। তাহ'লে কিছুদিনের মধ্যে অসুখ সেরে যায়।

নির্বিষ

নির্বিষ: গাছটি অনেকটা পাতাবাহারের মতো দেখতে। কোনো শাখাপ্রশাখা নেই। গাছটির অত্যন্ত গোড়ায় একটি পেঁয়াজের মতো সাদা অংশ থাকে। শরীরের কোথাও রক্ত বিষাক্ত হয়ে গেলে বা ধাক্কা লেগে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে ঐ পেঁয়াজের মতো সাদা অংশটি নিয়ে বেঁটে লাগালে রক্তে জমাট খুলে যায় বা রক্ত বিষাক্ত হতে পারে না। এই গাছের রস শরীরের যে-কোনো অংশে লাগালে কুটকুট করে।

আকন্দ

আকন্দ: যেখানে-সেখানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। গাছের পাতাগুলি আকারে মাঝারি। গাছের ফুল অত্যন্ত ছোটো হয়। গাছের বীজগুলি অত্যন্ত ছোটো হয়। কোনো জায়গায় জোরে ধাক্কা লাগলে সেই ক্ষতস্থানে গাছের পাতায় তেল লাগিয়ে ধ'রে থাকলে ব্যথার উপশম হয়।

মনসা: গাছটি খুব বিরল। গাছের ডালে কাঁটা আছে এবং ডালের একেবারে শেষ প্রান্তে পাতা জন্মায়। তাই এই গাছের পাতা খুব একটা বেশি থাকে না। ঠাণ্ডা লেগে চোখ দিয়ে জল প'ড়লে এই গাছের কয়েকটি পাতা কোনো ছোটোখাটো আগুনের নিচে ধরতে হয়। ফলে সেই পাতার নিচে যে কালি উৎপন্ন হয় তা চোখের কাজল হিসেবে প'রলে চোখের রোগ নিরাময় হয়।

এছাড়া নিম্নলিখিত নানা আপদ-বিপদে আদিবাসী কবিরাজগণ যেসমস্ত চিকিৎসাব্যবস্থা ক'রে থাকেন সেগুলি হ'ল :

গরম জলে বা আগুনে পুড়লে: যদি কারো গায়ে গরম জল, চা বা ভাতের ফ্যান প'ড়ে যায় তবে সঙ্গে-সঙ্গে বিনা জলে আলুবেটে লাগালে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটে এবং ফোস্‌কা পড়ে না।

জ্বর হ'লে: পান পাতার রস এক চামচ ও মধু পাঁচ-ছয় ফোঁটা দিয়ে খেলে জ্বর নিরাময় হয়।

চুনে-হলুদ

মচকে গেলে: নুন-হলুদ বা হলুদ-চুন মিশিয়ে সামান্য গরম ক'রে তার প্রলেপ দিলে ব্যথা উপশম ঘটে।

পাতলা পায়খানা হ'তে থাকলে: ২-৩টি পাথরকুচি পাতা নুন দিয়ে চিবিয়ে খেলে পাতলা পায়খানা বন্ধ হয়।

চোখ উঠলে: হাতিশুঁড়ের পাতার রস চোখে দিলে উপশম হয়।

মন্তব্য

বাঙালি সমাজ বা হিন্দুসমাজে যেমন কুসংস্কার আছে ঠিক তেমনই আদিবাসী সমাজেও কুসংস্কার আছে তা শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের মধ্যেও। তবে শিক্ষিত হ'লেও বংশানুক্রমে তাঁরা লতাপাতা, গাছগাছড়ার উপরেও নির্ভর করেন। তাঁরা এই ভেষজ উদ্ভিদগুলি নিজেদের দেহের উপর প্রয়োগ করে উপকৃত হয়েছেন। তাঁরা এও স্বীকার করেন যে, তাঁদের এই চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং বেশিরভাগ ব্যক্তি জানেন কোন গাছের কি কি অংশ কোন্-কোন্ রোগে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমার মনে হয় এদের এই চিকিৎসাব্যবস্থা এদের সমাজে খুবই কার্যকরী হ'লেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রকল্পটি করার সময় আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞান শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে পর্যাপ্ত সাহায্য পেয়েছি। তাছাড়াও বীরভূমের বড়ালপাড়া এবং পদ্মাবতীপুর গ্রামের আদিবাসীদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

সহায়ক পুস্তক

History of Science & Technology - Sri Debi Prasad Chottopadhyay
চিরঞ্জীব বনৌষধি - শ্রীশিবকালি ভট্টাচার্য,
উচ্চ-মাধ্যমিক জীববিদ্যা - ডঃ অমূলভূষণ চক্রবর্তী
সরল প্রাণবিজ্ঞান- ডঃ রবীন্দ্রনারায়ণ পাল,
জীবনবিজ্ঞান- ভট্টাচার্য চৌধুরী সাঁতরা,
প্রকৃতি মানুষ ও সম্পদ- অনু দত্ত

পরাগরেণুর বহিরাকৃতি এবং অঙ্গসংস্থানগত বৈশিষ্ট্য

দীপাঞ্জন বাসুরী (২০০১)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

বিজ্ঞানে যে শাখায় পরাগরেণু নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পরাগরেণু বিদ্যা বা প্যালিনোলজি বলে। অধ্যাপক গুনাড অ্যারড ম্যানকে পরাগরেণু বিদ্যার জনক বলা হয়। পরাগরেণুগুলি হ'ল সপুষ্পক উদ্ভিদের পুং জননের একক। রেণুগুলি পরাগথলির মধ্যে উৎপন্ন হয়। পরাগরেণুগুলি বিভিন্ন আকৃতির হ'তে পারে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী ও এক নিউক্লিয়াসযুক্ত হয়। পরিণত পরাগরেণু বিভিন্ন বাহক (যেমন জল, পতঙ্গ) দ্বারা এক ফুলের পরাগধানী থেকে সেই ফুলের অথবা ভিন্ন ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। যার ফলস্বরূপ বীজের সৃষ্টি হয়।

বাইরের গঠন দেখে আমরা আম, জাম, কাঠাল প্রভৃতি গাছগুলিকে যেমন সনাক্ত ক'রতে পারি সেইরূপ ক্ষুদ্র পরাগরেণুগুলির গঠনবৈশিষ্ট্য দেখে দুটি ভিন্ন পরাগরেণুর গোত্র সহজেই পৃথক করা যায়। পরাগরেণুগুলির আয়তন এতই ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। পরাগরেণুর বিভিন্ন আকার ও আকৃতি হ'তে পারে। পরাগরেণুর দুটি ত্বক থাকে। একটি বহিস্তক (Exine) এবং অপরটি অন্তস্তক (Intine)। বহিস্তকটি স্পোরোপোলোনিন নামক যৌগ দ্বারা গঠিত। এইজন্য পরাগরেণু জীবাশ্মে পরিণত হ'তে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে পরাগরেণু বিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে এলার্জির ক্ষেত্রে পরাগরেণুর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

উদ্দেশ্য

বর্তমান সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'ল ১০টি বিভিন্ন গাছের পরাগরেণুর বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

বিভিন্ন ফুলের পরাগরেণু, স্লাইড, কভার গ্লাস, নিডিল, ব্লেড, স্পিরিট ল্যাম্প, মোম. জেলি এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি

পরিণত কুঁড়ি অথবা সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু নিডলের সাহায্যে বের ক'রে স্লাইডের উপর রাখা একখণ্ড জেলির উপর দেওয়া হ'ল। এরপর কভার গ্লাস চাপা দেওয়া হ'ল এবং স্পিরিট ল্যাম্পে ঈষৎ উত্তপ্ত ক'রলেই জেলিটি গ'লে যেতে দেখা গেল যা কভার গ্লাস বরাবর ছড়িয়ে গেল।

এইভাবে মাউন্ট ক'রে কভার গ্লাসের চারপাশ মোম দিয়ে আবদ্ধ করা হ'ল। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরাগরেণুগুলির স্লাইড দেখা হ'ল এবং পরাগরেণুগুলির বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ ক'রে প্রত্যেকটি চিত্র অঙ্কন করা হ'ল।

পর্যবেক্ষণ
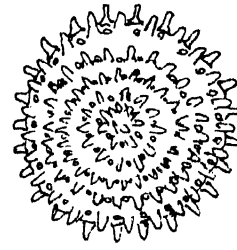
জবা

১) জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*) : এই পরাগরেণুগুলি গোলাকার, আকারে বেশ বড়, অমসৃণ, এক্‌সাইন এবং ইনটাইন স্পষ্ট, এক্সাইনের উপর বেশ কিছু কন্টক উপস্থিত। কাঁটাগুলির অগ্রভাগ ভোঁতা এবং প্রান্তদেশ একটু প্রশস্ত। পরাগরেণুর উপর একাধিক গোলাকার ছিদ্র বর্তমান। এই ধরনের পরাগরেণুকে প্যান্টোপোরেট পরাগরেণু বলে।
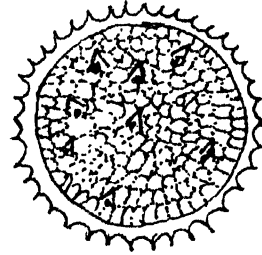
বেড়াকল্‌মি

২) বেড়াকলমি (*Ipomoca fistulosa*) : এই পরাগরেণুগুলি আকারে বেশ বড়, গোলাকার, এক্‌সাইন এবং ইনটাইন স্পষ্ট। এক্‌সাইনের উপর অসংখ্য কাঁটা বর্তমান। কাঁটাগুলোর অগ্রভাগ সূচালো, পরাগরেণুর উপর একাধিক গোলাকার ছিদ্র কাঁটা সংযুক্ত থেকে যায়। এই পরাগরেণুগুলিও এফিনেট এবং পেন্টোপোরেট প্রকৃতির।

তুলসী
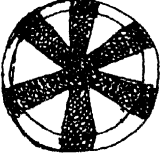
৩) **তুলসী** (*Ocimim sanctum*) : এই পরাগরেণুগুলি গোলাকার এবং লম্বা ছিদ্র অর্থাৎ Colpa বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য একে হেক্‌সোকল্পেট পরাগরেণু বলে। পরাগরেণুর উপর সূক্ষ্ম জালিকাকার অলঙ্করণ দেখা যায় এবং এর উপর কোনও কাঁটা বা প্রবর্ধক দেখা যায় না। সেইজন্য রেণুগুলি মসৃণ ও সাইলেট প্রকৃতির হয়।

ঘাস
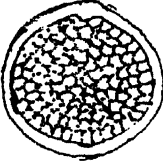
৪) **ঘাস** (*Cynodon datcylon*) : এক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলি গোলাকার মসৃণ আকারের ছোট সুস্পষ্ট এক্‌সাইন ও ইনটাইন বিশিষ্ট এবং অতি সূক্ষ্ম অণুজালিকার ন্যায় অলঙ্করণ বর্তমান। প্রতিটি রেণুর উপর একটি ক'রে গোলাকার ছিদ্র বর্তমান। এইগুলোকে মনোপরেট পরাগরেণু বলে।

৫) **শিরিষ** (*Albizia lebbeck*) : এক্ষেত্রে ছোট-ছোট ষোলোটি পরাগরেণু একক একসঙ্গে যুক্ত থেকে একটি গোলাকার অংশ গঠন করে। একে পলিয়াড বলে। উল্লেখযোগ্য হ'ল সোনাঝুরি গোত্রে (থাইমোস্যাসি) গাছের পলিয়াড দেখা যায়।

শিরিশ

৬) **অরোহর** (*Cajanas cajan*) : এই পরাগরেণুগুলি মসৃণ, অতি সূক্ষ্ম, অণুজালিকার ন্যায় অলঙ্করণ বিশিষ্ট এবং সাইল্যাট প্রকৃতির, পরাগরেণুগুলি কল্পোরেট, মেরুদৃশ্যে পরাগরেণুগুলি কিছুটা ত্রিকোণাকার দেখায়, কিন্তু নিরক্ষীয় দৃশ্যে ডিম্বাকার দেখায়।
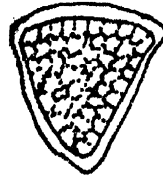
অরোহর

৭) **আকন্দ** (*Calotropis procera*) : এক্ষেত্রে অনেকগুলো পরাগরেণু একক একত্রে যুক্ত থেকে দুটি থলির মত অংশ তৈরি করে, দেখতে অনেকটা ফুসফুসের মত। থলির মত অংশ দুটি একটি সাধারণ সংযোজক দ্বারা যুক্ত। এরূপ পরাগরেণুকে পলিনিয়া বলে। উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি ক'রে পলিনিয়া থাকে। সমগ্র পলিনিয়াটি পতঙ্গ দ্বারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে বাহিত হয়। আকন্দপত্র অ্যাসক্লিপিয়াডেসি এবং অর্কিড (অর্কিডেসি)-এর ক্ষেত্রে পলিনিয়া দেখা যায়।
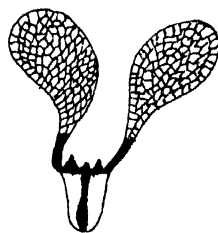
আকন্দ

চন্দ্রমল্লিকা

৮) **চন্দ্রমল্লিকা** (*Crysanthemum* sp) : এক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলি ক্ষুদ্র আকারের অমসৃণ একিন্যাট প্রকৃতির। কাঁটার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু কাঁটাগুলি খুবই ছোট এবং সূঁচালো। পরাগরেণুগুলিও কল্পোরেট প্রকৃতির।

রঙ্গন

৯) **রঙ্গন** (*Ixora*) : এই পরাগরেণুগুলি আকারে ছোট। মসৃণ অণুজালিকার ন্যায় অলঙ্করণ যুক্ত। এক্সাইন অধিকতর স্থূল বা মোটা। পরাগরেণুগুলো গোলাকার অথবা ডিম্বাকার হয় এবং ৩-কল্পোরেট প্রকৃতির।

১০) **কাকমাছি** : এক্ষেত্রে পরাগরেণুগুলির মেরুদৃশ্য ঈষৎ ত্রিকোণাকার। কিন্তু নিরক্ষীয় দৃশ্যে গোলাকার থেকে ডিম্বাকার দেখায়। রেণুগুলি মসৃণ বা সাইল্যাট। সুস্পষ্ট এক্সাইন ও ইনটাইন
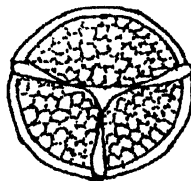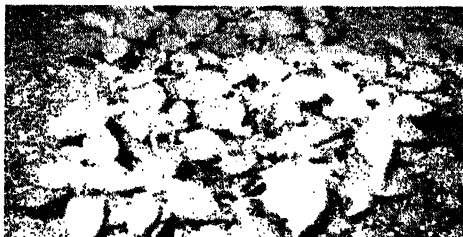
কাকমাছি

বর্তমান। রেণুগুলিতে ক্ষুদ্র গহ্বরের ন্যায় অলঙ্করণ দেখা যায়। পরাগরেণুগুলি ৩-কল্পোরেট প্রকৃতির এবং Colpaগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। ফলে একে Syncolpate পরাগরেণু বলে।

সিদ্ধান্ত

এই কাজটি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বিভিন্ন গাছের পরাগরেণুগুলির আকার আকৃতি অলঙ্করণ সবই আলাদা। এমনকি তাদের ছিদ্রের প্রকৃতিও আলাদা। কিছু ক্ষেত্রে একটি গোলাকার ছিদ্র, কোথাও আবার একাধিক গোলাকার ছিদ্র বর্তমান। কিছু গাছের পরাগরেণুগুলি শুধু লম্বা ছিদ্রবিশিষ্ট আবার কোথাও লম্বা এবং গোল উভরপ্রকার ছিদ্রই বর্তমান। অর্থাৎ দেখলাম পরাগরেণু বহিরাকৃতি, ছিদ্রের ধরন সবই প্রজাতি ভিত্তিক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রজেক্ট তৈরি করতে আমাকে ডঃ সুব্রত মণ্ডল, জীবনবিজ্ঞানের শ্রেণী শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রমুখ প্রভূত সাহায্য করেছেন। এছাড়া আরও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য ক'রেছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থপঞ্জিকা

Essentials of Palynology : P.K.K. Nair
Palynology : M.R. Saxena
পরাগ, এলার্জি ও পরিবেশ : ডঃ কাশীনাথ ভট্টাচার্য

লেমনগ্রাস (*Cymbopgon citratees*) গাছ্ থেকে তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি ও তার ভেষজ গুণাগুণ

প্রীতম দত্ত (২০০১)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ ধীরে-ধীরে সভ্যতার চরম শিখরে অবতারণ ক'রেছে। এই বিবর্তন ঘ'টেছে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, মানুষ বদলেছে নিজেদের জীবনের ধারাকে, উন্নত চিকিৎসার জন্য মানুষ আজ পেয়েছে দীর্ঘায়ু। কিন্তু এই চিকিৎসার উন্নতি শুরু হয় প্রাচীনকালের কবিরাজদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মাধ্যমে। প্রাচীন সভ্যতা থেকেই মানুষ নিজেদের রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ্-গাছড়ার ব্যবহার ক'রে এসেছে। এইসব গাছ্-গাছড়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনও তারা গাছের ছাল, শেকড়, কখনও বা পাতা, ফুল-ফল এবং কখনও কখনও ঐসব গাছ্-গাছড়া থেকে নিষ্কাশিত তেল চিকিৎসার জন্য ব্যবহার ক'রে এসেছে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে মৃতদেহ সংরক্ষণের কাজে তেল ব্যবহার করা হ'ত। এই পদ্ধতিতে দেহ সংরক্ষণ করাকে **মমী** বলা হয়। এই গাছ্-গাছড়াকে ঔষধি হিসেবে ব্যবহার ক'রে মানুষ বিস্ময় সৃষ্টি ক'রেছে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত এবং বিস্ময়কর অগ্রগতি হ'য়েছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা মানুষের বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে চ'লেছে। এই অসুবিধার ফলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে প্রাধান্য দেবার কথা ব'লে আসছেন।

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে আজও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রচলন আছে। যার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে। প্রকৃতির এসব বিভিন্ন গাছ্-গাছড়া থেকে আমি আমার 'জীবনবিজ্ঞান প্রকল্পে'র জন্য 'Lemon Grass' নামক গাছটির উপকারিতাকে বেছে নিয়েছি। এই গাছটির উপকারিতা বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় উল্লেখ আছে। এই গাছটি থেকে প্রাপ্ত তেল চিকিৎসা, রন্ধনাদি এবং সুগন্ধি হিসাবেও এশিয়াতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যার জন্য বিজ্ঞানীরা আজ এই গাছটির থেকে কি কি উপকারী পদার্থ পাওয়া যায় তা জানার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। আমি এই গাছটি বল্লভপুর অঞ্চলের পতিত জমিতে বংশবিস্তারের প্রাচুর্যতা দেখেছি। গাছটি ওখানে কিভাবে এল জানি না, কিন্তু গ্রামের মানুষ এর উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু জানেন না। ফলে গাছটি অতি মলিনতার সঙ্গে বেড়ে উঠেছে।

গাছটির প্রকৃতি : গাছটিকে ধানজাতীয় উদ্ভিদের শ্রেণীতে *Graminae* ফেলা যায়। গাছটি উচ্চতায় প্রায় ৪/৫ ফুট এবং অনেকটা ধান গাছের মত দেখতে। পাতাগুলি লম্বায় ধানগাছের

পাতা থেকে বড়। এই গাছের পাতা একটু নিয়ে গন্ধ নিলে লেবুর মত গন্ধ পাওয়া যায়। যার জন্য এই গাছটির নাম দেওয়া হ'য়েছে Lemon Grass। গাছের পাতাগুলি একটি গুচ্ছ থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে যার ফলে পাতাগুলি এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে যে দেখলে মনে হয় একগুচ্ছ ধানগাছ (চিত্র ১)।

চিত্র ১. লেমনগ্রাস (*Cymbopgon citratees*)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রকল্পটি তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাতে নিয়েছি।

১। Lemon Grassএর পাতা থেকে তেল সংগ্রহ করা। ২। প্রাপ্ত তেলের ভেষজ গুণাগুণ বিচার। ৩। গাছটির উপকরিতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা।

উপকরণ ও পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি— গোলতল ফ্লাস্ক, লিবিক কন্‌ডেন্সার, গ্রাহক পাত্র, হিটার, মর্টার।

তেল সংগ্রহের পদ্ধতি

Lemon Grassএর পাতা থেকে তেল সংগ্রহের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়। তেল সংগ্রহের জন্য Visva-Bharatiর Chemistry Department-এ প্রথম দিন দুটি পর্যায়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রথম দিন : প্রথম পর্যায় Lemon Grass থেকে পাতা সংগ্রহ : সতেজ Lemon Grassএর পাতা সংগ্রহ করা হ'ল। যেসব পাতার রঙ হালকা খয়েরি সেগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সবুজ ও সতেজ পাতাগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হ'ল, কারণ পাতাগুলি ধূলামিশ্রিত ছিল। **দ্বিতীয় পর্যায় পাতা থেকে মণ্ড প্রস্তুত** : পরিষ্কার পাতাগুলি কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ ক'রে ছুরি দিয়ে ছোট্ট-ছোট্ট করে কুচো করা হ'ল। কুচোগুলো মর্টারে ভ'রে অল্প জল দিয়ে ভালোভাবে পেষাই করা হ'ল। এবং পেষাই করা পাতাগুলি একটি প্যাকেটে ভালোভাবে মুড়ে রাখা হ'ল। কারণ Lemon Grass পাতার তেল উদ্বায়ী।

দ্বিতীয় দিন : তৃতীয় পর্যায় থেকে কাজগুলি Chemistry Department-এ সম্পন্ন করা হয়।
তৃতীয় পর্যায় মণ্ড থেকে তেল নিষ্কাশন : প্রস্তুত মণ্ডটিকে একটি গোলতল ফ্লাস্‌কে নেওয়া হ'ল। এবার গোলতল ফ্লাস্‌কটির সঙ্গে একটি লিবিক কন্‌ডেন্সার যুক্ত করা হ'ল। লিবিক কন্‌ডেন্সারের অপর প্রান্তে একটি গ্রাহক পাত্র রাখা হ'ল। লিবিক কন্‌ডেন্সারের উপর এবং নীচে একটি ক'রে রবার নল যুক্ত ক'রে, উপরের নলটি দিয়ে সবসময় ঠাণ্ডা জল সরবরাহ করা হ'ল।

এখন গোলতল ফ্লাস্‌কটি হিটারে বসিয়ে ১০০°C উষ্ণতায় Lemon Grassএর মণ্ড এবং মণ্ডে মিশ্রিত জলকে উত্তপ্ত করা হ'ল। কিছুক্ষণ পরে Lemon Grass পাতার তেল জলের সঙ্গে বাষ্পাকারে বের হ'য়ে আসতে লাগল। বাষ্পটি লিবিক কন্‌ডেন্সারের ভিতর দিয়ে যাবার সময় শীতল অবস্থার সংস্পর্শে এসে প্রায় ১ $^{১}/_{২}$ ঘন্টা পরে জলসহ Lemon Grass তেল ঘনীভূত হ'য়ে গ্রাহক পাত্রে জমা হ'তে লাগল (চিত্র ২)।

চিত্র ২. পাতন প্রক্রিয়ায় লেমনগ্রাস থেকে তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি

চতুর্থ পর্যায় তেল সংগ্রহ : গ্রাহকপাত্রে জমা হওয়া জলমিশ্রিত তেলটি গ্রাহক পাত্রের অর্ধেকের মত হ'ল। এবার গ্রাহকপাত্রে জমা জলমিশ্রিত তেলটি পুনরায় একই পদ্ধতিতে উত্তাপ করা হ'ল। এবার দেখা গেল মিশ্রণটি ৬০°C উষ্ণতায় ফুটছে এবং বাষ্পাকারে লিবিক কন্‌ডেন্সারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে পুনরায় গ্রাহক পাত্রে জমা হ'চ্ছে এবং এর থেকে Lemon-এর সুগন্ধি বেরোচ্ছে।

জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০°C, সেজন্য তৃতীয় পর্যায়ে দেখা গেল মিশ্রটি ১০০°C উষ্ণতায় ফুটছে, তাই সেক্ষেত্রে জলের পরিমাণ ছিল বেশি। কিন্তু শেষপর্যায়ে বা চতুর্থপর্যায়ে দেখা গেল মিশ্রণটি ৬০°C উষ্ণতায় ফুটছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জলের পরিমাণ কম, তেলের পরিমাণ বেশি। সমস্ত কাজটি সম্পন্ন হয় ৩ $^{১}/_{২}$ ঘন্টা পরে। উৎপন্ন তেলটি একটি হোমিওপ্যাথি শিশিতে রাখা হ'ল।

সাবধানতা

১) Lemon Grass-এর পাতা ধারালো তাই পাতা তোলার সময় যেন হাত না কেটে যায়।
২) তেলটি উদ্বায়ী। সুতরাং বোতলের ঢাকা সবসময় বন্ধ থাকা প্রয়োজন।
৩) গোলতল ফ্লাস্ক উত্তপ্ত হ'লে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হবে।

Lemon Grass তেলের প্রয়োগ

১) রান্নার কাজে ব্যবহার : Lemon Grass থেকে প্রাপ্ত তেলটি অত্যন্ত সুগন্ধি, যার জন্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষ এই তেলকে রান্নাকে সুগন্ধি করার জন্য ব্যবহার করেন। যার ফলে রান্না সুস্বাদু ও সুগন্ধি হয়।

২) চিকিৎসার কাজে ব্যবহার : Lemon Grass থেকে প্রাপ্ত তেলটি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে নিষ্কাশিত তেল রোগ নিরাময়ে অতুলনীয়। তেলটি গোদ রোগের উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়। তেলটি মাথাব্যথা, গলা খুস্‌খুস্‌ ইত্যাদি কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩) তেলটির মারণ ক্ষমতা : Lemon Grass থেকে প্রাপ্ত তেলটি জীবাণু ধ্বংসকারী। ছত্রাক ও মশা, মাছি ইত্যাদি পোকা নষ্ট করার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

৪) প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুতে ব্যবহার : তেলটি অত্যন্ত সুগন্ধি ব'লে তেলটি সাবানকে সুগন্ধি ক'রে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এই তেলটি Perfume বা সুগন্ধি দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রকল্পটি আমি ঈপ্সাদির নির্দেশের এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করি। যার ফলে আমাকে অতি দ্রুততার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ ক'রতে হয়। প্রকল্পটি অম্বুজদার সহায়তায়, আমি বিশ্বভারতীর রসায়নবিভাগে সম্পন্ন করি। সেখানে রসায়ন বিভাগের গৌতমদা এবং তাপসদা উক্ত তেল নিষ্কাশনের জন্য যথাযথ সাহায্য করেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তক পঞ্জিকা

i) *Glossary of Indian Medicinal Plants with active principlans* (part-1) (C.S.I.R.-1992)
ii) *The useful plants of India*, (C.S.I.R.-1986)
iii) *The Oxford English Reference Dictionary*. (Edited by Judy Pearrall) Oxford University Press, 1998.

ড্রসোফিলা পতঙ্গের জীবনচক্র এবং 'X'-ক্রোমোজমের সঞ্চারণ রীতি

সজল ঘোষ (২০০১)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

*Drosophila melanogaster*কে সাধারণত Fruit fly বলা হয়। এটি একটি ছোট্ট মাছি। এদের বৈশিষ্ট্য হ'ল মাথার দুপাশে অবস্থিত দুটি লাল গোল পুঞ্জাক্ষী (Rounded compound eye)। বিগত ১০০ বছর ধ'রে বংশগতি বিজ্ঞানের নানান গবেষণা অধ্যয়নের কাজে এই মাছিটি ব্যবহৃত হ'য়েছে এবং আজও বংশগতির গবেষণায় এই মাছির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সেই কারণে এই মাছিকে Cendralla of Genetics নামে অভিহিত করা হয় (চিত্র ১)।

Drosophila melanogaster-এর সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল তাদের দুটি বড় লাল পুঞ্জাক্ষি (compound) চোখ। সাধারণত এই মাছির চোখের রঙ লাল। তবে এদের একধরনের mutent আছে। যাদের চোখের রঙ সাদা। যে Geneটির mutation এর ফলে এই সাদা চোখ বিশিষ্ট মাছি তৈরি হয় সেই Geneটি X-chromosome এ অবস্থিত। উপস্থিত প্রোজেক্টটির লক্ষ্য ছিল :

১) লাল Gene সাদা Gene এর উপর প্রকট কিনা।

২) এবং X-chromosome-এর inheritance কিভাবে হয় তা দেখা।

প্রাণীজগতে শ্রেণীবিন্যাসে এর স্থান নিম্নরূপ :
Phylum - Arthropoda,
Class - Insecta,
Sub class - Diptera,
Family - Drosophillaedae,
Genus - *Drosophila*,
Species - *melanogaster*.

মাছিপালন

পরীক্ষাগারে গবেষণার জন্য ছোট ছোট Vial বা কাঁচের পরীক্ষানলের মধ্যে Drosophila পালন করা হয়। পরিষ্কারভাবে ধোওয়া পরীক্ষানল কিছুক্ষণ Oven-এ রেখে শুষ্ক ক'রে নেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষানলের মধ্যে Drosophilla পালনের মাধ্যম ঢালা হ'ল। এরপর একটি কাপড় দিয়ে এদের ঢেকে রাখা হ'ল এবং Culture medium জমে শক্ত হ'য়ে গেলে তুলো দিয়ে পরীক্ষানলের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

(ক)

(খ)

চিত্র ১. মাছি পালন ও সংগ্রহ পদ্ধতি (ক, খ)

***Drosophila* সংগ্রহের পদ্ধতি**

তিনটি পরীক্ষানলে পাকা কলার Banana bait তৈরি ক'রে একটি স্থানে রাখা হ'ল। দু'ঘন্টা পর পরীক্ষানলের মধ্যে Drosophila প্রবেশ ক'রতে আরম্ভ ক'রল। বেশকিছু পরিমাণ মাছি পরীক্ষানলের মধ্যে প্রবেশ করার পর পরীক্ষানলের মুখটি তুলো দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

নিম্ন সারণীতে (সারণী ১) প্রদর্শিত তিনদিনের সংগ্রহ বহিরাকৃতির ভিত্তিতে ব'লে সনাক্ত করা হয়। এই সনাক্তকরণের কাজটি ব্যাঙ্গালোরের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে Prof. B.N. Sinha এঁর গবেষণাগারে সম্পাদিত হয়।

Date of collection	*No. of flies*	*Male*	*Female*
26.11.2000	16	3	13
27.11.2000	44	22	22
28.11.2000	48	25	23

সারণী ১

যে সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাছি পালনের কৃত্রিমখাদ্যমাধ্যম (প্রতি একক পরিমাণ Culture medium) তৈরি করা হয় তা নিম্নরূপ :

1. Maise powder - Source of Carbohydrate & protein, 17 gm.
2. Yeast granule - for fermentation, 6 gm.
3. Sugar - for sweetness and carbohydrate, 12 gm.
4. Agar agar - for make the medium hard, 1.5 gm.
5. Nepajin - (methyl P-hydroxybenzoate) acts as a fungicide, 1 gm.
6. Propionic acid - odour/smell gripe fruit, 1 ml.
7. Water, 360 ml.

সারণী ২

এইভাবে Culture Vial প্রস্তুত ক'রে তার মধ্যে Drosophila ছেড়ে দিয়ে মুখটি আবার তুলো দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। এই Vial-এর মধ্যেই মাছিগুলির যৌন জননের ফলে ঐ মাধ্যমের উপর ডিম পাড়ে। প্রথম এবং দ্বিতীয় Inster larva খাবারের মধ্যেই অবস্থান করে। যদিও 3rd Inster larva প্রথমদিকে খাবারের মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু পরে তারা পরীক্ষানলের দেওয়াল বেয়ে উঠে এসে Pupa তৈরি করে। এই পিউপা থেকে সময়মত পূর্ণাঙ্গ মাছি বেরিয়ে আসে। এই পরীক্ষানলে সাধারণত একমাস মাছি পালন করা হয়। পুরুষ ও স্ত্রী মাছির মধ্যে যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা গেছে তা নিম্নরূপ :

পুরুষ স্ত্রী

চিত্র ২. ড্রসোফিলা মাছির বাহিরাকৃতি

1. Maleএর Abdominal tip rounded.
2. সমবয়সের male femaleএর অপেক্ষা ছোট হয়

1. Femaleএর abdominal tip pointed.
2. সমবয়সের female maleএর অপেক্ষা বড় হয়

3. প্রথম পায়ের 1st tarsel segmentএ sexcomb থাকে।	3. কোন sexcomb থাকে না।
4. Abdominal tipএর উপরের অংশ কালো	4. Abdominal tipএর উপরের অংশ কালো নয়।

জীবনচক্র

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীমাছির নিষেকের ফলে স্ত্রীমাছি ডিম পাড়ে। ডিম সাদা রঙের এবং দৈর্ঘ্য 0.5 মিমি.। 22° - 24°C তাপমাত্রায় ডিম থেকে লার্ভা হ'তে সময় লাগে 24 ঘন্টা। ঐ লার্ভা খাবারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রচুর খাবার খায়।

Larvaকে তিনটি দশায় ভাগ করা হয় : যথা 1) 1st Inster, 2) 2nd Inster, 3) 3rd Inster.

Ist Inster অবস্থায় Larva 24 ঘন্টা থাকে। তারপর 2nd inster larva তে পরিণত হয়। 2nd inster larva খাবারের মধ্যে 24 ঘন্টা থাকে। তারপর 3rd inster larva পরিণত হয়। 3rd inster-এর তিনটি দশা দেখা যায়। যথা : 1) Early 3rd inster, 2) Mid 3rd inster, 3) Late 3rd inster.

Early 3rd inster এবং Mid 3rd inster অবস্থায় লার্ভা 24 ঘন্টা ক'রে থাকে। এই দুই দশা খাবারের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। Late 3rd inster লার্ভা Vial-এর দেওয়াল বেয়ে খাবার থেকে বেড়িয়ে আসে এবং Pupa গঠন করে। এইসময় তাদের লার্ভাঅঙ্গ নষ্ট হয় এবং 3-4 দিন পর তারা Pupa তে পরিণত হয়। Pupa অবস্থায় এরা তিন-চারদিন 22° - 24°C তাপমাত্রায় থাকে। পিউপা থেকে Adult হ'তে (22° - 24°C তাপমাত্রায়) 4 দিন সময় লাগে। নিম্নলিখিত বিশেষ সুবিধাগুলির জন্য ফলের এই মাছিটিকে নির্বাচন করা হ'য়েছে।

1. সংক্ষিপ্ত জীবনচক্র।
2. পুরুষ ও স্ত্রী সহজে চেনা যায়।
3. কোনো রকম রোগ বহন করে না।
4. প্রকৃতিতে এর অনেক mutent পাওয়া যায়।
5. একবার মিলনের ফলে স্ত্রী মাছি অনেক ডিম পাড়তে পারে (প্রতিবারে প্রায় 75টি)। ফলে পরবর্তী জনুর জন্যে অনেক মাছি পাওয়া যায়।
6. এদের জনন প্রক্রিয়া আবদ্ধ অবস্থাতেও সম্পন্ন হয়।

'সাদা চোখ' গুণটির জন্য নির্ভরশীল জীনটির সঞ্চারণ রীতি পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়

পরীক্ষাপদ্ধতি ও ফলাফল :

যে geneটি লাল চোখের জন্য দায়ী সেটি X-chromosome-এ অবস্থিত। স্ত্রীমাছির দুটিই X-chromosome অথচ পুরুষ মাছির একটি X-chromosome এবং একটি Y-chromosome থাকে। প্রথমে P_1-এ যে সাদা চোখবিশিষ্ট স্ত্রী মাছি নিয়ে cross শুরু করা হয়েছিল তার দুটি X-chromosome এ সাদা চোখের gene অবস্থিত। সেই অর্থে P_1 এ ব্যবহৃত লাল চোখ বিশিষ্ট পুরুষদের একটি মাত্র X-chromosome লাল চোখের জন্য দায়ী gene অবস্থিত।

এদের cross এ উৎপন্ন (F_1) এর পুরুষরা একটি X-chromosome মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। যেহেতু তাদের মায়ের দুটি X-chromosome সাদা চোখের জন্য দায়ী gene রয়েছে কিন্তু বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত Y-chromosome চোখের রঙের জন্য কোনও gene নেই। তাই F_1 এর সকল পুরুষ মাছি সাদা চোখ বিশিষ্ট।

F_1 এর স্ত্রী মাছিগুলির একটি X-chromosome বাবার কাছ থেকে এবং অপর X-chromosome মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত X-chromosome এ লাল চোখের gene থাকায় এবং মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত X-chromosome এ সাদা চোখের রঙের জন্য দায়ী gene থাকায় এই স্ত্রীমাছিগুলির কাছে উভয়প্রকার gene ছিল। যদিও তাদের কাছে উভয়প্রকার gene ছিল তবুও চোখ লাল হওয়ায় প্রমাণ করে যে লাল চোখের geneটি সাদা চোখের জন্য gene এর উপর প্রকট (চিত্র ২)।

F_1 এ প্রাপ্ত মাছিগুলির যখন একে অপরের সঙ্গে cross করানো হ'ল, তখন আমরা দেখি স্ত্রী মাছিগুলির কাছে দুটি X-chromosome ছিল। তাদের মধ্যে একটিতে সাদা চোখের জন্য দায়ী এবং অপরটিতে X-chromosome এ লাল চোখের জন্য দায়ী gene ছিল। গ্যামেট তৈরি করার সময় দুটি gene আলাদা আলাদা হ'য়ে যাওয়ার সময় এক ধরনের গ্যামেট সাদা চোখের gene বিশিষ্ট X-chromosome পায় এবং অপরটি লাল চোখের জন্য দায়ী X-chromosome বিশিষ্ট gene পায়। একই যুক্তিতে F_1 এর সাদা চোখবিশিষ্ট পুরুষ মাছিগুলি যখন গ্যামেট উৎপন্ন করে তখন একধরনের গ্যামেট সাদা রঙের চোখের জন্য দায়ী gene বিশিষ্ট X-chromosome পায় এবং অপরটি Y-chromosome পায় যাতে চোখের জন্য দায়ী কোনও gene নেই।

F_2 তে উৎপন্ন পুরুষ মাছিগুলি তাদের মায়ের কাছ থেকে X-chromosome এবং বাবার কাছ থেকে Y-chromosome পায়। যেহেতু তাদের মায়ের কাছে সাদা এবং লাল X-chromosome এর গ্যামেটের সংখ্যা প্রায় সমানুপাতে ছিল, তাই F_2 তে উৎপন্ন সাদা ও লাল চোখের মাছির সংখ্যা প্রায় সমান হ'য়েছিল (চিত্র ৩)।

F_2 তে উৎপন্ন স্ত্রী মাছিগুলি হয় লাল চোখবিশিষ্ট বা সাদা চোখবিশিষ্ট। তারা তাদের মায়ের কাছ থেকে যে X-chromosome বিশিষ্ট গ্যামেট পেয়েছে তা দুই ধরনের gene ছিল—
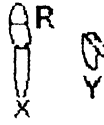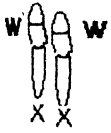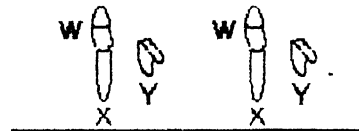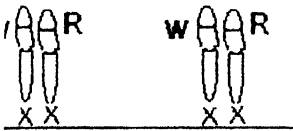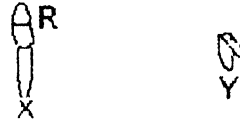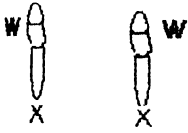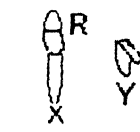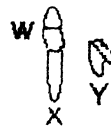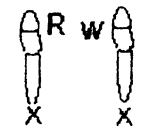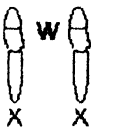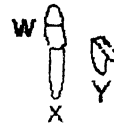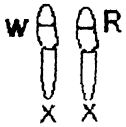
চিত্র ৩ : সমগ্র Crossটিকে chromosomeএর ছবির সাহায্যে দেখানো হ'ল

সাদা চোখের জন দায়ী gene বিশিষ্ট বা লাল চোখের জন্য দায়ী gene বিশিষ্ট হওয়ায় তাদের চোখের রঙ লাল/সাদা হয়েছিল কারণ লাল geneটি সাদা gene এর উপর প্রকট (চিত্র)।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই জীবনবিজ্ঞান Projectটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষাভবনের অধ্যাপক সুদীপ মণ্ডল এবং আমাদের স্কুলের শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছি তার জন্য আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সহায়ক গ্রন্থ

A guide to introductory studies of the genetics and cytology of Drosophila melanogaster.

পেঁয়াজ (*Allium Cepa*) মূলাগ্রের মাইটোসিস : কোষবিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়

জিষ্ণু প্রসাদ (২০০০)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

উদ্দেশ্য

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটা ছোট আমের বীজের মধ্যে কিভাবে অতবড় আমগাছ লুকিয়ে থাকে তা ভেবে অবাক হ'তাম। পরে একটু বড় হ'লে অঙ্কুরোদ্গমের ফলে বীজ থেকে ভ্রূণের সৃষ্টির কথা জানতে পারি। দশম শ্রেণীতে উঠে আরও জানতে পারি যে এই অঙ্কুরোদ্গম কোষবিভাজনের ফলে ঘটে এবং কোষবিভাজনের ফলেই ছোট্ট চারা থেকে অতবড় গাছের সৃষ্টি হয়।

ছোটোবেলার প্রশ্নের উত্তর যখন বড় হ'য়ে জানতে পারলাম যে এটা কোষবিভাজনের ফলে ঘটে, তখন থেকেই এই কোষবিভাজন প্রক্রিয়াটিকে নিজে প্রত্যক্ষ করার জন্য এই বিষয়টিকেই আমার প্রোজেক্ট হিসেবে নির্বাচন ক'রলাম।

এই প্রোজেক্টটিতে আমি বিশেষ ক'রে একদিকে যেমন মাইটোসিসের বিভিন্ন দশাগুলি দেখতে পাব অন্যদিকে তেমনি কোষের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অংশগুলি চিনতে পারব, এছাড়া ফলপ্রসূ কোষগুলি কোনো রোগে আক্রান্ত হ'লে (যেমন ক্যানসার) তাদের পরিবর্তন দেখে তা বুঝতে বা সনাক্ত ক'রতে পারব।

ভূমিকা

যে পদ্ধতিতে কোনো দেহ-মাতৃকোষ বিভাজিত হ'য়ে সমআকৃতি ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, তাকে পরোক্ষ কোষবিভাজন বা মাইটোসিস বলে।

বহুকোষী জীবের দেহ দুইপ্রকার কোষ দিয়ে তৈরি : ১) দেহকোষ বা সোমাটিক কোষ (প্রজনন-কার্য ব্যতীত দেহের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ করে) এবং ২) জননকোষ (যা যৌন জননে সাহায্য করে, যেমন শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় কোষ)।

স্লাইডার ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে মাইটোসিস পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেন। ককরাউম এবং ম্যাক কোয়েলি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে মাইটোসিসের রাসায়নিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেন। উপস্থিত প্রোজেক্টের আলোচ্য কোষবিভাজন পদ্ধতিটি সাধারণত সোমাটিক কোষে দেখা যায়। তবে জনন অঙ্গে জননকোষ উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় (স্পার্মাটোগোনিয়া, উগোনিয়া) এইপ্রকার কোষবিভাজন দেখা যায়। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ওয়াল্টার ফ্লেমিং প্রথমে জীবদেহে মাইটোসিস-বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন এবং তার বিবরণ দেন।

উপকরণ ও পরীক্ষাপদ্ধতি

ক্রোমোজোম মরফোলজির বিস্তার এবং পরিষ্কার ক'রতে সম্পৃক্ত প্যারা ডাই-ক্লোরো-বেঞ্জিন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যাসকুলিন এর রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার ক'রলাম। এই অবস্থায় **রুটটিপ**গুলিকে চার ঘন্টা ধ'রে ১২° সেন্টিগ্রেড থেকে ১৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখলাম।

ফিক্‌সেশন

এরপর পেঁয়াজের মূলাগ্রগুলিকে মেটাফেজ দশায় স্থির রাখার জন্য প্রথমে সাবধানতা সহকারে পাতিত জলে ধুয়ে এরপর ঐ মূলাগ্রগুলিকে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং ইথানলকে ১ : ৩ অনুপাতে মিশিয়ে তাদের মিশ্রণ তৈরি ক'রে তাতে ফিক্স ক'রে সারারাত ধ'রে রেখে দেওয়া হ'ল।

স্টেনিং

এরপরে মূলাগ্রগুলিকে ৪৫% অ্যাসিটিক অ্যাসিডে ৫ মিনিট থেকে ৭ মিনিটের জন্য রাখলাম। এরপর মূলাগ্রগুলিকে ২% অ্যাসিটো-অর্সিনে গরম ক'রে ২ ঘন্টা থেকে ৩ ঘন্টার জন্য রেখে দিলাম। সবশেষে রুটটিপগুলিকে স্লাইডে নিয়ে অ্যাকুয়াস ৪৫% অ্যাসিটিক অ্যাসিড এক থেকে দু ফোঁটা দিয়ে কভার গ্লাস চাপা দিলাম। কভার গ্লাস চাপা দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখলাম যাতে বাতাস না ঢোকে। এরপর প্রথমে নিড্‌লের সাহায্যে ওপরে ঘষে স্লাইডে কোষের টুকরোগুলিকে ছড়িয়ে ফেললাম। এইভাবে স্লাইডটিকে মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত ক'রলাম।

চিত্র ১. প্রস্তুত স্লাইড পর্যবেক্ষণ
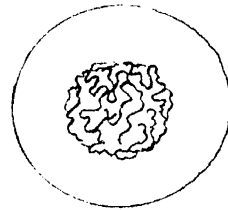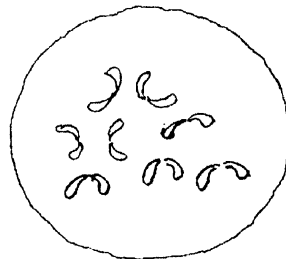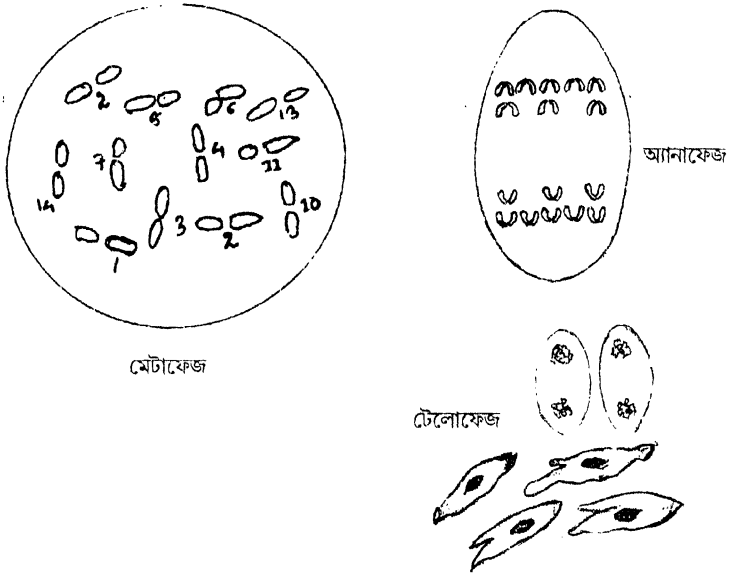
চিত্র ১. মাইটোসিস বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়

পর্যবেক্ষণ

মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণের সময় দেখলাম যে মূলাগ্রগুলিতে ষোলোটি সোমাটিক ক্রোমোজোম আছে। সেইগুলি মেটাফেজ দশায় গণনা ক'রলাম। ওই ষোলোটি ক্রোমোজোমের ২ জোড়া মেটাসেন্ট্রিক অবস্থায়, ৩ জোড়া প্রাথমিক সংকোচন অবস্থায় (যেগুলো মধ্যক-এর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল), ২ জোড়া প্রাথমিক সংকোচন অবস্থায় সাবমিডিয়ান অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট ১ জোড়ার একটি প্রাথমিক সংকোচন এবং অপরটি অপ্রধান সংকোচন অবস্থায় দেখলাম।

মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি দুটি পর্যায়ে ঘটে। ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস। ক্যারিওকাইনেসিস ব'লতে নিউক্লিয়াসের বিভাজন বোঝায়। নিউক্লিয়াস বিভাজন অর্থাৎ ক্যারিওকাইনেসিস সমাপ্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সাইটোপ্লাজমীয় বিভাজন বা সাইটোকাইনেসিস আরম্ভ হয়। সাইটোপ্লাজমের বিভাজন শেষ হ'লে একটি ডিপ্লয়েড জনিতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য ডিপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয়। এই কারণে দেহজ কোষবিভাজনকে মাইটোটিক বিভাজন বলা হয়। মাইটোটিক বিভাজনে অপত্য কোষদ্বয় সমসংখ্যক ক্রোমোজোম প্রাপ্ত হয় এবং সমগুণসম্পন্ন হয় ব'লে একে **সমবিভাজন বা ইক্যুএশনাল ডিভিশন** বলে। মাইটোটিক বিভাজনে মাতৃ-নিউক্লিয়াস সরাসরি বিভাজিত না হ'য়ে প্রথমে বিনষ্ট হ'য়ে নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রোমোজোম গঠন করে, পরে ওই ক্রোমোজোম থেকে অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। সরাসরি হয় না ব'লে একে পরোক্ষ বিভাজনও বলে।

মাইটোসিস

ক্যারিওকাইনেসিস (নিউক্লিয়াসের বিভাজন)

সাইটোকাইনেসিস (সাইটোপ্লাজমের বিভাজন)

মাইটোসিসের পর্যায়ভেদ
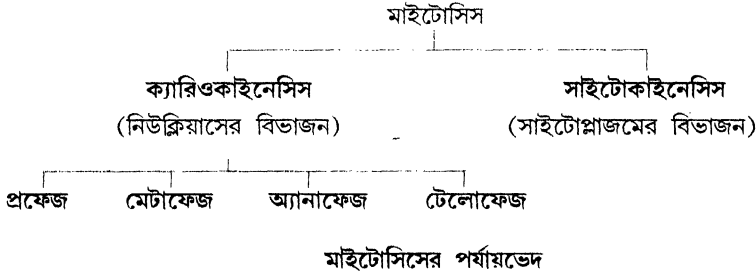
ক্যারিওকাইনেসিসের বিভিন্ন দশা

বিবরণ ও অনুধাবনের সুবিধার জন্য মাইটোসিস পদ্ধতিকে কয়েকটি দশা এবং প্রতিটি দশাকে আবার বিভিন্ন উপদশায় ভাগ করা হয়। একটি দশা থেকে ঠিক কিভাবে অন্য দশায় রূপান্তরিত হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কারণ এই পদ্ধতি অত্যন্ত গতিশীল।

মাইটোসিসে প্রফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলাফেজ এই চারটি দশা আছে। টেলোফেজ দশার অব্যবহিত পরে শুরু হয় সাইটোকাইনেসিস। দুইটি মাইটোসিসের মধ্যবর্তী দশার নাম **ইন্টারফেজ**। যখন নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয় না সেই অবস্থাকে স্থির দশা এবং নিউক্লিয়াসটিকে স্থির নিউক্লিয়াস বলে। স্থির অবস্থায় নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয় বস্তুর সংশ্লেষ পুর্ণোদ্যমে সংঘটিত হ'লে, তবেই মাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়াটি ঘটে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে পেঁয়াজের মূলাগ্রে ষোলোটি সোমাটিক ক্রোমোজোম থাকে, যেগুলি মেটাফেজ দশায় গণনা করা সম্ভব। ওই ষোলোটি ক্রোমোজোমের ২ জোড়া মেটাসেন্ট্রিক অবস্থায়, ৩ জোড়া প্রাথমিক সংকোচন অবস্থায় (মধ্যকের কাছাকাছি), ২ জোড়া প্রাথমিক সংকোচন অবস্থায় সাবমিডিয়ান অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট ১ জোড়ার ১টি প্রাথমিক সংকোচন এবং অপরটি অপ্রধান সংকোচন অবস্থায় অবস্থান করে। উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোষ বিভাজন অগ্রস্থ ভাজক কলায় বেশি হয়। এছাড়া এই পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেহকোষ ক্রোমোজোমের ইক্যুএশনাল বিভাজন ঘটে।

পরিশেষে উল্লেখ করি যে, সময়াভাবে গবেষণার কাজ দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হ'ল না। কোষবিভাজনের হার কি কি গতির উপর নির্ভরশীল, কাণ্ড ও মূলের কোষবিভাজনের পার্থক্য, বিভিন্ন কলার কোষ বিভাজনের তারতম্য, বয়সভেদে কোষবিভাজনের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার এলাকাগুলি সময়-সংক্ষেপের জন্য অনুসন্ধান করা সম্ভব হ'ল না এবং এইসব বিষয়ে ভবিষ্যতে উত্তরসুরীদের কাজ করার সুযোগ থাকল।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রোজেক্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রতে পারার জন্য আমি আমাদের বিদ্যালয়ের এবং বোটানি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক-শিক্ষিকা-প্রফেসরদের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্য আমি এঁদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

পুস্তকতালিকা

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান সহায়িকা : মৌলিক ও সাঁতরা
জীবনবিজ্ঞান পরিচয় : সলিলকুমার চৌধুরী ও দুলালচন্দ্র সাঁতরা
উচ্চমাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান : নলিনীরঞ্জন রথ ও ডঃ সুরদীশচন্দ্র দত্ত

বীজের জলশোষণে তাপমাত্রার প্রভাব

শ্রীপর্ণা চৌধুরী (২০০০)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

উদ্ভিদ থেকে ফল আলাদা হওয়ার পর বা তার আগেই ফলের ভিতরের বীজ জলত্যাগ ক'রে শুষ্ক হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। পরে যথার্থ সময়ে জল পেলে বীজ দ্রুত মাত্রায় জলশোষণ করে এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। বীজের এই জলশোষণ-ক্ষমতা নির্ভর করে সঞ্চিত প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতির উপর। বেশির ভাগ বীজেই বীজত্বক কিছু মাত্রায় জল-নিরোধক। ফলে বীজের গায়ে একপ্রকার রন্ধ্রের (Micropyle) মাধ্যমে জল বীজে প্রবেশ করে।

উপস্থিত প্রোজেক্টটিতে দেখতে চাই ছোলাবীজের জলশোষণের উপর তাপমাত্রার কি প্রভাব রয়েছে।

উপকরণ ও পদ্ধতি

কিছু ভালো ছোলা বীজ, কাচের প্লেট, সাধারণ তুলাযন্ত্র, বীকার, থার্মোমিটার, হিটার, জল (ঠাণ্ডা জল, গরম জল, সাধারণ জল)।

প্রথমে বেশ কিছু ভালো ছোলা বেছে নেওয়া হ'ল। এর থেকে 5 gm ক'রে ওজন ক'রে তিনটি বীকারে ছোলা বীজগুলি রাখা হ'ল। এবার ওই তিনটি বীকারে যথাক্রমে ঠাণ্ডাজল (20°C), সাধারণ জল (30°C) এবং গরম জল (40°C) দেওয়া হল। প্রত্যেকটি বীকারের জলকে ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখার জন্য যথাক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম জল মেশানো হল। এই অবস্থা 1 ঘন্টা রাখার পর বীজগুলিকে নির্দিষ্ট বীকার থেকে তুলে ব্লটিং পেপারের সাহায্যে গায়ের জল মুছে ফেলা হ'ল। তারপর তিনটি বীকারের ছোলাগুলির আবার ওজন নেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় ওজন থেকে প্রথম ওজন বিয়োগ ক'রে প্রতিটি তাপমাত্রায় বীজদ্বারা জলশোষণের পরিমাপ পাওয়া গেল। [তালিকা ১]।

ফলাফল

তাপমাত্রা	প্রথম ওজন (W_1)	দ্বিতীয় ওজন (W_2)	শোষিত জলের পরিমাণ ($W_2 - W_1$)
20°C	5g	5.2g	0.2g
30°C	5g	6.2g	1.2g
40°C	5g	7.1g	2.1g

তালিকা ১. তাপমাত্রার তারতম্যে জলশোষণের পরিমাণ।

লেখচিত্র 1 লেখচিত্র 2
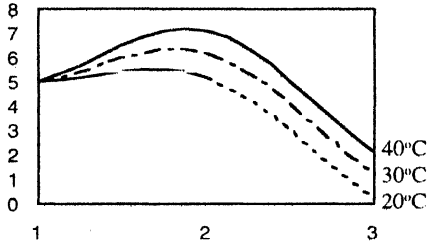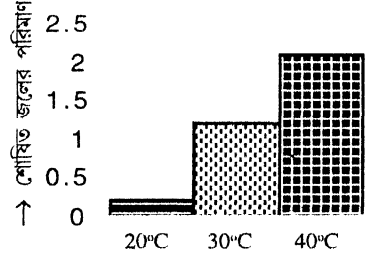
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বর্তমান পরীক্ষায় দেখা গেল তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বীজের জলশোষণের পরিমাণ বেড়ে যায় (লেখচিত্র ১ ও ২)। এমনিতে শুকনো বস্তুর জলশোষণ একটি ভৌতিক প্রক্রিয়া এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে বীজের জলশোষণ বেশি তাপমাত্রায় জলের তারল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে জল রন্ধ্রের মাধ্যমে দ্রুত মাত্রায় বীজের মধ্যে প্রবেশ ক'রতে পারে।
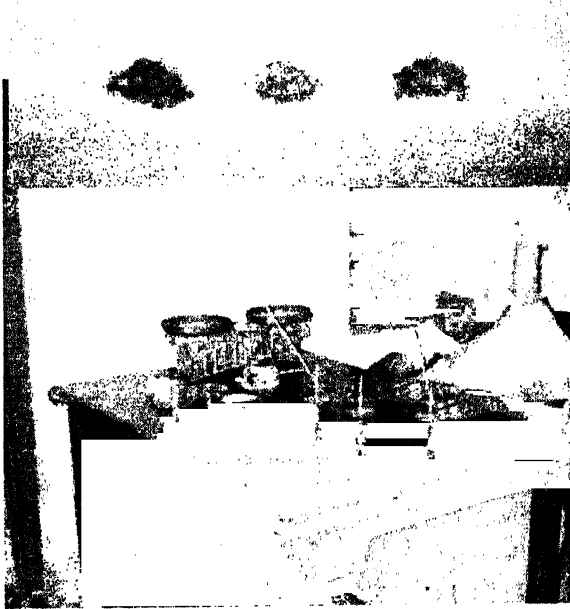
চিত্র ১. শোষিত জলের পরিমাণ নির্ণয়

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার এই প্রোজেক্টটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষাসত্র ও শিক্ষাভবনের বোটানি বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

গ্রন্থপঞ্জী

জীবনবিজ্ঞান পরিচয় (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য) - চৌধুরী, ভট্টাচার্য ও সাঁতরা।
উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা (প্রথম খণ্ড) - সান্যাল, চট্টোপাধ্যায়, দত্ত।
জীববিদ্যা (প্রথম খণ্ড) - গুহ, দাশগুপ্ত, সাঁতরা।

বয়সভেদে বেড়াকল্মি *(Ipomea Sp)* গাছের পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ নির্ণয়

মল্লিকা ঘোষাল (২০০০)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

উদ্দেশ্য

জীব ও জড়ের সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল পৃথিবীর প্রত্যেকে পরস্পরের পরিপূরক। যেমন প্রকৃতিতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

সালোকসংশ্লেষের সময় সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং বাতাসে অক্সিজেন ত্যাগ করে। অন্যদিকে প্রাণীরা শ্বসনকালে বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের এই আদান-প্রদান সালোকসংশ্লেষের ফলেই সংঘঠিত হয়। আর ক্লোরোফিল হ'ল সালোকসংশ্লেষে সহায়ক একটি বিশেষ উপাদান।

ভূমিকা

সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি কিভাবে ঘটে তা আমরা জানি। আরও জানি যে, এই পদ্ধতিতে মূল ভূমিকা থাকে সবুজকণা তথা ক্লোরোফিল অণুর। সেগুলি পাতার মেসোফিল কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট নামক অঙ্গাণুর ভিতর থাকে। এই ক্লোরোফিল অণুর পরিমাণের উপর অনেকখানি নির্ভর করে পাতার সালোকসংশ্লেষ করার ক্ষমতা। পাতায় উপস্থিত ক্লোরোফিলের পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়। পাতা থেকে ক্লোরোফিলকে বিভিন্ন রকম জৈব দ্রবকের সাহায্যে দ্রবীভূত ক'রে কলোরিমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। বর্তমান প্রোজেক্টে বেড়াকল্মি গাছের বিভিন্ন বয়সের পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ নির্ধারণ বর্ণিত পদ্ধতিতে করার উদ্দেশ্য হ'ল পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল নামক আভ্যন্তরীণ শর্তটির প্রভাব কতখানি তা দেখা।

উপকরণ ও পদ্ধতি

প্রথমে বেড়াকল্মি গাছের বিভিন্ন বয়সের (অপরিণত, পরিণত, বৃদ্ধ) কয়েকটি ক'রে পাতা নিয়ে কর্ক-বোরারের সাহায্যে গোল-গোল ক'রে কাটা হ'ল। প্রতিটি বয়সের জন্য দশটি ক'রে এরূপ গোল পাতার টুকরো নিয়ে খলনুড়ির সাহায্যে থেঁতো ক'রে নেওয়া হ'ল এবং তাতে 5 মিলি. ইথাইল অ্যালকোহল দেওয়া হ'ল (চিত্র ১)। এরপর এই অ্যালকোহলে থেঁতো ক'রে পাতাকে
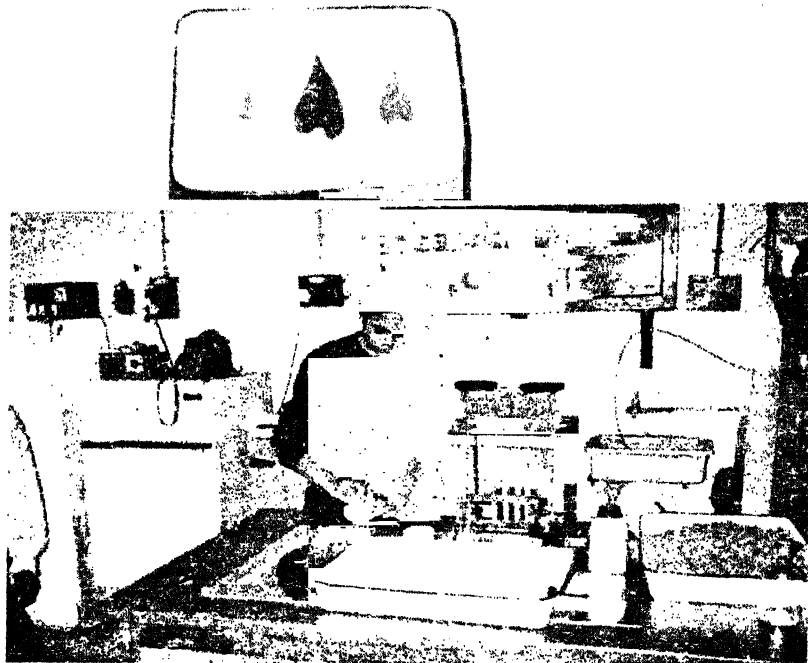
চিত্র ১. ক্লোরোফিল নিষ্কাশন পদ্ধতি

সেন্ট্রিফিউজ টিউবে রেখে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে ঘোরানো হয় যাতে ওই ক্লোরোফিলের নির্যাস থেকে অদ্রবীভূত বস্তুকণা আলাদা হ'ল (চিত্র ৩)। এইবার ক্লোরোফিলের পরিষ্কার সবুজ নির্যাস নিয়ে কলোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে (চিত্র ২) ক্লোরোফিলের পরিমাণ নির্ণয় করা হ'ল (তালিকা ১ এবং লেখচিত্র ১)।

ফলাফল

পাতার বয়স	অপটিক্যাল ডেনসিটি
অপরিণত	0.59
পরিণত	0.64
বৃদ্ধ	0.16
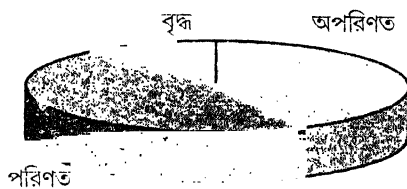
তালিকা ১

লেখচিত্র ১

চিত্র ২. কলোরিমিটার যন্ত্র

সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত পরীক্ষায় দেখতে পাই যে অপরিণত পাতার থেকে পরিণত পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ বেশি। এই কারণেই পরিণত পাতায় সালোকসংশ্লেষের হারও বেশি। আবার বৃদ্ধ পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ ভীষণ কম। ফলে এই বয়সের পাতায় সালোকসংশ্লেষের হারও বেশ কম। অর্থাৎ বেশি বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে পাতার খাদ্য তৈরি করার ক্ষমতাও যে কমে আসে তা হলুদ রঙ থেকেই অনুমান করা যায়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার এই প্রোজেক্টটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষাসত্রের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাভবনের বোটানি বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় রূপকুমার কর মহাশয় ও আমার সহপাঠিনীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

গ্রন্থপঞ্জী

জীবনবিজ্ঞান পরিচয় (নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য) - চৌধুরী, ভট্টাচার্য ও সাঁতরা।
উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা (প্রথম খণ্ড) - সান্যাল, চট্টোপাধ্যায়, দত্ত।
জীববিদ্যা (প্রথম খণ্ড) - গুহ, দাশগুপ্ত, সাঁতরা।

বিভিন্ন প্রজাতির ধানের ভৌত-গুণাগুণ

অহিবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

সংক্ষিপ্তসার

গ্রামের বিভিন্ন কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা দশটি জাতের ধান নেওয়া হয়। ১০০০ দানার ওজন, চালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও তাদের অনুপাত এবং সেদ্ধ চালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও তাদের অনুপাত নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্ত পাঠ থেকে জানা যায় ১০০০ দানার ওজন গোবিন্দভোগে ৭.৫০ গ্রাম থেকে লাল স্বর্ণ ও সিয়ান-৫৪০-এর ২৪ গ্রাম পর্যন্ত এবং গড় ওজন ১৮.৬০ গ্রাম, অনুরূপ ভাবে চালের গড় দৈর্ঘ্য ৬ মিলিমিটার, প্রস্থ ২.০৭ মিলিমিটার এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ছিল ২.৯৯। বিভিন্ন জাতের চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত বিভিন্ন। অপরপক্ষে সেদ্ধ চালের গড় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও তাদের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৭.০৬ মিলিমিটার, ২.০৭ মিলিমিটার এবং ২.৬১ মিলিমিটার। উক্ত জাতগুলির সম্যক পার্থক্য এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মানও নির্ণয় করা হয়।

ভূমিকা

কৃষক বাড়ির এবং বাজারের প্রয়োজন অনুসারে এবং ভূ-প্রকৃতি ও চাষ পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন জাতের ধানের চাষ করেন। প্রধানত ভাত, মুড়ি, চিড়া, পায়েস প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুতিতে বিভিন্ন জাতের ধানে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বাড়ির প্রয়োজন এবং অর্থের জন্য পণ্য হিসাবে কোন জাতের ধানের উপযোগিতা কিরকম হ'তে পারে, বিজ্ঞানভিত্তিক ভৌত গুণাগুণের পাঠ থেকে তা প্রাথমিকভাবে জানা সম্ভব নয়। সেজন্য স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত কিছু জাতের ধানের গুণাগুণ বিচারের উদ্দেশ্যে এই প্রোজেক্ট নির্বাচন করি।

কৃষকের নাম	গ্রামের নাম	জাতের নাম
১. অশোক মুখার্জি	ধানাই, পারুই (বীরভূম)	স্বর্ণ (লাল), আই.আর.০৩৬, পঙ্কজ
২. সুব্রত মুখার্জি	ধানাই, পারুই (বীরভূম)	খেজুর ছড়ি, সাদা মাসুরি, গোবিন্দভোগ, ভাসামানিক
৩. সুকুমার মুখার্জি	ধানাই, পারুই (বীরভূম)	বাসমতি, সিয়ান-৫৪০, মিনিকিট

তালিকা ১ : সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার ধান
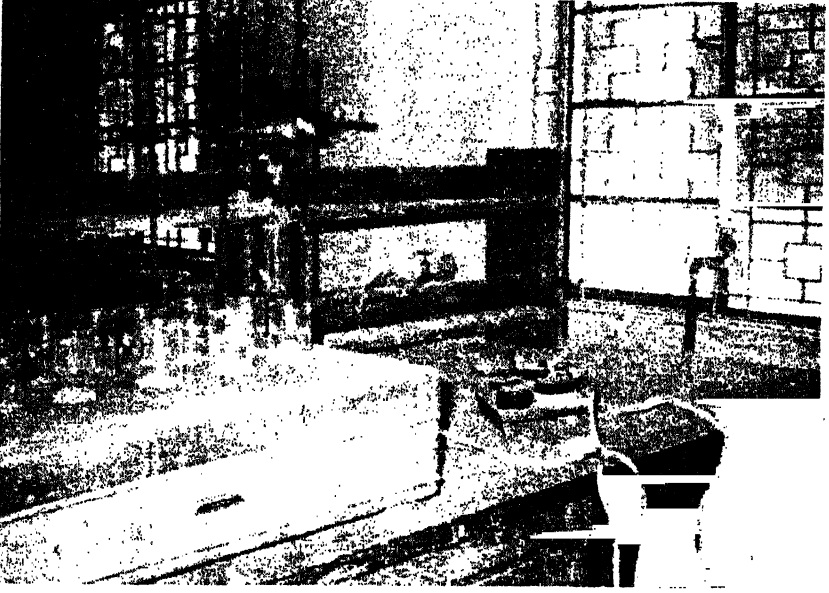
চিত্র ১. প্লেটচুল্লী

চিত্র ২. সেদ্ধ চালের পরিমাপ নির্ণয়

পাঠ পদ্ধতি

প্রতিটি জাতের ধানের ১০০০ দানার ওজন নেওয়ার জন্য ২০০টি পুষ্ট দানা পৃথকভাবে গণনা ক'রে ওজন নিয়ে ১০০০ দানার ওজনে রূপান্তরিত করা হয়। প্রতিটি জাতের ধানের পাঁচটি পুষ্ট দানা পৃথক ক'রে খোসা ছাড়িয়ে চালের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ সেন্টিমিটার স্কেলে মেপে চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থ-এর অনুপাত নির্ণয় করা হ'ল। আন্তর্জাতিক নিয়মে নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে চালগুলিকে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় (তালিকা ২)।
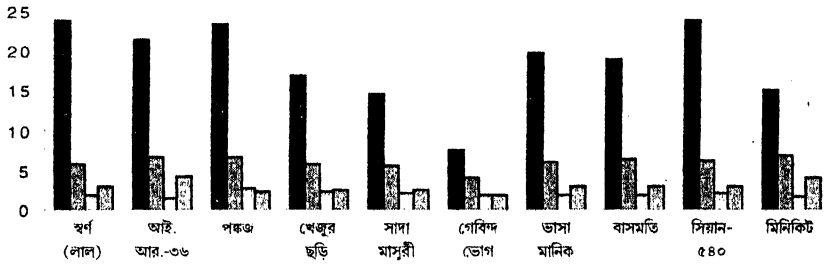
লেখচিত্র : ১, বিভিন্ন জাতের ধানের (চালের) ভৌত গুণাগুণ
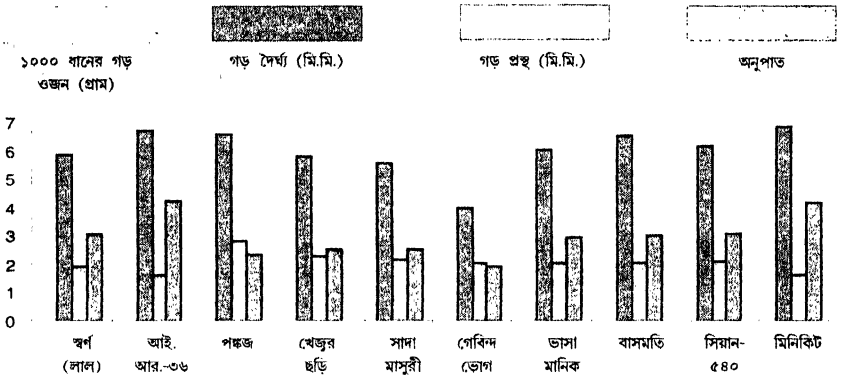
লেখচিত্র : ২, বিভিন্ন জাতের ধানের (সেদ্ধ চালের) ভৌত গুণাগুণ

উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতের চালগুলিকে ১০০ মিলিলিটারের বীকারে রেখে ৫০ মিলিলিটার ক'রে জল দিয়ে ০° - ৩০০° সেন্টিগ্রেড তাপ উৎপাদনকারী প্লেটচুল্লীতে সেদ্ধ ক'রতে দেওয়া হয় (চিত্র ১)। প্রতিটি ভাতের চালের জন্য পৃথক বীকার ব্যবহার করা হয়। সেদ্ধ হওয়ার পর ভাতগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সেন্টিমিটার স্কেলে মাপা হয় এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত নির্ণয় করা হয় (চিত্র ২)।

নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে :

১) $\bar{X}$ = Mean = গড় $\frac{\Sigma x}{N}$ যেখানে, Σ = যোগফল, N = পাঠের পরিমাপ, X = পাঠের মাপ

২) $SD = \sqrt{\frac{\Sigma(x-M)^2}{N}}$ যেখানে SD = Standard deviation (সমক পার্থক্য)
Σ = Summation (যোগফল), M = গড়, N = পাঠের সংখ্যা

৩) CV = Co-efficient of variation (সামগ্রিক পার্থক্য) = $\frac{SD}{Mean} \times 100$

ক্রমিক নং	চালের জাত	১০০০ ধানের গড় ওজন (গ্রাম)	চাল				সেদ্ধ চাল			
			গড় দৈর্ঘ্য	গড় প্রস্থ	অনুপাত	শ্রেণী	গড় দৈর্ঘ্য	গড় প্রস্থ	অনুপাত	শ্রেণী
১.	স্বর্ণ (লাল)	২৪.০০	৫.৮৬	১.৯২	৩.০৫	ছোট সরু	৬.৪০	২.২৪	২.৮৬	লম্বা মোটা
২.	আই. আর.-৩৬	২১.৫০	৬.৬৭	১.৬০	৪.২৩	লম্বা সরু	৭.৪৪	২.৮৪	৩.০০	লম্বা
৩.	পঙ্কজ	২৩.৫০	৬.৬০	২.৮২	২.৩৪	লম্বা মোটা	৬.৭৪	২.২২	৩.০৪	লম্বা সরু
৪.	খেজুর ছড়ি	১৭.০০	৫.৮০	২.৩০	২.৫২	ছোট মোটা	৬.৯৪	২.৬৮	২.৫৯	লম্বা মোটা
৫.	সাদা মাসুরি	১৪.৭৫	৫.৫৪	২.১৮	২.৫৪	ছোট মোটা	৫.৭২	২.৩৮	২.৪০	ছোট মোটা
৬.	গোবিন্দভোগ	৭.৫০	৪.০০	২.০৪	১.৯৬	মাঝারি সরু	৫.৩৮	২.১৬	২.৪৯	লম্বা মোটা
৭.	ভাসামানিক	১৯.৭৫	৬.০৪	২.০৪	২.৯৬	লম্বা মোটা	৬.৫২	২.৭২	৩.০০	লম্বা
৮.	বাসমতি	১৯.০০	৬.৫০	২.০৪	৩.০৪	লম্বা সরু	৭.৭৪	২.৮০	৩.৮৭	লম্বা
৯.	সিয়ান - ৫৪০	২৪.০০	৫.১৮	২.১০	৩.০৭	লম্বা সরু	৭.৬৪	২.১৬	৩.৫৪	লম্বা সরু
১০.	মিনিকিট	১৫.০০	৬.৮০	১.৬৪	৪.১৫	লম্বা সরু	৭.০৬	২.৭০	২.১৬	লম্বা সরু
Mean =	X =	১৮.৬০	৬.০০	২.০৭	২.৯৯		৬.৭৬	২.৩৭	২.৯৪	
SD =	σ =	৪.৯৬	০.৭৮	০.৩৩	০.৬৯		৬.৬৭	২.৩৭	২.৯৪	
CV	(%) =	২৬.৬৭	১৩.০০	১৫.৯৪	২৩.০৮		১০.৯৫	১০.৫৫	১৪.৯৯	

তালিকা ২ : বিভিন্ন প্রজাতির চাল ও সেদ্ধ ভাতের গড় মাপ

ফলাফল

পরীক্ষা-ভিত্তিক পাঠের ফলাফল তালিকা-২-এ দেওয়া হ'ল। তালিকায় চাল ও সেদ্ধ ভাতের গড় মাপ পরিবেশিত হ'য়েছে।

(ক) ১০০০ দানার গড় ওজন

তালিকার পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয় যে লাল স্বর্ণ ও সিয়ান ৫৪০ জাতের ওজন সর্বোচ্চ ও সমান এবং পঙ্কজ জাতের দানার ওজন এদের নিকটতম। গোবিন্দভোগ জাতের ধানের দানার ওজন সর্বনিম্ন যার পর সাদা মাসুরী, মিনিকিট, খেজুরছড়ি যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। জাতগুলি দানার গড় ওজনে উপরে র'য়েছে লাল স্বর্ণ, সিয়ান - ৫৪০, পঙ্কজ, আই.আর. ৩৬, ভাসামানিক এবং বাসমতি। সমগ্র জাতগুলির দানার ওজনের সম্যক পার্থক্যের মাত্রা ৪.৯৬ এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান ২৬.৬৭ শতাংশ।

(খ) চালের পরিমাপ হিসাবে পাঠ

১) চালের দৈর্ঘ্য : তালিকার পাঠ থেকে স্পষ্ট হয় যে মিনিকিট চালের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। যার পরে র'য়েছে যথাক্রমে আই.আর. ৩৬, পঙ্কজ, বাসমতি, সিয়ান-৫৪০ এবং ভাসামানিক। এগুলির দৈর্ঘ্য সব জাতগুলির গড় দৈর্ঘ্যের অপেক্ষা বেশি। পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের জাত হ'ল গোবিন্দভোগ, যার উপরে র'য়েছে সাদামাসুরী, খেজুর ছড়ি এবং লাল স্বর্ণ, এদের সমক পার্থক্যের মান ০.৭৮ এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান ১৩.০০ শতাংশ।

২) চালের প্রস্থ : তালিকার পাঠ থেকে জানা যায় পঙ্কজ জাতের চালের প্রস্থ সর্বাধিক, খেজুরছড়ি দ্বিতীয় এবং সাদামাসুরী তৃতীয়। এগুলির প্রস্থ সবজাতের চালের গড় প্রস্থের চেয়ে বেশি। আই.আর.-৩৬ জাতের চালের প্রস্থ সর্বনিম্ন। যার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে র'য়েছে যথাক্রমে মিনিকিট এবং লাল স্বর্ণ। সমস্ত জাতগুলির সম্যক পার্থক্যের মান ০.৩৩ এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান ১৫.৯৪ শতাংশ।

৩) চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত : পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে আই.আর.-৩৬ জাতের চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত সর্বাধিক। যার পর মিনিকিট, সিয়ান-৫৪০, লাল স্বর্ণ এবং বাসমতি। যারা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে র'য়েছে এবং সেগুলি সমস্ত জাতগুলির চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাতের গড় অপেক্ষা বেশি। সর্বনিম্ন অনুপাত লক্ষ্য করা যায় গোবিন্দভোগ জাতের চালে। জাতগুলির সমক পার্থক্য এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান হ'ল যথাক্রমে ০.৬৯ এবং ২৩.০৮ শতাংশ।

৪) চালের বাণিজ্যিক মান : জাতগুলির মধ্যে লম্বা-সরু গুণাগুণের চাল পাই আই.আর.-৩৬, মিনিকিট, সিয়ান-৫৪০ এবং বাসমতি। লম্বা মোটা চালের জাত ভাসামানিক এবং পঙ্কজ। মাঝারি-সরু চালের জাত হ'ল গোবিন্দভোগ। ছোট-মোটা চালের জাত সাদামাসুরী এবং খেজুরছড়ি। ছোট সরু চালের জাত লাল স্বর্ণ।

গ) সেদ্ধ চালের পরিমাপ হিসাবে পাঠ

১) সেদ্ধ চালের দৈর্ঘ্য : তালিকার পাঠ থেকে স্পষ্ট হয় যে বাসমতি চালের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। যার পরে র'য়েছে যথাক্রমে সিয়ান-৫৪০, আই.আর.-৩৬, মিনিকিট ও খেজুরছড়ি। এগুলির দৈর্ঘ্য সব জাতগুলির গড় দৈর্ঘ্যের চাইতে বেশি। পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের জাত গোবিন্দভোগ। যার উপরে রয়েছে সাদামাসুরী, লাল স্বর্ণ, ভাসামানিক এবং পঙ্কজ। এদের সম্যক পার্থক্যের মান ০.৭৪ এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান ১০.৯৫ শতাংশ।

২) সেদ্ধ চালের প্রস্থ : তালিকার পাঠ থেকে জানা যায় যে বাসমতি জাতের চালের প্রস্থ সর্বাধিক। যেখানে ভাসামানিক দ্বিতীয়, মিনিকিট তৃতীয়, খেজুরছড়ি চতুর্থ, আই.আর.-৩৬ এবং সাদামাসুরী ষষ্ঠ। এগুলির প্রস্থ সব জাতের চালের গড় প্রস্থের চেয়ে বেশি। গোবিন্দভোগ এবং সিয়ান-৫৪০ জাতের চালের প্রস্থ সর্বনিম্ন। যার পর পঙ্কজ এবং লাল স্বর্ণ র'য়েছে। সমগ্র জাতগুলির প্রস্থের সম্যক পার্থক্যের মান ০.২৫ এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান ১০.৫৫ শতাংশ।

৩) সেদ্ধ চালের অনুপাত : পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাসমতি চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত সর্বাধিক। যার পর সিয়ান-৫৪০ দ্বিতীয়, পঙ্কজ তৃতীয় এবং আই.আর.-৩৬ চতুর্থ স্থানে র'য়েছে এবং এগুলি সমগ্র জাতগুলির চালের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাতের গড় অপেক্ষা বেশি। সর্বনিম্ন অনুপাত লক্ষ্য করা যায় সাদামাসুরী জাতের চালে। জাতগুলির সম্যক পার্থক্য এবং সামগ্রিক পার্থক্যের মান যথাক্রমে ০.৪৪ এবং ১৪.৯৭ শতাংশ।

৪) চালের বাণিজ্যিক মান : জাতগুলির মধ্যে "লম্বা-সরু" চাল পাই, পঙ্কজ, বাসমতি, সিয়ান-৫৪০ এবং মিনিকিট থেকে। "লম্বা-মোটা" চালের জাত হ'ল স্বর্ণ, খেজুরছড়ি, গোবিন্দভোগ এবং ভাসামানিক। "লম্বা" জাতের চাল পাই আই.আর.-৩৬ থেকে।

বাণিজ্যিক মান হিসাবে লক্ষ্য করা যায় ভাসামানিক, বাসমতি, সিয়ান-৫৪০ এবং মিনিকিট জাতগুলির আতপ ও সেদ্ধ অবস্থায় "লম্বা-সরু" মান এবং সাদামাসুরীর "ছোট মোটা" মান বজায় ছিল। সুতরাং ভাত হিসাবে এদের উৎকর্ষ যথেষ্ট। পক্ষান্তরে লালস্বর্ণ জাতের চাল "ছোট সরু" হ'লে ও এর ভাত হ'য়েছে "লম্বা মোটা"। আই.আর.-৩৬-এর "লম্বা-সরু" চাল থেকে 'লম্বা' ভাত। পঙ্কজ ও খেজুরছড়ি জাতের চাল "লম্বা ও ছোট মোটা" হ'লেও ভাত হ'য়েছে "লম্বা-সরু ও লম্বা-সরু" এবং গোবিন্দভোগ জাতের চাল "মাঝারি সরু" হ'তে ভাত হ'য়েছে "লম্বা মোটা"। সুতরাং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাসমতি, সিয়ান-৫৪০, মিনিকিট, পঙ্কজ, আই.আর.-৩৬ এবং ভাসামানিক জাতের চাল ভাত তৈরির জন্য প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরে খেজুরছড়ি এবং লাল স্বর্ণ। তৃতীয় শ্রেণীতে পরে সাদামাসুরী এবং ভাত হিসাবে গোবিন্দভোগ-এর মান মাঝারি হ'লেও এটি সুগন্ধি ও আঠালো হওয়ার জন্য পায়েস হিসাবে এর মান সর্বোচ্চ। এছাড়া স্বর্ণ (লাল), খেজুরছড়ি এবং সাদামাসুরী চিড়ে, মুড়ি, খৈ-এর জন্য শ্রেষ্ঠ। সেদ্ধ পঙ্কজ চাল আঠালো হওয়ার জন্য পিঠে, ইড়লি প্রভৃতি তৈরির পক্ষে উপযোগী।

লাল স্বর্ণ ও সাদামাসুরী ভাত "লম্বা মোটা" ও "ছোট মোটা" ভাত হওয়ার জন্য বাসি বা পান্থ হিসাবে আদিবাসীদের ও দিনমজুরদের কাছে বিশেষভাবে উপযোগী। সুগন্ধির জন্য বাসমতি চালের পায়েস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাবার তৈরির জন্য উত্তম। এছাড়া গোবিন্দভোগ, ভাসামানিক, বাসমতি, সিয়ান-৫৪০ ও মিনিকিট চাল ঘি-ভাত, মাংস ভাত (পোলাও) প্রভৃতি উপাদেয় সেদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতিতে উত্তম। সুতরাং তাদের বাণিজ্যিক মূল্যমানও অধিক। সাধারণভাবে "লম্বা সরু" জাতের চাল আতপ এবং সেদ্ধ চাল হিসাবে সমাজে মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালীদের দৈনন্দিন প্রধান খাবারের উপযোগী। এগুলির আতপ বা সেদ্ধ চাল থেকে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে এবং কম জ্বালানীতে ভাত প্রস্তুত হয় ব'লে এদের বাণিজ্যিক মূল্যও বেশি।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রোজেক্টটি করতে আমি বিভিন্ন দিক থেকে অনেক জ্ঞানের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি। পল্লী-শিক্ষা-ভবনের শস্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গোপালচন্দ্র দে মহাশয়ের উপদেশ ও সুপারিশ অনুক্রমে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে হতে দশটি জাতের ধান সংগ্রহ করি।

ছাগদুগ্ধে প্রোটিনের পরিমাণ

সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (২০০০)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

উদ্দেশ্য

আমি লক্ষ্য ক'রেছি যে, জন্মের প্রথম দিন থেকেই শিশুরা অন্য কোনো খাবার না খেয়েও শুধুমাত্র দুধ পান করেই সুস্থ সবল অবস্থায় বেঁচে থাকে। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে দুধে এমন কি উপাদান আছে যার জন্য শিশুর অন্য কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়ার কোনো উপায় তখন ছিল না। তাই দশম শ্রেণীতে উঠে প্রোজেক্ট হিসাবে আমি এই কাজটাই বেছে নিলাম। সময়ের অভাবের জন্য আমি এখানে শুধু দুধের মধ্যস্থিত প্রোটিনের পরিমাণ নির্ণয় ক'রেছি। এর জন্য আমি বেছে নিয়েছি ছাগলের দুধ যা আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত দুধগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভূমিকা

Protein-শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ প্রোটিয়ম থেকে যার অর্থ প্রথম। প্রোটিন হল আমাদের শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মৌল উপাদান। প্রোটিন অণু অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধানত ২০ রকম অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে সবরকম প্রোটিনঅণু গঠিত হয়। এর মধ্যে ১০টি আমাদের দেহের মধ্যে সংশ্লেষিত হ'তে পারে। কিন্তু আর ১০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড সেভাবে সংশ্লেষিত হ'তে পারে না। খাদ্যের মাধ্যমে এগুলির সরবরাহ বজায় রাখতে হয়। প্রোটিন অণু গঠিত হবার সময় দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, পেপটাইড বণ্ড দ্বারা যুক্ত হয়। এর ফলে এক অণু জল (H_2O) বেরিয়ে যায়।

দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং কোষ গঠন হ'ল প্রোটিনের প্রধান কাজ। এছাড়া দেহের তাপশক্তি উৎপাদন, দেহস্থ উৎসেচক, হরমোন ইত্যাদি সৃষ্টি করা এবং দেহের অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করা ইত্যাদি কাজও প্রোটিন ক'রে থাকে।

তাপন মূল্য

এক গ্রাম প্রোটিন দহন হ'লে 4.3 Kcal তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রত্যহ প্রায় ১০০-১৫০ গ্রাম প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এখানে আমি Lowry Method-এ দুধ মধ্যস্থ প্রোটিনের পরিমাণ নির্ণয় ক'রেছি। Tryptophan এবং Tyrosine এই দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য Lowry Method-এ রঙ সৃষ্টি হওয়ার ফলে পরিমাপের জন্য সনাক্ত ক'রতে সুবিধা হয়।

প্রয়োজনীয় উপাদান ও পরীক্ষাপদ্ধতি

ছাগলের দুধ, ডিস্টিল ওয়াটার (Distilled water), কপার রি-এজেন্ট (Coper reagent), ফলিন ফেনল রি-এজেন্ট (Folinphenol reagent), পাঁচটি টেস্ট টিউব, বিকার এবং পিপেট।

প্রথমে পাঁচটি টেস্ট টিউবকে Distilled water-এ ভালো ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে ব্লটিং পেপারের উপর কিছুক্ষণ উপুড় ক'রে রাখা হ'ল যাতে ভেতরের সমস্ত জল বেরিয়ে যায়।

এরপর টেস্ট টিউবগুলিকে স্ট্যান্ডের উপর রেখে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত ক'রে নেওয়া হ'ল। ১ এবং ২নং টেস্ট টিউব দুটি হ'ল Blank অর্থাৎ এই দুটিতে কোনো প্রোটিন নেই। এই দুটিতে 500μl Distilled water নেওয়া হ'ল, ৩নং টেস্ট টিউব হ'ল Standard, এতে 400μl Distilled water এবং 20μl প্রোটিন নেওয়া হ'ল। ৪নং এবং ৫নং টেস্ট টিউব দুটিতে ও 480 ml জল নেওয়া হ'ল কিন্তু এখানে 20μl প্রোটিনের বদলে 20μl ছাগলের দুধ নেওয়া হ'ল। তারপর প্রতিটি টেস্ট টিউবেই 5 ml ক'রে Copper reagent দিয়ে দশ মিনিট রেখে দেওয়া হ'ল। দশ মিনিট পর আবার প্রতিটি টেস্ট টিউবেই 2 : 1 অনুপাতে Distilled water এবং Folinephenol reagentএর মিশ্রণ 500μl ক'রে দিয়ে আবার দশ মিনিট অপেক্ষা করা হ'ল। এভাবে প্রতিটি টেস্ট টিউবের মধ্যস্থিত তরলের পরিমাণ 6ml ক'রে নেওয়া হ'ল। [1 ml = 1000μl]

Number of test tube	Distilled water (in μl)	Sample (in μl)	Copper reagent in μl)	Folinphenol reagent (in μl)
1	500 μl	-	5 ml	500 μl
2	500 μl	-	5 ml	500 μl
3	480 μl	20 μl (protein)	5 ml	500 μl
4	480 μl	20 μl (milk)	5 ml	500 μl
5	480 μl	20 μl (milk)	5 ml	500 μl

তালিকা ১ : পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত নমুনাসমূহ।

পর্যবেক্ষণ

Folinphenol reagent দেওয়ার পর Blank টিউবদুটিতে খুব হাল্কা নীল, Standard টিউবটিতে অপেক্ষাকৃত গাঢ় নীল এবং ৪, ৫ টিউবদুটিতে ঘন নীল রঙ পাওয়া গেল। তারপর উক্ত টেস্ট টিউবগুলিকে কলোরিমিটার যন্ত্র দিয়ে বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হল। কলোরিমিটার চালু ক'রলেই যে Reading পাওয়া গেল, তা ঐ Blank টিউব দুটি দিয়ে শূন্য ক'রে নেওয়া হ'ল। এবার 660 nm দিয়ে (660 nm নীল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপা হয়)। একে-একে Standard এবং ৪, ৫ টিউবগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপা হ'ল। দেখা গেল Standard টিউবটিতে Reading 0.053 nm এবং ৪ ও ৫ নং টিউব দুটির Reading যথাক্রমে 1.504 nm এবং 1.1 nm হ'য়েছে।

যেহেতু আমরা জানি যে Standard টিউবটিতে কত প্রোটিন আছে তাই এর থেকে ঐকিক

নিয়মের সাহায্যে সহজেই ৪ ও ৫ নং টিউব দুটির মধ্যস্থিত প্রোটিনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

নিম্নে হিসেবটি দেখানো হ'ল

[৪ ও ৫ নম্বর টেস্ট টিউবের রিডিং-এর একটি গড় নেওয়া হ'ল যার মান 1.302 nm।]

Reading যখন 0.035 nm তখন টিউবে প্রোটিন আছে 20 μg

অতএব Reading যখন 1.302 nm তখন টিউবে প্রোটিন আছে 491 μg

[যেহেতু 1000 μl = 1 ml / 1000 μg = 1 mg]

৩ নং টিউবে প্রোটিনের পরিমাণ 20 μg হ'লে ৪ ও ৫ টিউবে প্রোটিন আছে 491 μg

অতএব

৩ নং টিউবে প্রোটিনের পরিমাণ 1 μg হলে ৪ ও ৫ টিউবে প্রোটিন আছে $\frac{419}{10}$

অতএব

৩ নং টিউবে প্রোটিনের পরিমাণ 1000 μg হলে ৪ ও ৫ টিউবে প্রোটিন আছে $\frac{419 \times 1000}{10}$

$= 49100\ \mu g$

$= 49.1\ mg / ml$

সিদ্ধান্ত

পরীক্ষাটি থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম যে প্রতি 1 ml ছাগলের দুধে 49.1 mg প্রোটিন আছে।

সময়ের অভাবের জন্য আমি ছাগলের দুধে ফ্যাট, ভিটামিন ইত্যাদি উপাদানগুলি নির্ণয় ক'রতে পারি নি। আমার পরবর্তী সহপাঠীদের এ-বিষয়ে কাজ করার সুযোগ রইল।

সাবধানতা

জল ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থগুলি যাতে মুখে-চোখে লেগে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতি সাবধানে টেস্টটিউবে রাসায়নিকগুলি ঢালতে হবে যাতে কোনো কিছু বেশি পরিমাণ প'ড়ে না যায়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমি আমার এই প্রোজেক্টটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের গবেষিকা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আমার বাবার কাছে কৃতজ্ঞ। এঁদের সাহায্য ছাড়া আমি কখনোই আমার এই কাজে সাফল্য লাভ ক'রতে পারতাম না। তাই আমি সর্বতোভাবে এঁদের কাছে ঋণী।

গ্রন্থপঞ্জী

জীবনবিজ্ঞান পরিচয় - চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য ও সাঁতরা

মনোরমা ইয়ার বুক

কিশোর এনসাইক্লোপিডিয়া

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান - সুরধীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন রথ

মাশরুম চাষ : ঘরোয়া পদ্ধতি

মণিকণা রায় (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

মাশরুম ইংরেজী শব্দ। বাংলায় একে ব্যাঙের ছাতা, কোড়ক বা পোয়াল ছাতু বলে। মাশরুমের অনেক প্রকার জাত আছে। যে ছাতু বা ছাতা ভোজ্য তাকেই ভোজ্য ছত্রাক বলে।

পৃথিবীর সর্বত্র ভোজ্য ছত্রাকের চাহিদা আছে। যদিও অতীতে ভারতীয়, গ্রীক ও রোমানরা ভোজ্য ছত্রাকের ব্যবহার জানত তবে বর্তমানে এর ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভোজ্য ছত্রাকের চাষ বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয় এবং একে সব্জি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যে কোনো সব্জির চেয়ে ভোজ্য ছত্রাকের খাদ্যগুণ অনেক বেশী। ভোজ্য ছত্রাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্যগুণ আছে তাছাড়া সহজপাচ্য এবং খেতে খুবই সুস্বাদু। ঠিকমতো রান্না করলে ছত্রাক খেতে মাংসের মত হয়। হাড় ও দাঁতের গঠন, রক্তাল্পতা, স্কার্ভি, বহুমূত্র রোগ এবং হৃদরোগে বিশেষভাবে উপযোগী।

তিন প্রকার সহজলভ্য ভোজ্য ছত্রাক

১। পোয়াল ছাতু (*Volvarieli Valvacia*) এটি এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মোটামুটিভাবে ৩০°-৪৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পাহাড়ী এলাকা বাদে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

২। বোতাম ছাতু (*Agricus*) - এই প্রজাতিটি মোটামুটি ২°-০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জন্মায় ব'লে সাধারণত পাহাড়ী এলাকাতেই এই জাতীয় মাশরুম চাষের আধিক্য দেখা যায়।

৩। ধিংড়ি ছাতু বা ঝিনুক ছাতু (*Pleurotus Flatellatus*) - মোটামুটি ২০°-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অক্টোবর থেকে মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র এই প্রজাতির চাষ করা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও ভোজ্য ছত্রাকের আরও জাত আছে। আমি এই ঝিনুক ছাতু বা Pleurotus Flatellatus জাতীয় ভোজ্য ছত্রাকের চাষ ক'রেছি (চিত্র. ১-৩)।

উদ্দেশ্য

হিসেব ক'রলে দেখা যায় ভোজ্য ছত্রাক ঠিকমতো চাষ ক'রে ব্যবসায়ের কাজে লাগাতে পারলে প্রায় ১০০%এরও বেশী লাভ হয়। ভারতবর্ষে দিনের পর দিন বেকারদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তারা যদি উৎসাহী হ'য়ে একাজে এগিয়ে আসেন তাহ'লে তারা খুবই উপকৃত হবেন তা আশা করা যায়। তাছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। তারা যদি বাড়ীতে সহজ উপায়ে এই সহজলভ্য সব্জিটির চাষ করেন তাহ'লে খুবই উপকৃত হবেন, কারণ তারা এই দিয়ে ব্যবসাও

ক'রতে পারেন, আবার এই সস্তার পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ক'রে শক্তি সঞ্চয়ও ক'রতে পারেন। এছাড়াও ভারতবর্ষের অনেক মানুষ নিরামিষাশী। তাই আমিষ জাতীয় খাদ্যগুণ তাদের শরীর পায় না, সেক্ষেত্রে তারা যদি ভোজ্য ছত্রাক ব্যবহার করেন তাহ'লে খুবই উপকৃত হবেন, কারণ ভোজ্য ছত্রাকে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি একাধিক খাদ্যগুণ বর্তমান। এজন্য আমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভোজ্য ছত্রাকের চাষ করা দুঃসাধ্য কিনা এবং এই চাষ লাভজনক কিনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য উপস্থিত প্রোজেক্টটি হাতে নিয়েছি। এইভাবে যদি সারাদেশে ব্যাপক ভাবে মাশরুম চাষ হ'তে দেখা যায় তাহ'লে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

উপকরণ

১। পরিমাণ মত বীজ (২০০ গ্রাম), ২। আধ ইঞ্চি-এক ইঞ্চি ক'রে কাটা খড় ২ কিগ্রা., ৩। খড় ভেজানোর জন্য দুটি পাত্র, ৪। পরিষ্কার জল, ৫। চালুনি, ৬। দুটি কালো পলিথিন (4x4) ইঞ্চি, ৭। দুটি নাইলনের ব্যাগ

চাষের পদ্ধতি

ভোজ্য ছত্রাকে সবুজ কণা থাকে না ব'লে এর চাষে সূর্যকিরণের দরকার হয় না। সেইজন্য ঘরের ভিতর এর চাষ করা যায়। ভোজ্য ছত্রাকের বীজ পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়। আমি এই বীজ ভোজ্য ছত্রাক উৎপাদন কেন্দ্র, উদ্ভিদ সুরক্ষা বিভাগ, পল্লীশিক্ষাভবন, বিশ্বভারতী থেকে সংগ্রহ ক'রে যেভাবে চাষ ক'রেছি তা নিম্নরূপ :

প্রথম দিন আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি ক'রে কাটা ২ কি.গ্রা. খড়কে জলে কয়েকবার ধুয়ে ওই খড়গুলিকে জলে ভিজিয়ে দিলাম, ২৪ ঘণ্টা বা তারও বেশীক্ষণের জন্য। পরের দিন ভিজে খড়গুলিকে তুলে একটি চালুনিতে রেখে, ছায়াযুক্ত স্থানে কিছুক্ষণের জন্য রাখলাম, যাতে খড়ের বাড়তি জল ঝ'রে যায়। এখন কালো পলিথিন দুটি ও নাইলনের ব্যাগদুটিকে ভালো ক'রে পরিষ্কার ক'রলাম যাতে ধুলো বা ময়লা লেগে না থাকে তারপর একটি পলিথিনের উপর ঐ ভেজানো খড় সমান দুভাগে ভাগ ক'রে রাখলাম। জল ঝ'রে গেলে ঐ দুভাগকে আবার চারটি ক'রে ভাগ ক'রে মোট আটটি ভাগ করলাম।

চিত্র ১. ছত্রাক চাষের বেড প্রস্তুতি

এই চাষের উপকরণাদির ভাগমাপগুলি হ'ল এইরকম : প্রতি ১০ কি.গ্রা. খড়ে ২০০ গ্রাম ক'রে সুপার ফসফেট ও ছোলার ডালের বেসন। যেহেতু আমি ২০ কি.গ্রা. খড় নিয়েছি সেজন্য ৪০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৪০ গ্রাম বেসন নিয়েছি।

এখন ঐ সুপার ফসফেট ও বেসনের মিশ্রণ প্রথমে সমান দুটি ও পরে ঐ দুটি ভাগকে পুনরায় তিন ভাগে ভাগ ক'রে অর্থাৎ মোট সমান ৬টি ভাগে ভাগ ক'রে একটি পরিষ্কার খবরের কাগজের উপর রাখলাম। ২০০ গ্রাম বীজকেও একইভাবে ৬ ভাগে সমান ভাগ ক'রে কাগজের উপর রাখলাম। তারপর একটি নাইলনের ব্যাগের মধ্যে একভাগ খড় সমান ক'রে বিছিয়ে দিলাম। এবার ঐ খড়ের মধ্যাংশ বাদ দিয়ে এবং ব্যাগের গা থেকে দেড়ইঞ্চি ছেড়ে বৃত্তাকারে একভাগ সুপার ফসফেট ও একভাগ বেসন ছড়িয়ে একটু-একটু ক'রে আঙুলের সাহায্যে নাড়িয়ে দিলাম যাতে দুটি মিশে যায় এরপর একভাগ বীজ ছড়িয়ে দিলাম। এইভাবে তিন স্তর করার পর খড়ের চতুর্থ ভাগটি বিছিয়ে দিয়ে ব্যাগটিকে একটি কালো পলিথিন দিয়ে মুড়ে সুতলী দড়ির সাহায্যে ভালো ক'রে বেঁধে দিলাম। অনুরূপভাবেই আরও একটি ব্যাগকেও খড়, সুপার ফসফেট, বীজ এ-সব দিয়ে ভর্তি ক'রে কালো পলিথিন মুড়লাম। এইভাবে দুটি বেড প্রস্তুত হ'ল। এবার ঐ পলিথিন মুড়ে ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম (চিত্র ২)।

চিত্র ২. ঘরে রাখা অবস্থায় পলিথিন বেড

এক সপ্তাহ পর বেড দুটি খুলে দেখলাম যে খড়ের উপর সাদা সাদা ছাতা প'ড়ে গিয়েছে এবং খড়গুলি চাপ বেঁধে গেছে। ঐ দিন বেড দুটি পরিষ্কার খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখলাম। এই দিন থেকে প্রতিদিন বেড দুটিতে ৩ থেকে ৪ বার ক'রে হাত দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে জল দিতে লাগলাম। প্রতিদিন জল দেবার পর বেডগুলিতে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রেখে দিলাম। এইভাবে ১৫ দিন পর বেডগুলিতে ছোট-ছোট ছত্রাক হ'য়ে ফুটতে লাগল। আগের মতই প্রতিদিন জল এবং খবরের কাগজ দিয়ে বেডগুলিকে ঢেকে দিতে থাকলাম। এর চার থেকে পাঁচদিন পরে দেখা গেল ছত্রাকগুলি বড় হ'য়েছে সেইসঙ্গে ব্যাগের চারিদিকেই ছত্রাক ফুটেছে। কয়েকটি

ছত্রাক আবার ব্যাগ ফুটে বাইরের দিকেও বেরিয়েছে (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩. উৎপন্ন ছত্রাক

উৎপন্ন ছত্রাকগুলির মধ্যে প্রথম বেড থেকে ১০টি ও দ্বিতীয় বেড থেকে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ছত্রাক তুলে ওজন করলাম। ইতিমধ্যে যে ছত্রাকগুলি ছোট ছিল সেগুলি দু'দিন পর বড় হ'য়েছে। তাই দু'দিন পরের বড় ছত্রাকগুলির ১ম বেড থেকে ৬টি ও ২য় বেড থেকে ৮টি ছত্রাক তুলে ওজন করলাম (সারণী ১ ও ২)।

তুলনামূলকভাবে যেগুলি ছোট ছিল পরদিন সেগুলি বেড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ১ম বেড থেকে ৮টি ও ২য় বেড থেকে ৪টি ছত্রাক তুলে ওজন করলাম (সারণী ১ ও ২)।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

তারিখ	ছত্রাকের সংখ্যা	ওজন
১৭. ১. ৯৯	১০	১৩০ গ্রাম
১৯. ১. ৯৯	৬	৭০ গ্রাম
২০. ১. ৯৯	৮	১০০ গ্রাম
মোট	২৪	৩০০ গ্রাম

সারণী ১. ১ম বেডের মোট উৎপাদিত ছত্রাক

তারিখ	ছত্রাকের সংখ্যা	ওজন
১৭. ১. ৯৯	৮	১৮০ গ্রাম
১৯. ১. ৯৯	৮	১১০ গ্রাম
২০. ১. ৯৯	৪	৪০ গ্রাম
মোট	২০	৩৩০ গ্রাম

সারণী ২. ২য় বেডের মোট উৎপাদিত ছত্রাক

দুটি বেডে মোট উৎপাদিত ছত্রাকের পরিমাণ ৬৩০ গ্রাম। অতএব মাশরুম চাষের গুরুত্ব বিচার ক'রলে সহজেইবোঝা যায় যে ভোজ্য ছত্রাক উৎপাদন বেশ লাভজনক। নিম্নের সারণী থেকে এই চাষের অর্থনৈতিক লাভ আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

উপকরণ	খরচ
খড় ২ কি.গ্রা. (১৬ আঁটি বা ৪ গণ্ডা)	টা: ৪.০০ (১ টাকা গণ্ডা হিসাবে)
ছত্রাক বীজ ২০০ গ্রাম	টা: ৭.০০
সুপার ফসফেট ৪০ গ্রাম	টা: ০.২০
ছোলার বেসন ৪০ গ্রাম	টা: ০.৮০
দুটি নাইলনের ব্যাগ	টা: ৮.০০
মোট খরচ	টা: ২০.০০

সারণী ৩. চাষের উপকরণ ও খরচাদি

আমার,
মোট উৎপাদিত (দুটি বেডে) ছত্রাক = ৬৩০ গ্রাম
ছত্রাকে উপস্থিত বাজার দর

১০০০ গ্রামের দাম ৮০ টাকা

১ গ্রামের দাম $\frac{৮০}{১০০০}$ টাকা

অতএব, ৬৩০ গ্রামের দাম = ৮০ × $\frac{৬৩০}{১০০০}$ টাকা

= $\frac{২৫২}{৫}$ অর্থাৎ ৫০.৪ টাকা

সুতরাং লাভের অঙ্ক দাঁড়াল টা: ৫০.৪ - ২০.০ = টা: ৩০.৪

সাবধানতা

১। বেডের খড় যেন সব সময় ভিজে থাকে।

২। বেডের চারদিকে B.H.C. ১০% ছড়িয়ে রাখলে ভালো হয় নইলে পিঁপড়েতে বেডের ক্ষতি ক'রতে পারে। তবে B.H.C. যেন বেডের ওপর না পড়ে।

৩। বেড সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৪। সমস্ত বেডটি যেন রোদ্দুর না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। ছত্রাক বীজ (Spawn) যেন নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়। অন্যথায় বিষাক্ত ছত্রাক জন্মাতে পারে।

৬। বেডের বা ঘরের তাপমাত্রা যেন ২০° - ৩০° সেলসিয়াস থাকে।

বিষাক্ত ছত্রাক চেনার উপায়

১। বিষাক্ত ছত্রাক ঈষদুষ্ণ গরম জলে রেখে রুপোর চামচ ডোবালে চামচের ওপর কালো আস্তরণ পড়ে।

২। আমাদের দেশের আদিবাসীরা মুরগী দিয়ে বিষাক্ত ছত্রাক সনাক্ত করে। মুরগী বিষাক্ত ছত্রাক খায় না।

৩। উজ্জ্বল, তিক্ত স্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত ছত্রাক বিষাক্ত। বিষাক্ত ছত্রাকে দুধ ফেটে বা জমে যায়।

৪। বিষাক্ত ছত্রাক খেলে গা বমি বমি, তলপেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা বা বেশী ঘামঝরা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

৫। বিষাক্ত ছত্রাকের কাণ্ড বা ডাঁটি সাধারণত কালো রঙের হয়।

ভোজ্য ছত্রাক সংরক্ষণের উপায়

ভোজ্য ছত্রাক শুকিয়ে নিয়ে যত্ন ক'রে রেখে দিলে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চয় করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

আমি এই প্রেজেক্টটি ক'রতে গিয়ে ১৯৯৬ - ৯৭ এর পরীক্ষার্থী অয়ন রায় ও মণিদীপা রায়-এর প্রোজেক্টগুলি থেকে সাহায্য নিয়েছি।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রোজেক্টটি সম্পন্ন ক'রতে আমাদের শিক্ষক অম্বুজদা ও ঈপ্সাদি আমায় খুব সাহায্য ক'রেছেন। তাছাড়া আমাদের শিক্ষাসত্রের বর্তমান জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষাগারের সহযোগী অসিতদা ও পূর্বতন সহযোগী সাক্ষীদা আমাকে এ ব্যাপারে খুব সাহায্য ক'রেছেন। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

টমেটো পাকাতে ইথ্‌রলের ভূমিকা

রাজীব আহামেদ (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

টমেটো ফল চূড়ান্ত পাকা অবস্থায় তুললে তা বেশী দিন রাখা যায় না। ফল পাকার সঙ্গে-সঙ্গে টমেটোকে স্যালাড, চাটনি, বিভিন্ন ধরনের সস্‌ বা কেচাপ হিসাবে ব্যবহার ক'রে থাকি। সাধারণ ঘরের উষ্ণতায় টমেটো ফলকে দু-তিন দিনের বেশী রাখা যায় না। আবার যখন চাষীদের টমেটো ফল দূরের বাজারে বিক্রয় ক'রতে হয় তাহ'লে পরিবহনের সময় প'চে নষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্য টমেটো ফল সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাওয়ার পর এবং পেকে যাওয়ার আগে তুলে নিয়ে যদি তাকে কোনও কৃত্রিম উপায়ে পাকানোর ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে ঐ ধরনের সমস্যাগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে।

পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে যেকোনও ফল পাকার পদ্ধতি একটি উদ্ভিদ হরমোনের উপর নির্ভর করে। যেমন ফলের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হ'লে এর কোষের মধ্যে ইথিলিন উৎপন্ন হয় এবং এই ইথিলিন হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তবেই ফলটি পাকতে শুরু করে। ইথিলিন রাসায়নিকগতভাবে একটি অসম্পৃক্ত (Unsaturated) গ্যাস। যেহেতু এটি একটি গ্যাস সেহেতু কৃত্রিম উপায়ে গাছে ইথিলিন প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক। ইথ্‌রেল (Ethrel) হ'চ্ছে একটি রাসায়নিক পদার্থ যা জলে দ্রবণীয় অবস্থায় ধীরে-ধীরে ইথিলিন গ্যাস নির্গত হ'তে থাকে। এই কারণে ইথ্‌রেল যদি ফল বা গাছের ভূমির উপরে যে কোনো অংশে প্রয়োগ করা হয় তাহ'লে এই গ্যাস ধীরে-ধীরে কোষের ভিতরে প্রবেশ ক'রতে পারে।

এই জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পটি করা হ'য়েছে যাতে সঠিক পরিমাণ ইথ্‌রেল প্রয়োগ ক'রে পরিপুষ্ট অথচ কাঁচা টমেটোকে পাকানো যায় তা দেখা।

উপকরণ ও পদ্ধতি

টমেটো, ইথিলিন, তিনটি বিকার, তুলাদণ্ড, গ্লাসরড. পিপেট, ছুরি, রিফ্র্যাক্টোমিটার। এই উপকরণগুলির সাহায্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রকল্পটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করা হ'য়েছে। কাঁচা ফলগুলিকে প্রথমে তিন ভাগে ভাগ ক'রে খুব ভালো ক'রে বেছে নেওয়া হ'ল যাতে কোন রকম দাগ বা রোগ না থাকে। ইথ্‌রেল তরল রাসায়নিক পদার্থ এবং অতি সহজেই জলে দ্রবণীয়। দুটি মাত্রায় (৫০ পি.পি.এম এবং ১০০ পি.পি.এম), ইথ্‌রেলের দ্রবণ নিম্নলিখিত উপায়ে তৈরী করা হ'ল। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইথ্‌রেল পিপেটের সাহায্যে তুলে বিকারের মধ্যে আধ লিটার জলের মধ্যে দিয়ে কাচের দণ্ডের সাহায্যে ভালো ভাবে মিশিয়ে নেওয়া হ'ল। তৃতীয় একটি বিকারে সাধারণ জল নেওয়া হ'ল ইথ্‌রেলের প্রভাব তুলনা করার জন্য। প্রতি ভাগ টমেটো

ফলগুলি তিনটি বিকারে ইথ্রল-মিশ্রিত জলের মধ্যে এমনভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল; যাতে ফলগুলি সম্পূর্ণভাবে জলের ভিতরে থাকে। এই অবস্থায় ফলগুলিকে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হ'ল। ৩০ মিনিট পরে ফলগুলিকে জল থেকে তুলে প্রথমে খবরের কাগজের উপরে গড়িয়ে নিয়ে ফলের বাইরে যেসব জলকণা লেগেছিল তা শুকিয়ে নেওয়া হ'ল। তারপর ফলগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট ভাগ অনুযায়ী আলাদা-আলাদা লেবেল দিয়ে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হ'ল। এরপর বিভিন্ন সময়ে ফলগুলির উপর নানান পর্যবেক্ষণ করা হ'ল।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

ফলের রঙ, নরম-শক্ত, পচন ও ওজন ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হ'ল। প্রতিদিন (১ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত) পর্যবেক্ষণের পর ফলগুলিকে তাদের ভাগ অনুযায়ী সাজিয়ে ছবি তোলা হ'ল (চিত্র ১)। ২১.১.৯৯ তারিখে দেখা হ'ল কোন্ ভাগে কতগুলি ফল সম্পূর্ণভাবে পেকে গেছে ও পচন শুরু হ'য়ে গেছে। সমস্ত পর্যবেক্ষণের পর প্রত্যেক ভাগের ফল থেকে অল্প পরিমাণ রস বার ক'রে রিফ্রাক্টোমিটারের সাহায্যে ঐ রসের মধ্যে মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হ'ল। এটা দেখা গেছে যে মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের মোটামুটি ৮০ শতাংশ হ'চ্ছে সুগার (লেখচিত্র ১)।
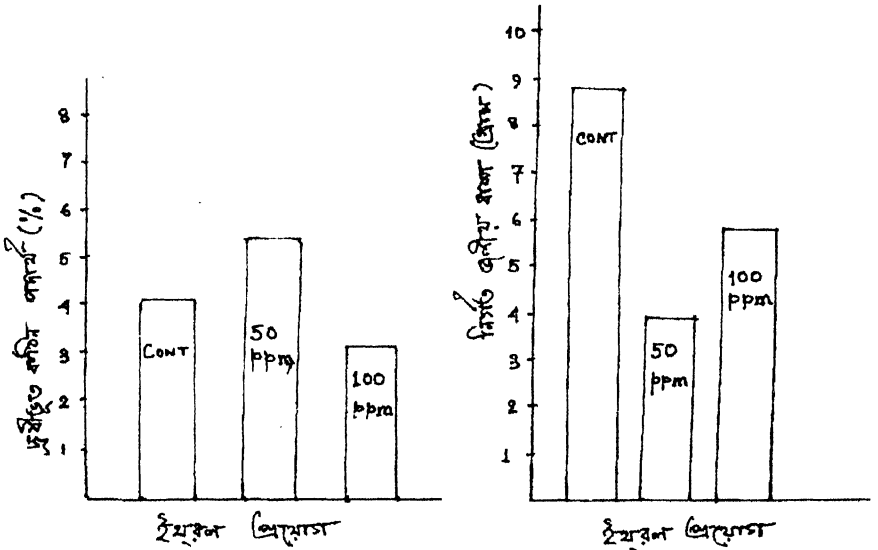
লেখচিত্র ১. ফলের রসে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের শতকরা পরিমাপ

ফলাফল ও ওজন হ্রাস

যে সকল ফলগুলি ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম দ্রবণে ডুবানো হ'য়েছিল, সেগুলি সবচেয়ে প্রথমে রঙ ধ'রতে শুরু করে। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল যে ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম-এর ফলগুলিতে গড়ে শতকরা ৬৫ ভাগ লাল রঙ ধ'রে গেছে। ইথরেল ১০০ পি.পি.এম-এর ফলগুলিতে রঙ ধ'রতে শুরু ক'রেছিল তবে পরিমাণে ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম-এর চেয়ে কম (৪০ শতাংশ) তুলনামূলকভাবে যে সকল ফলগুলিতে ইথ্‌রেল প্রয়োগ করা হয় নি সেগুলি সম্পূর্ণ সবুজ রঙ-এর ছিল। পর্যবেক্ষণের শেষ দিনে অর্থাৎ পঞ্চম দিনে দেখা গেল যে ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম প্রয়োগ করা ফলগুলি সম্পূর্ণরূপে (১০০ শতাংশ) লাল হ'য়ে গেছে। ইথ্‌রেল ১০০ পি.পি.এম-এর ফলগুলি তখনও পর্যন্ত সবুজ রঙ-এর ছিল (লেখচিত্র ২ ও চিত্র ১)। পাকার রঙ ধরে নি।
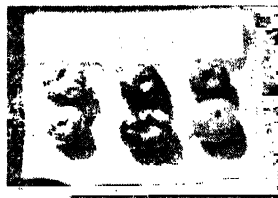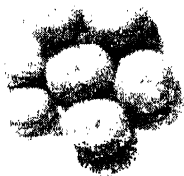
চিত্র ১. বিভিন্ন ইথ্‌রল দ্রবণে ফল পাকার রং
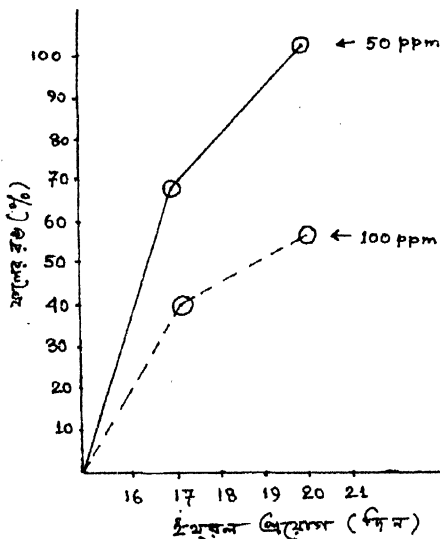
লেখচিত্র ২. ফল পাকার হার (%)

সাধারণত যে কোন ফলকে গাছ থেকে তুলে বাড়ীতে রেখে দিলে সেগুলির ওজন আস্তে আস্তে ক'মতে শুরু করে। সাধারণত ফলের ভেতরে যে প্রচুর পরিমাণ জল থাকে তা বাষ্প আকারে ফল থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ইথরেল ৫০ পি.পি.এম-এর ফলগুলিতে সবচেয়ে কম পরিমাণ জল বাতাসে নির্গত হ'য়েছে ৪ গ্রাম। এবং সবচেয়ে বেশী হ'য়েছে ৮.৭৫ গ্রাম (লেখচিত্র ৩)। ইথরেল ১০০ পি.পি.এম ফলের নির্গত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল কন্ট্রোলের চেয়ে কম, কিন্তু ৫০ পি.পি.এম-এর চেয়ে বেশী অর্থাৎ ৫.৫ গ্রাম (সারণী ১)।

ট্রিটমেন্ট	রং ১৮.১.৯৯	রং ২১.১.৯৯	ওজন (হ্রাস) ১৮.১.৯৯	ওজন (হ্রাস) ২১.১.৯৯	ওজন হ্রাস (গ্রাম)
পরিষ্কার জল	০	০	১৩৩.৫	১২৪.৭৫	৮.৭৫
ইথরেল ৫০পি.পি.এম	৬৫	১০০	১৫৫.৭৫	১৫১.৭৫	৪.০
ইথরেল ১০০পি.পি.এম	৪০	৫৫	১৩৩.৫	১৩২.২৫	৫.৫

সারণী ১. ইথ্‌রেলের প্রভাবে টমেটো ফলের রঙ, ওজন এবং ওজন হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য

পচন

কন্ট্রোল ফলগুলিতে পর্যবেক্ষণের প্রথম দিন থেকেই পচন ধ'রতে শুরু করে (১০%) এবং পর্যবেক্ষণের শেষে গড়ে ফলগুলির শতকরা ৪০ ভাগই প'চে যায়। ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম এবং ১০০ পি.পি.এম-এর ফলগুলিতে প্রথম দিনে কোনও পচনের লক্ষণ দেখা যায় নি। ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম-এর ফলগুলিতে পর্যবেক্ষণের শেষে খুব অল্পমাত্রায় (২.৫%) পচন লক্ষ্য করা যায়। ইথ্‌রেল ১ পি.পি.এম-এর ফলগুলি পরীক্ষার শেষদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ভালোভাবে থাকে (সারণী ২ ও লেখচিত্র ৩)।

নরম শক্ত

যে-কোনো ফলের পাকার লক্ষণ হ'চ্ছে ফলগুলিতে সাধারণ লাল হলুদ কমলা ইত্যাদি রঙ ধ'রে যাওয়া। ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম ফলগুলিতে তাড়াতাড়ি রঙ ধ'রতে সাহায্য করা ছাড়াও ফলগুলিকে তাড়াতাড়ি নরম ক'রে দিয়েছিল। ইথ্‌রেল ১০০ পি.পি.এম তুলনামূলকভাবে কন্ট্রোল ফলের চেয়ে ভালো ছিল কিন্তু ইথ্‌রেল ৫০ পি.পি.এম-এর মত ফলাফল দেয় নি। কন্ট্রোল ফলগুলি পরীক্ষার শেষদিন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে শক্ত ছিল (সারণী ২)।

ট্রিটমেন্ট	পচন (%)		নরমশক্ত (%)	
	১৮.১.৯৯	২১.১.৯৯	১৮.১.৯৯	২১.১.৯৯
পরিস্কার জল	১০	৪০	০	০
ইথ্রেল ৫০ পি.পি.এম	০	২১/২	৫	১৫
ইথ্রেল ১০ পি.পি.এম	০	০	০	৫

সারণী ২. ফলের পচন এবং নরমশক্তের উপর ইথ্রেলের প্রভাব

টি.এস.এস. (Total Soluble Solid)

পাকাফল সাধারণত মিষ্ট হয় কারণ তাতে সুগারের পরিমাণ বেশি থাকে। সুগারের পরিমাণ মাপার জন্য ফলের মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ নির্ধারণ করা হ'চ্ছে সব থেকে সহজ উপায়। এই পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে ইথ্রেল ৫০ পি.পি.এম ফলগুলিতে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৫.২)। ইথ্রেল ১০০ পি.পি.এম ফলগুলিকে পাক্তে সাহায্য ক'রলেও তাতে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ কন্ট্রোল ফলের চেয়ে কম ছিল (সারণী ৩)।

ট্রিটমেন্ট	মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ (%)
পরিস্কার জল	৮.২
ইথ্রেল ৫০ পি.পি.এম	৫.২
ইথ্রেল ১০০ পি.পি.এম	৩

সারণী ৩. মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের পরিমাণ

সাবধানতা

১। টমেটো ফলগুলি সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার পরই গাছ থেকে তোলা উচিত।

২। ফলগুলি তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফলের বোঁটা যেন ফলের সঙ্গে লেগে থাকে।

৩। ফলগুলি অক্ষত অবস্থায় গাছ থেকে তুলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইথরেল প্রয়োগ ক'রতে হবে।

৪। ইথরেল দ্রবণ তৈরী করার সময় ঠিক পরিমাণ মত ইথ্রেল জলে মেশাতে হবে।

৫। দ্রবণ থেকে ফলগুলি তোলার পর সেগুলি খবরের কাগজের উপর হাল্কা ভাবে গড়িয়ে নিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে এবং একটি শুকানো জায়গায় রেখে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত

এই পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে কাঁচা টমেটো ফলকে কৃত্রিম উপায়ে ইথ্রেল প্রয়োগ ক'রে খুব তাড়াতাড়ি পাকানো যায়। দেখা গেছে ইথ্রেলের দুটি মাত্রার মধ্যে ৫০ পি.পি.এম এই

কাজে সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ এই মাত্রায় ফলগুলিকে দ্রুত পাকিয়ে তুলতে, মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে এবং জলীয় বাষ্পের নির্গমন কমাতে সবচেয়ে উপযোগী।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমি এই প্রজেক্টটি ক'রতে গিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা ক'রে কিছুতেই স্থির ক'রতে পারছিলাম না কিভাবে শুরু ক'রব। আমাকে আমাদের বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা যথাক্রমে অম্বুজানন্দ রায় এবং ঈপ্সা বন্দোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং কিভাবে প্রজেক্টটি তৈরী ক'রব তার পরামর্শ দেন। অধ্যাপক দেবতোষ স্যান্যাল এবং তাঁর সহযোগী ভোলাদা আমাকে এই প্রজেক্টটি ক'রতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এঁদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

মূলের বৃদ্ধিতে জলশোষণের প্রভাব

শৌভিক পাল (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

আমি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসত্র নামক বিদ্যালয়ের দশম 'খ' বিভাগের ছাত্র। বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রতে হ'লে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই সেই ধারণা সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে।

বীজ হ'চ্ছে, গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়ের মধ্যে অবস্থিত পরিণত, নিষিক্ত এবং পরিপক্ক ডিম্বক। বীজ থেকে চারাগাছ সৃষ্টি হয়। তবে এই বীজ থেকে চারাগাছ সৃষ্টি হ'তে লাগে অনুকূল পরিবেশ। এই অনুকূল পরিবেশগুলি হ'ল জল, বায়ু এবং উষ্ণতা। এদের প্রভাবে বীজ সুপ্ত দশা থেকে জেগে ওঠে এবং ভ্রূণটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভ্রূণের এই জাগরণকে বলে অঙ্কুরোদগম। অঙ্কুরোদগমের পর ভ্রূণটি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে চারাগাছে পরিণত হয়।

আমার উপস্থিত প্রোজেক্টটির লক্ষ্য হ'ল সময়ের ব্যবধানে ছোলা, মুগ, কালো কলাই এবং কালো সরিষার জল শোষণ ও মূলের বৃদ্ধির কিরূপ পরিবর্তন হ'চ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

উপকরণ ও পদ্ধতি

(১) মুগ (Green-gram) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Phaseoulus aureus* (ফ্যাসিওলাস অরিয়াস)

মুগ একবর্ষজীবি, দ্বিবীজপত্রী, বীরুৎ শ্রেণীর শিম্ব গোত্রীয় উদ্ভিদ (Leguminous Plant)। প্রতিটি বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে শিশু উদ্ভিদ বা ভ্রূণের খাদ্য সঞ্চিত থাকায় বীজপত্রগুলি পুরু। মূলে রাইজোবিয়াম নামক একপ্রকার উপকারী মিথোজীবি জীবাণু বসবাস করে।

(২) ছোলা (Bengal gram, Gram) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Cicer arietinum* (সাইসার এরিয়েটিনাম)

ছোলা একবর্ষজীবি, বীরুৎ শ্রেণীর, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। বীরুৎ শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও এর কাণ্ড তুলনামূলকভাবে শক্ত। ছোলাও শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ। বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত থাকায় বীজপত্রগুলি পুরু, সাধারণতঃ মানুষের কাছে গাছের প্রধান ভোজ্য অংশ বীজের বীজপত্র। এদের মধ্যে মৃদবর্তী অঙ্কুরোদগম দেখা যায় অর্থাৎ বীজপত্র মাটির মধ্যে থেকে যায়। কখনই মাটি ভেদ ক'রে উপরের দিকে উঠে আসে না।

(৩) সরিষা (Mustard) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Brassica campestris* (ব্রাসিকা ক্যামপেসট্রিস)

সরিষা একপ্রকার তৈল উৎপাদনকারী একবর্ষজীবী বীরুৎ শ্রেণীর দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। পরিণত অর্থাৎ পাকা ফলের ত্বক ফেটে বীজ বেরিয়ে আসে। পরিপক্ক বীজের বর্ণ কালো অথবা বাদামী বা হলুদ।

(৪) কালো কলাই (Black gram) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Phaseolus mungo* (ফ্যাসিওলাস মুগো)

কালো কলাই শিম্বগোত্রীয়, একবর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী, বীরুৎ শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ। বীজপত্র পুরু। বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে ভ্রূণের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। মূলে রাইজোবিয়াম নামক উপকারী জীবাণু বসবাস করে।

পদ্ধতি

আমি ২০।১০।৯৮ তারিখে (মঙ্গলবার) স্কুলের তূলাযন্ত্রে ৫টি ছোলা কলাই, (Bengal gram), ৫টি কালো কলাই (Black gram) ৫টি সরিষা (Mustard)grain) এবং ৫টি মুগ কলাই-এর শুষ্ক ওজন নিই।

ওজনগুলি নিম্নরূপ :

(১) ৫টি ছোলা কলাই — ৭৫০ মিলিগ্রাম
(২) ৫টি কালো কলাই — ১৯৫ মিলিগ্রাম
(৩) ৫টি মুগকলাই — ৩০০ মিলিগ্রাম
(৪) ৫টি কালো সরিষা — ৩০ মিলিগ্রাম

ঐ একই দিনে অর্থাৎ মঙ্গলবার ২০।১০।৯৮ তারিখে অন্য একটি পাত্রে রাখা ৫টি কালো কলাই, ৫টি ছোলা কলাই, ৫টি সরিষা এবং ৫টি মুগ কলাই-এর আলাদা-আলাদা ভাবে তূলাযন্ত্রে ওজন নিই। শুষ্ক ওজনগুলি নিম্নরূপ :

(১) ৫টি ছোলা কলাই — ৭৫৫ মিলিগ্রাম
(২) ৫টি কালো কলাই — ১৯৩ মিলিগ্রাম
(৩) ৫টি মুগকলাই — ৩১০ মিলিগ্রাম
(৪) ৫টি কালো সরিষা — ২২ মিলিগ্রাম

এরপর দিন অর্থাৎ বুধবার (২১।১০।৯৮) দিন দুপুর ১২টায় একটি পেট্রিডিস-এর মধ্যে জল নিয়ে প্রত্যেকটি বীজের ৫টি ক'রে দানা জলে ভিজিয়ে রাখলাম। ঐ একই দিনে রাত্রি ১১টায় অন্য একটি পেট্রিডিসে পরের ওজন করা অন্য কলাইগুলি ভিজিয়ে রাখলাম। ২২।১০।৯৮ তারিখে স্কুলের ল্যাবরেটারীর তূলাযন্ত্রে আগের দিন দুপুর ১২টায় ভিজিয়ে রাখা ছোলা, সরিষা, কালো কলাই এবং মুগ কলাই-এর দানাগুলিকে জল থেকে তুলে প্রত্যেকটি বীজের (৫টি একত্রে ক'রে) আলাদা-আলাদা ওজন নিলাম। ওজনগুলি নিম্নরূপ :

(১) ৫টি ছোলা কলাই — ১ গ্রাম ৫০১ মিলিগ্রাম
(২) ৫টি কালো কলাই — ৫২০ মিলিগ্রাম
(৩) ৫টি মুগ কলাই — ৫০৫ মিলিগ্রাম
(৪) ৫টি কালো সরিষা — ৩৫ মিলিগ্রাম

ওজন নেওয়ার পর ভেজানো কলাইগুলিকে আলাদা-আলাদা পেট্রিডিসে রাখলাম এবং অঙ্কুরোদগমের জন্য জল দিলাম। বীজগুলি যাতে শুকিয়ে না যায় সেইজন্য বীজের উপর ভিজে কাপড় বিছিয়ে রাখলাম। এই বীজগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৪ ঘণ্টা।

২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর ওজনের পার্থক্য

বীজের নাম	বীজের শুষ্ক ওজন (W_1)	জলসিক্ত বীজের ওজন (W_2)	শোষিত জলের পরিমাণ (W_2–W_1) mg
ছোলা Bengal gram	750 mg	1501 mg	(1501–750) mg
Cicer arietinum			= 751 mg
কালো কলাই Black gram	195 mg	520 mg	(520–195) mg
Phaseolus Mungo			= 325 mg
মুগ কলাই Green gram	300 mg	505 mg	(505–300) mg
Phaseolus aureus			= 205 mg
সরিষা Mustard	25 mg	35 mg	(35–25) = 10 mg
Brassica campestris			

কিছুক্ষণ পর আলাদাভাবে শুষ্ক ওজন ক'রে রাখা ছোলা, কালো কলাই, সরিষা এবং মুগ কলাই যেগুলি রাত্রে ১১টায় ভেজানো হ'য়েছিল সেগুলি পেট্রিডিস থেকে তুলে ওজন করলাম, এখানে সময়ের ব্যবধান ১২ ঘন্টা।

১২ ঘণ্টা ভেজানোর পর ওজনের পার্থক্য

বীজের নাম	বীজের শুষ্ক ওজন (W_1)	জলসিক্ত বীজের ওজন (W_2)	শোষিত জলের পরিমাণ (W_2–W_1) mg
ছোলা Bengal gram	755 mg	1321 mg	(1321–755) mg
Cicer arietinum			= 566 mg
কালো কলাই Black gram	193 mg	421 mg	(421–193) mg
Phaseolus Mungo			= 288 mg
মুগ কলাই Green gram	310 mg	676 mg	(676–310) mg
Phaseolus aureus			= 366 mg
সরিষা Mustard	22 mg	30 mg	(30–22) = 8 mg
Brassica campestris			

ওজন নেওয়ার পর ভেজানো কলাইগুলিকে আলাদা-আলাদা পেট্রিডিসে রাখলাম এবং অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য জল দিলাম। বীজগুলি যাতে শুকিয়ে না যায় তার জন্য বীজগুলির উপর ভিজে কাপড় বিছিয়ে রাখলাম। এই বীজগুলির সময়ের ব্যবধান ১২ ঘন্টা।

এবার ওই ৮টি পেট্রিডিস (শস্যসমেত) বাড়িতে নিয়ে এসে ১২ ঘন্টা ভেজানো ও ২৪ ঘন্টা ভেজানো কলাই-এর প্রত্যেকটির আলাদা-আলাদা ক'রে স্কেলের সাহায্যে মূলের দৈর্ঘ্যের মাপ নিলাম। এইরকমভাবে আরও দু'দিন একই সময়ে অর্থাৎ ৪৮ ঘন্টা ও ৭২ ঘন্টার ব্যবধানে মূলের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নিলাম। মাপগুলি সারণীর সাহায্যে উপস্থাপিত করলাম।

গড় বৃদ্ধির তারতম্য পর্যবেক্ষণ

মুগ কলাই— ১২ ঘন্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(3.3–0) cm = 3.3 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(4.3–3.3) cm = 1.02 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(4.96–4.32) cm = 0.64 cm.

মুগ কলাই— ২৪ ঘন্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(2.74–0) cm = 2.74 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(4.06–2.74) cm = 1.32 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(5.68–4.06) cm = 1.62 cm.

সরিষা— ১২ ঘন্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(1.64–0) cm = 1.64 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(3.6–1.64) cm = 1.96 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(4.68–3.6) cm = 1.08 cm.

সরিষা— ২৪ ঘন্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(2.12–0) cm = 2.12 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(2.34–2.12) cm = 0.22 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(2.9–2.34) cm = 0.56 cm.
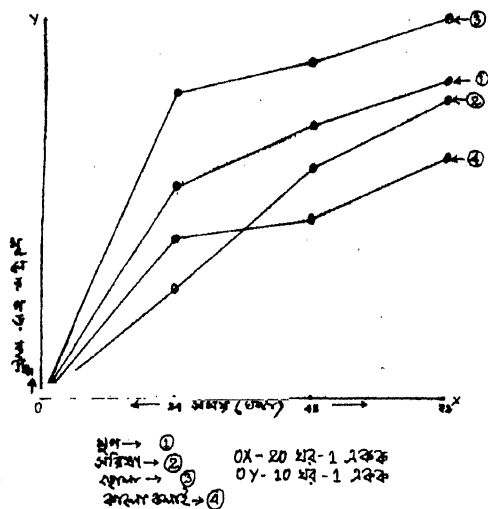
লেখচিত্র ১. ১২ ঘণ্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ
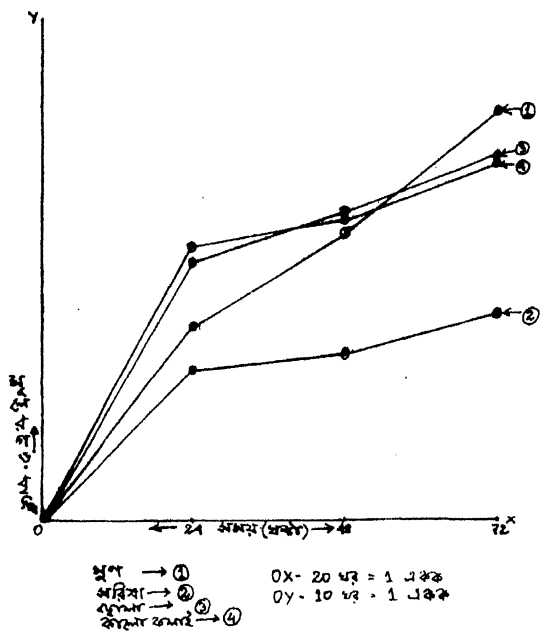
লেখচিত্র ২. ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ছোলা কলাই— ১২ ঘণ্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(4.78–0) cm = 4.78 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(5.38–4.78) cm = 0.60 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(5.94–5.38) cm = 0.56 cm.

ছোলা কলাই— ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(3.68–0) cm = 3.68 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(4.34–3.68) cm = 0.66 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(5.14–4.34) cm = 0.80 cm.

কালো কলাই— ১২ ঘণ্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(2.52–0) cm = 2.52 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(2.84–2.52) cm = 0.32 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(3.84–2.84) cm = 1.0 cm.

কালো কলাই— ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর গড় বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়	গড়বৃদ্ধি
1	12-24 ঘন্টার মধ্যে	(3.82–0) cm = 3.82 cm.
2	24-48 ঘন্টার মধ্যে	(4.26–3.82) cm = 0.22 cm.
3	48-72 ঘন্টার মধ্যে	(5.14–4.26) cm = 0.88 cm.

চিত্র ১. ২৪ ঘন্টা ভেজানোর পর বীজের অঙ্কুরোদ্গম

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১। মুগকলাই-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টার তুলনায় ১২ ঘণ্টায় বেশী জল শোষণ করে কিন্তু অন্যান্য কলাইগুলি ২৪ ঘণ্টায় বেশী জল শোষণ ক'রেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জল শোষণ ক'রেছে ছোলা কলাই ৭৫১ মিলিগ্রাম। এবং সবচেয়ে কম জল শোষণ ক'রেছে

সরিষা ৮ মিলিগ্রাম ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে।

২। মুগ কলাই-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভেজানোর পর উভয় ক্ষেত্রেই ১২ - ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী। পরবর্তী ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর মুগ কলাই-এর ক্ষেত্রে মূলের বৃদ্ধি ক্রমশ হ'চ্ছে কিন্তু, ১২ ঘণ্টা ভেজানোর ক্ষেত্রে মূলের বৃদ্ধি ক্রমশ হ'চ্ছে না।

৩। সরিষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর ক্ষেত্রে ১২ - ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূলের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী (২.১৪ সি. এম.) কিন্তু ১২ ঘণ্টা ভেজানার ক্ষেত্রে ২৪ - ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মূলের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হ'চ্ছে (১.৯৬ সি.এম.) কিন্তু ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর ক্ষেত্রে ২৪ - ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মূলের বৃদ্ধি সবচেয়ে কম (০.২২ সি.এম) হ'চ্ছে।

৪। ছোলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই ১২ - ২৪ ঘণ্টায় মূলের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হ'চ্ছে আবার এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ১২ ঘণ্টা ভেজানোর ক্ষেত্রে প্রথম ১২ - ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশী মূলের বৃদ্ধি (৪.৭৮ সি.এম.) হ'চ্ছে। পরবর্তী পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমশ মূলের বৃদ্ধি হ'চ্ছে তবে প্রথম ২৪ ঘণ্টার তুলনায় অনেক কম।

৫। কালো কলাই-এর ক্ষেত্রে মূলের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হ'চ্ছে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর ১২ - ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। এই বৃদ্ধি (৩.৮২ সি.এম.) হচ্ছে ক্রমশ তবে তুলনায় প্রথম ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা অনেক কম হারে।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে সামগ্রিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে মূলের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হয় প্রথম ২৪ ঘণ্টায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্যই মূলের বৃদ্ধি হয় তবে সেই হার প্রথম ২৪ ঘণ্টার তুলনায় অনেক কম। একই সঙ্গে এটাও দেখা যাচ্ছে যে প্রজাতি ভেদে জলসিক্ততার তারতম্যের সঙ্গে মূলের বৃদ্ধির হার সম্পর্কযুক্ত। পরীক্ষাগুলিকে আরও দীর্ঘায়িত ক'রতে পারলে হয়ত নির্দিষ্ট ভাবে প্রতিটি প্রজাতির অঙ্কুরোদগমের জন্য জলসিক্ততার প্রয়োজনীয় সময় নির্বাচন করা যেতে পারত কিন্তু সময় অভাবে তা সম্ভব হ'ল না। অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রথম যে শর্ত জল, সেই শর্তটি পালনের জন্য কৃষিকাজে বীজ বপনের আগে বীজ ভিজিয়ে নেওয়ার রীতি দেখা যায়, অঙ্কুরোদগমের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও যথাযথ ভাবে ঘ'টতে সাহায্য করার জন্য। কোনও-কোনও বীজের ক্ষেত্রে তা ভ্রূণমূল পর্যন্ত বের ক'রে নেওয়া হয়। এই ভ্রূণমূল অতীব ভঙ্গুর থাকে। সুতরাং আলোচ্য গবেষণাতে মূলের বৃদ্ধির তারতম্যতার দিকটিও কৃষিকাজে সরাসরি সাহায্য ক'রবে।

আমার মনে হয় এই পথে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারলে চাষীরা বীজের অপচয় বা ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবে। সুতরাং সেদিক থেকে আলোচ্য গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার এই প্রোজেক্টের কাজে যারা সব সময় আমাকে সাহায্য ক'রেছেন তাঁরা হ'লেন অম্বুজদা, ঈপ্সাদি, আলোকদা, অশোকদা, অসিতদা, মৃগাঙ্কদা এবং আমার মা। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি

চির ঋণী। এঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলে কখনই আমার এই প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করা সম্ভব হ'ত না। এঁদের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সহায়ক পুস্তকাদি :

(১) জীবন বিজ্ঞান - ডঃ ডি. কে. চৌধুরী।
(২) জীবন বিজ্ঞান পরিচয় - শ্রীদেবব্রত মিত্র, শ্রীসলিলকুমার চৌধুরী ও শ্রীদুলালচন্দ্র সাঁতরা।
(৩) প্রাণী বিজ্ঞান - ডঃ রবীন্দ্রনারায়ণ পাল।
(৪) প্রাণ বিজ্ঞান পরিচয় - ডঃ ভাস্করজ্যোতি বসু ও সুপর্ণা বসু।

বিভিন্ন প্রজাতির আখের সুক্রোজের পরিমাণ নির্ণয়

কৌস্তুভ ভট্টাচার্য ও শুদ্ধসত্ত্ব দাঁ (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

ছোটবেলায় শুনেছি আখ থেকেই নাকি চিনি তৈরী হয়, অর্থাৎ চিনি উৎপাদনের মূল উপাদান হ'ল আখের রস। আখের রসে সুক্রোজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কোন প্রকার আখ থেকে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হবে। বিভিন্ন প্রকার আখ তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি, আখ হতে প্রাপ্ত রসে শর্করার পরিমাণ জানবার এক প্রবল ইচ্ছা ছিল আমাদের মনে। "জীবন বিজ্ঞান প্রজেক্ট" ক'রতে গিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পাই। আখ সম্পর্কে নিজেদের কৌতূহলকে দূর করা তথা আখ সম্পর্কে কিছু জানবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই গবেষণার প্রয়াস।

আখের বিজ্ঞানসম্মত নাম : **স্যাকারাম অফিসিনেরাম**

উপকরণ

(১) তিনটি ভিন্ন জাতের আখ তিনটি ক'রে (বি- ১৭, সিও- ১০১৭ ও শুংশুডি), (২) ফিতা, (৩) আখ কাটার ছুরি, (৪) তুলাযন্ত্র, (৫) স্কেল, (৬) রিফ্র্যাক্টোমিটার যন্ত্র
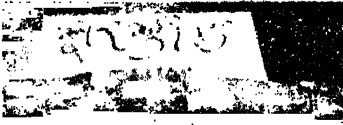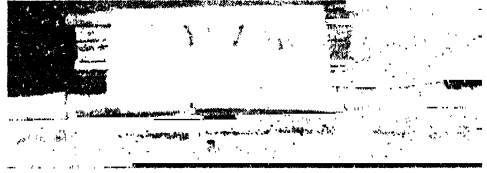
চিত্র ১-৩. বি- ১৭, সিও- ১০১৭ ও শুংশুডি আখের নমুনা

উল্লিখিত প্রজাতির আখ চাষ ও সংগ্রহের বিবরণ

(ক) আখের নাম : বি- ১৭ (বি-সতেরো)।

বিচন লেগেছে ৩৫০ কেজি

চাষীর নাম : অমর ঘোষ, গ্রাম: হালসেডাঙ্গা, ব্লক: ইলামবাজার, বীরভূম।

১০ কাঠা জমিতে গত বৈশাখ মাসে আখ লাগিয়েছিলেন।

সার দিয়েছেন: (১) আখ লাগাবার সময় ১০ কেজি ডি.এ.পি., ৫ কেজি সুপার ফসফেট ও ১ কেজি গ্যামাকসিন মিশিয়ে ছড়িয়েছিলেন।

(২) আখ বড় হবার পর গুটি বেঁধে আখের গোড়া খুঁড়ে দিয়ে ৫ কেজি অ্যামোনিয়া ও ৫ কেজি ইউরিয়া মিশিয়ে ছড়িয়েছেন।

(৩) পোকার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ৫০০ কেজি ফর্‌টেস বিষ ছড়িয়েছেন। সেচ দিয়েছেন: জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনবার।

(খ) আখের নাম : সি.ও. ১০১৭ (সি.ও. হাজার সতেরো)

চাষীর নাম: ফজাই মল্লিক, গ্রাম: হালসেডাঙ্গা, ব্লক: ইলামবাজার।

ফলন খুব ভাল হয় না বলে ৫ কাঠা জমিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে এই আখ লাগিয়েছেন। বীজ দিয়েছেন: ৩ কুইণ্ট্যাল মত। সার দিয়েছেন: (১) আখ জমিতে লাগাবার সময় ১০ কেজি ডি.এ.পি. ও ৫ কেজি সুপার ফসফেট এবং ২৫০ গ্রাম মত গ্যামাকসিন ছড়িয়েছেন।

(২) কার্তিক মাসে আখ গুটি বাঁধার সময় ৩ কেজি ইউরিয়া ও ৩ কেজি অ্যামোনিয়া ছড়িয়েছেন।

(৩) বিষ এখনো পর্যন্ত দেন নি।

সেচ দিয়েছেন: জানুয়ারী মাস পর্যন্ত দুবার।

(গ) আখের নাম: শুঙ্‌শুঙি।

চাষীর নাম: ওবেদ শেখ, গ্রাম: হালসেডাঙ্গা, ব্লক: ইলামবাজার, বীরভূম।

১ বিঘা জমিতে গত বৈশাখ মাসে এই আখ লাগিয়েছেন। বীজ দিয়েছেন ৮২৫ কেজি। সার দিয়েছেন। (১) ভিলি ক'রে আখ লাগাবার সময় ২০ কেজি ডি.এ.পি., ১০ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৩ কেজি গ্যামাকসিন মিশিয়ে জমিতে ছড়িয়েছেন।

(২) আখ বড় হবার পর গুটি বেঁধে আখের গোড়ায় গোড়ায় ১০ কেজি অ্যামোনিয়া ও ১০ কেজি ইউরিয়া মিশিয়ে ছড়িয়েছেন।

(৩) কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাসখানেক আগে গোটা জমিতে ১ কেজি ফর্‌টেস বিষও ছড়িয়েছেন।

সেচ দিয়েছেন: জানুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনবার।

পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রথমে বি-১৭ জাতের তিনটি আখ নিয়ে তাদের দৈর্ঘ্য এবং পর্ব মধ্য সংখ্যা নির্ণয় করলাম। এরপর আখগুলিকে গোঁড়া, মধ্যভাগ ও ডগা হিসাবে মোটামুটি তিনভাগ ক'রলাম। তারপর প্রত্যেক ভাগের ব্যাস নির্ণয় ক'রলাম। তিনটি আখেরই উপরোক্ত জিনিসগুলি নির্ণয় করার পর আলাদা-আলাদা গোঁড়া, মধ্যভাগ ও ডগা হিসাবে তাদের ওজন নিলাম। এরপর আখের গোঁড়া অংশগুলি

থেকে দু-এক ফোঁটা রস নিয়ে "রিফ্র্যাক্টোমিটার" যন্ত্রের সাহায্যে তাদের মধ্যে সুক্রোজের গড় পরিমাণ নির্ণয় ক'রলাম। একইভাবে আখের মধ্য ভাগ ও ডগার রসে সুক্রোজের গড় পরিমাণ নির্ণয় ক'রলাম।

এবার একইভাবে সিও- ১০১৭ জাতের তিনটি আখ নিয়ে তাদের দৈর্ঘ্য, পর্বমধ্য সংখ্যা নির্ণয় ক'রে তাদের মোটামুটি তিনটি সমান ভাবে ভাগ ক'রলাম। এবার গোঁড়া, মধ্যভাগ ও ডগার ব্যাস নির্ণয় ক'রে আলাদা-আলাদা ভাবে তাদের ওজন নিলাম। এরপর তিনটি অংশ থেকে কয়েকফোঁটা ক'রে রস সংগ্রহ ক'রে ওই রস নিয়ে 'রিফ্র্যাক্টোমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে সুক্রোজের গড় পরিমাণ নির্ণয় করলাম (সারণী ১)।

একই ভাবে শুঙ্‌শুঙি জাতের তিনটি আখ নিয়ে তাদের দৈর্ঘ্য ও পর্ব মধ্য সংখ্যা নির্ণয় ক'রে, ওজন নিয়ে 'রিফ্র্যাক্টোমিটার' যন্ত্রের সাহায্যে আখগুলির মধ্যে সুক্রোজের পরিমাণ নির্ণয় ক'রলাম।

পর্যবেক্ষণ

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমাদের প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলি নীচের ছকের সাহায্যে দেখান হ'ল।

আখের জাত	দৈর্ঘ্য (মিটার)	আখ প্রতি পর্বমধ্য	আখের ব্যাস (সেমিতে) গোঁড়া	মধ্যভাগ	ডগা	আখের ওজন (কেজিতে)	সুক্রোজ পরিমাণ
বি-১৭							
প্রথম আখ	২.০০	১৫	২.০	১.৯	১.৫	০.৮০০	১৯.১%
দ্বিতীয় আখ	২.২৫	১৮	১.৭	১.৯	১.৫	০.৭১০	১৭.২%
তৃতীয় আখ	২.৩৫	১৮	১.৮	১.৭	১.৫	০.৪৫৫	২০.০%
গড়	২.২	১৭	১.৮৩	১.৮৩	১.৫	০.৬৫৫	১৮.৭%
সিও-১০১৭							
প্রথম আখ	১.৬৫	১৭	১.৮	১.৯	১.৫	০.৫৪৫	১৯.২%
দ্বিতীয় আখ	২.০০	২২	২.০	১.৭	১.৩	০.৫৫০	১৯.২%
তৃতীয় আখ	১.৮৯	২১	১.৯	১.৭	১.৪	০.৪২০	১৯.২%
গড়	১.৮৫	২০	১.৯	১.৭৭	১.৪	০.৫০৫	১৯.২%
শুঙশুঙি							
প্রথম আখ	২.৩৩	২৩	২.১	২.১	১.৭	০.৮৯০	১৯.৯%
দ্বিতীয় আখ	২.৩০	২১	২.০	২.০	১.৮	০.৯৪০	২২.১%
তৃতীয় আখ	১.৯০	১৫	১.৯	১.৯	১.৮	০.৭১০	২১.০%
গড়	২.১৮	১৯.৬৭	২.০৩	২.০	১.৭৭	০.৮৪৭	২১.০%

সারণী ১. বিভিন্ন প্রকার আখের গড় সুক্রোজের পরিমাণ

সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে বি-১৭ জাতের আখ সর্বাপেক্ষা লম্বা। তারপর শুঙশুঙি ও সিও-১০১৭ জাত। কিন্তু পর্বমধ্যের সংখ্যা অনুযায়ী সর্বোচ্চ পর্বমধ্য সংখ্যা ছিল সিও ১০১৭ তারপর শুঙশুঙি, ১৩ ও ১৪ ক'রে। পক্ষান্তরে আখের গোড়ার দিকের গড়ে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যাস ছিল, শুঙশুঙি তারপর সিও- ১০১৭ এবং বি-১৭। কিন্তু আখের মাঝখানের ব্যাসের ক্রমাত্ত্ব ছিল প্রথম শুঙশুঙি তারপর বি-১৭ এবং সিও ১০১৭। অনুরূপভাবে আখের ডগার ব্যাস একই ক্রমান্বয়ে ছিল। প্রতিটি আখের গড় ওজন হ'তে দেখতে পাই শুঙশুঙি সর্বোচ্চ (০.৮৪৭ কেজি) সেখানে বি-১৭ (০.৬৪৫ কেজি) এবং সিও- ১০১৭ (০.০৫০ কেজি) এবং সুক্রোজ পরিমাণ অনুযায়ী শুঙশুঙি ছিল প্রথম (২১.০%) তারপর সিও-১০১৭ (১৯.২%) এবং বি-১৭ (১৮.৭%) (সারণী ১)।

যেহেতু আখ চাষীর ক্ষেত্রে ফলন হিসাবে আখের ওজন এবং আখের রসে সুক্রোজের পরিমাণ অতি গুরুত্ত্ব পূর্ণ সুতরাং এই সমীক্ষা থেকে এটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন মাপকাঠির মুল্যায়নে শুঙশুঙি প্রজাতির মান প্রথম, বি-১৭ দ্বিতীয় এবং সিও- ১০১৭ তৃতীয়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রজেক্টটি ক'রতে আমি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে অনেক জনের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি। পল্লীশিক্ষা ভবনের 'অ্যাগ্রোনমির' অধ্যাপক ডঃ শ্রীগোপালচন্দ্র দে মহাশয় আমাদের এই কাজটি ক'রতে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাহায্য ক'রেছেন। আমাদের স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ অম্বুজানন্দ রায় মহাশয় এবং অধ্যাপিকা ডঃ ঈপ্সা বন্দোপাধ্যায় আমাকে যথার্থ আন্তরিকভাবে সাহায্য ক'রেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জীবন বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটারীর সহায়ককর্মী অসিতদাও আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ক'রেছেন। তার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এতজনের আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতা পেয়ে আমি আমার কাজটি শেষ ক'রতে পেরেছি। সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

পতঙ্গের শুঙ্গ : তার প্রকারভেদ

মৃন্ময় অধিকারী (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

মানুষ কোনদিনই তার নিজের জগৎ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সে তার পরিবেশের জীব ও জড় জগতে অনুসন্ধান চালিয়েছে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক জীব ও জড়কে চিহ্নিত ক'রেছে।

এইভাবে মানুষ একদিন পরিচয় পেয়েছিল পতঙ্গদের উপকারী ও ক্ষতিকারক ভূমিকার। বলা বাহুল্য আজকের দৈনন্দিন জীবনে প্রজাপতির ডানার নানান রঙ-এর সম্ভার যেমন মানুষের দৃষ্টিকে স্বপ্নজগতে বিচরণ করায়, তেমনি মশা, মাছি এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পতঙ্গ ততোধিক চিন্তিত ক'রে তোলে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পতঙ্গের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মানুষ ছিল অনুসন্ধিৎসু। রামায়ণ, মহাভারতেও পতঙ্গ এবং মধুর উল্লেখ র'য়েছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে মানুষ পতঙ্গকে গৃহে প্রতিপালন ক'রতে শুরু করে। সুতরাং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পতঙ্গের সঙ্গে মিত্রতা ক'রেছিল মানুষ। পতঙ্গের গুরুত্ব, সে ক্ষতিকারক বা প্রয়োজনীয় হোক তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

পরীক্ষা ও পদ্ধতি

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য শুঙ্গগুলির স্লাইড প্রস্তুত ক'রে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখে তাদের ছবি এঁকেছি। ছবি আঁকার সময় গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। সংগৃহীত শুঙ্গ গুলির নিম্নলিখিত প্রকারভেদ এবং বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য ক'রেছি।

পতঙ্গের শুঙ্গ

প্রত্যেক প্রকৃত পতঙ্গের এক জোড়া ক'রে শুঙ্গ বর্তমান (ব্যতিক্রম - প্রোটুরা পর্ব)। শুঙ্গ দ্বিতীয় মস্তক উপাঙ্গে অবস্থিত এবং এরা মস্তকের সামনের দিকে বা দুটি চক্ষুর মাঝখানে প্রোথিত থাকে। যদিও প্রাথমিকভাবে শুঙ্গগুলি অনুভূতি কার্যের সঙ্গে যুক্ত, তবুও এই উপাঙ্গ বিভিন্ন পতঙ্গের ভিন্ন-ভিন্ন বিস্তৃত ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানী ইমস্ পতঙ্গের শুঙ্গকে দুটি ভাগে ভাগ ক'রেছেন।

(ক) বিভেদিত শুঙ্গ — ডাইপ্লিউরা পর্ব

(খ) বলয়যুক্ত শুঙ্গ — থাইসানিউরা পর্ব

শুঙ্গের গঠন

একটি আদর্শ শুঙ্গের তিনটি অংশ ; যথা স্কেপ, পেডিসেল ও ফ্লাজেলাম

(ক) স্কেপ: প্রথম এবং ভূমি উপাঙ্গ মাধ্যমে সকেটের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় থাকে। এলিভেটর ও ডিপ্রেসর পেশীর মাধ্যমে শুঙ্গ চালিত হয়।

(খ) পেডিসেল: এটি শুঙ্গের দ্বিতীয় উপাঙ্গ। অপ্রশস্ত, জনসনের ইন্দ্রিয় ধারণ করে।

(গ) ফ্লাজেলাম: এটি শুঙ্গের বাকী অংশ। (গুব্‌রে পোকার লার্ভার ক্ষেত্রে বলয়ের সংখ্যা ১, কিন্তু ডিক্‌টিওপটেরার ক্ষেত্রে এগুলি ১০০ এর অধিক। এই অংশ বিভিন্ন পতঙ্গের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে গঠিত)।

শুঙ্গের প্রকারভেদ — **বৈশিষ্ট্য**
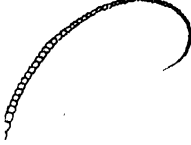
১। সিটেসিয়াস
(ক) বহুসংখ্যক উপাঙ্গ নিয়ে গঠিত।
(খ) প্রান্তদেশে উপাঙ্গগুলি ক্রমশ সরু হ'য়ে এসেছে।
(গ) ধারণা করা হয় এই প্রকার সব চাইতে প্রাথমিক।
উদাহরণ - **পেরিপ্লানেটা** (আরশোলা)

২। ফিলিফর্মড

(ক) উপাঙ্গগুলি প্রশস্ত এবং চওড়াকৃতি।
(খ) প্রত্যেক উপাঙ্গগুলি সমান প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট।
(গ) সরু সুতোর ন্যায়।
(ঘ) দুটি উপাঙ্গের সংযোগস্থলে খাঁজ র'য়েছে এবং স্থানটি অপ্রশস্ত।
উদাহরণ - **ক্যারাবাস**।
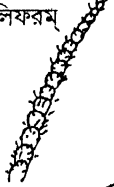
২। মনিলিফরম্‌
(ক) ক্ষুদ্র গোলাকার উপাঙ্গ নিয়ে গঠিত।
(খ) দুটি উপাঙ্গের মাঝখানে সুস্পষ্ট খাঁজ র'য়েছে।
(গ) দেখতে অনেকটা পুঁথির মালার মত।
উদাহরণ - **ক্যালোটার্মস**।
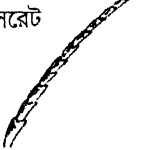
৪। সিরেট
(ক) ফ্লাজেলামগুলি দাঁতের ন্যায় দেখতে।
উদাহরণ - **ইলাটেরিডি**।

৫। পেক্‌টিনেট
(ক) উপাঙ্গগুলির এক পার্শ্বে অভিক্ষেপ র'য়েছে।
(খ) চিরুণীর ন্যায় দেখতে।
(গ) প্রতিটি উপাঙ্গে সুস্পষ্ট অভিক্ষেপ র'য়েছে।
উদাহরণ - **টেনথেরিডিনিডি**।

বৈশিষ্ট্য

৬। বাইপেক্‌টিনেট (ক) উভয়পার্শ্বে অভিক্ষেপ র'য়েছে।
উদাহরণ - পুরুষ - **লেপি্‌ডপটেরা** প্রজাপতি।

৭। ফিলিফর্মড (ক) দূরবর্তী উপাঙ্গগুলি ক্রমশ স্ফিত হ'য়ে গদার ন্যায় আকৃতি ধারণ ক'রেছে
উদাহরণ - কিছু **লেপিডপটেরা** প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ।

৮। কেপিটেট (ক) ফ্লাজেলামের দূরবর্তী অংশটি স্ফিত (মস্তকাকৃতি) এবং সরু দণ্ডাকার অংশ নিয়ে গঠিত। শুঙ্গটি মস্তকের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। উপাঙ্গগুলি মসৃণভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে অথবা বহির্রেখায় কিছুটা অসদৃশ হয়। উদাহরণ - **হাইড্রিনিডি**।
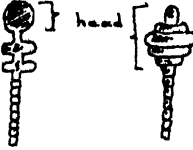
৯। গদাকৃতি কেপিটেট (ক) ফ্লাজেলামের প্রথম উপাঙ্গ সরু এবং বৃন্তের ন্যায় এবং অবশিষ্ট অংশ গদার ন্যায়। উদাহরণ - মাছি।
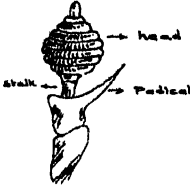
১০। জেনিকিউলেট (ক) ফ্লাজেলাম আংটি আকৃতি ভূমিউপাংশ, ফিউনিকাল এবং গদাকৃতি অংশ নিয়ে গঠিত। ফিলামেণ্ট স্কেপের সঙ্গে কোণ ক'রে র'য়েছে।
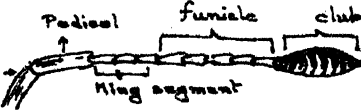
উদাহরণ - কিছু **হাইমেনপ্‌টেরা**।

১১। লেমেলেট (ক) ক্যাপিটেট অসদৃশ, একপার্শ্বে প্লেট সদৃশ অংশ নিয়ে গঠিত।

বৈশিষ্ট্য

১২। পাইলোজ
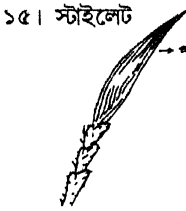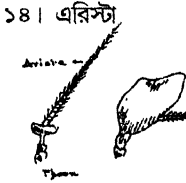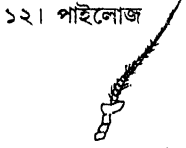
(ক) ফিলামেণ্ট তলোয়ার আকৃতির এবং গাত্রে সূক্ষ্ম রোয়ার ন্যায় অংশ বর্তমান।
উদাহরণ - **স্ত্রী মশা।**

১৩। প্লিউমোজ

(ক) ফিলামেণ্ট ঘনভাবে রোয়ার ন্যায় অংশ দ্বারা আবৃত এবং দেখতে অনেকটা বটলব্রাসের ন্যায়।
উদাহরণ - **পুরুষ কিউলেক্স মশা।**

১৪। এরিস্টা

(ক) শুঙ্গ হ্রাসপ্রাপ্ত এবং একটি তলোয়ার আকৃতির রোয়াযুক্ত এরিস্টা নিয়ে গঠিত। যাহা প্রস্থ বরাবর থাকে।
উদাহরণ - **ডিপ্‌টেরা** (মাছি)।

১৫। স্টাইলেট

(ক) কিছু সংখ্যক উপাঙ্গ নিয়ে গঠিত। প্রান্তীয় উপাঙ্গের সঙ্গে স্টাইলা র'য়েছে, যা অসংযুক্ত উপাঙ্গ হ'তে গঠিত।
উদাহরণ - **ডিপ্‌টেরা।**

১৬। ক্ল্যাসপার:-

(ক) পুরুষ কোলেম্‌বোলা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাঙ্গ একটি ক্লাম্পিং অঙ্গ নিয়ে গঠিত (আঁকড়ে ধ'রতে সাহায্য করে)। শুঙ্গগুলি জননে সাহায্য করে।
উদাহরণ - **স্টেনাসিডিয়াপিক্‌টা।**

শুঙ্গের কাজ

১। শুঙ্গ বিশেষ সংবেদনশীল অঙ্গ। পতঙ্গ তার শুঙ্গের মাধ্যমে বিপদ, খাদ্যের অবস্থান, পুরুষ অনুসন্ধান, শ্রবণ এবং ঘ্রাণ গ্রহণ ইত্যাদি অনুধাবন ক'রে থাকে।

২। **এপিস মেলিফেরার** ক্ষেত্রে শুঙ্গ গ্রাহক ইন্দ্রিয়রূপে কাজ করে।

৩। রক্তশোষক পতঙ্গের ক্ষেত্রে শুঙ্গ তার অনুভবী অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

৪। কেলোগী দেখিয়েছেন যে **ডেসিকনিকা সেনসিল্লা, এডিস ইজিপ্টি**-এর শুঙ্গে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার কাজ ক'রে থাকে।

৫। পতঙ্গের শুঙ্গ নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে (পিঁপড়ে)।

৬। শিকারকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে পতঙ্গের ভূমিকা র'য়েছে।

৭। মিলনের সময় স্ত্রী পতঙ্গকে আঁকড়ে ধ'রতে সাহায্য করে।

৮। পতঙ্গের শুঙ্গ গৌণ যৌন অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে।

৯। মেয়ার (১৯৫০) পরীক্ষার দ্বারা শুঙ্গ বিচ্ছেদ ক'রে দেখিয়েছেন যে **পুরুষ ড্রসোফিলার** মিলনের ক্ষেত্রে শুঙ্গ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে **মেলাকিডি** বিটলের সূক্ষ্ম গ্রন্থিময় রোম থেকে নিঃসৃত রস স্ত্রী পতঙ্গের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে এবং যৌন আবেদন জাগিয়ে তোলে। পতঙ্গের হলুদ গ্রন্থিময় রোম বিশেষ সুগন্ধিযুক্ত রস নিঃসরণ করে যা পিঁপড়ে চেটে খায় এবং বদলে পিঁপড়ে তাদের খাদ্যের জোগান দেয়।

১০। **হাইড্রোফিলিডির** পতঙ্গের শুঙ্গ জল দ্বারা সংযুক্ত হ'য়ে একটি নালী তৈরী করে যা সাময়িক শ্বাসনালী হিসাবে কাজ করে, যার ফলে একটি জলের বুদবুদ পতঙ্গের অঙ্কদেশ আটকা পড়ে যা শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করে।

১১। পতঙ্গের নামকরণের ক্ষেত্রে শুঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

উপসংহার

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে কৃষি বিজ্ঞানে পতঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, পতঙ্গের শুঙ্গ নিয়ে পর্যলোচনা ও অনুসন্ধান আজ আর অপ্রয়োজনীয় সময় অপচয় নয়। কেননা ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে কৃষিকার্যকে এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেখানে শস্যের পতঙ্গরাই সব চাইতে বেশী ক্ষতিসাধন করে। আবার মধু, রেশমের মূলে র'য়েছে পতঙ্গদের অবদান। অতএব উপরোক্ত অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে পতঙ্গবিদ্যা আলোচনায় শুঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এতে কোনো সন্দেহ নাই।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. Applied Entomology - NIGAM.
2. A Text of Entomology - SRIVASTAVA.

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার এই কাজে আমাকে আমার বাবা, মা অত্যন্ত উৎসাহিত ক'রেছিলেন এবং এই কাজে আমাকে ঈপ্সাদি, অমিতাভদা, অসিতদা, আমার দিদি অনেক সাহায্য ক'রেছেন। তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

মাছের আঁশের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

অতীশ রায় (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

প্রাণীজগতে মেরুদণ্ডী পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হ'ল 'মৎস্য'। এই শ্রেণীটি প্রাণীজগতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল ক'রে আছে। (চিত্র ১ ও ২) আমরা জানি ভূপৃষ্ঠের ২/৩ ভাগ অর্থাৎ ৭০ শতাংশই জল। সংখ্যাতত্ত্বগত দিক থেকে জলজ প্রাণী এবং বাকী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মৎস্য শ্রেণীই সর্বাপেক্ষা বেশী(চিত্র ২)। সুতরাং প্রাণীকূলে মৎস্য যে অন্যতম স্থান দখল ক'রে আছে সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়।

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীতে যখন কেবল জল আর জল ছিল, এবং বিবর্তনের ধারায় মাছের বয়স যখন আরও কম ছিল, তখন এই পরিসংখ্যান যে আরও অনেক বেশী ছিল তা বলাই বাহুল্য।

চিত্র ১: ভূপৃষ্ঠের জলভাগ এবং উল্লম্বতলে বিভিন্ন উচ্চতা ও গভীরতায় মৎস্য শ্রেণীর বিস্তৃতি।

বিবর্তনবাদের সূত্র অনুসারে এবং জীবাশ্মগত, ভ্রূণতত্ত্বগত, জীনগত ইত্যাদি তথ্য সাপেক্ষে একথা প্রমাণিত যে মানুষের বিবর্তনে মৎস্যশ্রেণীর ব্যবধান বিশিষ্ট যোগসূত্র আছেই এবং এও প্রমাণিত যে মৎস্যশ্রেণীর পূর্বসূরী ব্যতিরেকে মানুষের বিবর্তন সম্ভব হ'ত না। আজকের মানুষের

প্রচুর গঠনগত ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য বহুযুগ আগের মৎস্যবংশীয় উদ্ভূত। যে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিকে ঘিরে আধুনিক জীব গড়ে উঠেছে তার প্রাথমিক ভিত্তিপত্তন হ'য়েছিল এই মৎস্য শ্রেণীর মধ্যেই। প্রাণীজগতে দশ অঙ্গতন্ত্রের যে আধুনিকতম বিকাশ দেখতে পাই তাদের মধ্যে দৃষ্টি, আভ্যন্তরীণ নিষেক, জরায়ু মধ্যস্থ পুষ্টি, জীবন্ত জন্ম, শিক্ষণ, স্মৃতি বা স্মরণ এবং ঝুঁকিগ্রহণ ইত্যাদি জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
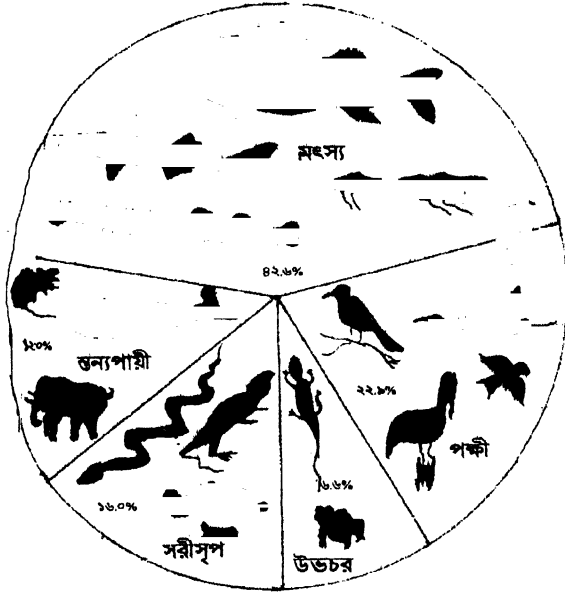
চিত্র ২: ভূপৃষ্ঠের প্রাণীদের শতকরা উপস্থিতি

কেন এবং কিভাবে মাছ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাপ্রবণ মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটেছে - শ্রেণীটির স্বভাব প্রকৃতি, অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই। প্রায় দশ শতাব্দী পূর্বে খ্রীস্টান ও চীনারা সার্থকভাবে মৎস্য জাতির প্রচুর পরিমাণে বংশবৃদ্ধি ঘটানোর চেষ্টা ক'রেছিল। প্রাচীন ইজিপ্ট, গ্রীক ও রোমানরা বিভিন্ন মাছের প্রকারভেদ, স্বভাব, বাসস্থান এবং তাদের মান নথিভুক্ত ক'রেছিল। এমনকি এটাও জানা যায় যে প্রাচীনকালে রোমে খ্রীস্টানদের ভূগর্ভস্থিত গোপন ভাণ্ডারের প্রতীক ছিল মাছ।

ইউরোপে বৈজ্ঞানিকভাবে 'মৎস্যবিদ্যার' চর্চা শুরু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। প্রায় সেই সময় থেকেই এই বিদ্যা সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন বিভাগে যেমন শ্রেণীবিন্যাস, সূক্ষ্ম গঠনতন্ত্রসহ শারীরস্থান, জীনতত্ত্বসহ অভিব্যক্তি, বাস্তুতন্ত্র, শারীরবিদ্যা, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা শুরু হ'য়েছে। এই সমস্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় আন্তরদেশীয় স্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন যাদুঘরে ও গবেষণাগারে এবং কৃষিবিদ্যায় কাজ চ'লেছে নিরন্তর এবং গ'ড়ে উঠেছে বিশেষ-

বিশেষ 'মৎস্যকেন্দ্র' ও 'মৎস্যবিভাগ'। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন চিড়িয়াখানায়, কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে এই ধরণের মৎস্যবিভাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৎস্যবিদ্যায়, কর্মের পরিধি সীমাহীন। বলা যেতে পারে এই বিদ্যা সকলের জন্য, এমনকি যাঁরা মৎস্য বিশারদ নন তাঁদের জন্যও। মৎস্যবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে প্রচুর অবদান এসেছে দার্শনিক, যাজক, চিকিৎসক, জেলে এবং খেয়ালী জলক্রীড়াবিদ এবং শখের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর কৃত্রিম পুষ্করণী চর্চার মানুষদের কাছ থেকে। গবেষণার সুযোগ সীমাহীন। মৎস্যবিদ্যার যতটুকু জানা গেছে তার চেয়ে অজানাই র'য়ে গেছে অনেক বেশী।

স্বভাবতই জীববিদ্যা পঠন-পাঠনের সময় আমাকেও এই প্রাণীকূল আকর্ষণ ক'রত গোড়া থেকেই। এমনকি যখন বিজ্ঞান পড়ি নি অর্থাৎ সেই ছেলেবেলায় যখন সবে নিজের হাতে খেতে শিখেছি সেদিন থেকেই খাবার পাতে মাছের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছে। তারপর যখন গ্রামের বাড়ীতে পুকুর থেকে জেলেদের রকমারি মাছ ধ'রতে দেখেছি, তখনই চিনতে শিখেছি রুই মাছ, পুঁটি মাছ, কই মাছ, ল্যাটা মাছ আরও কত কি! বড় হ'য়ে বিজ্ঞান প'ড়ে জেনেছি 'হাঙর'ও মাছ—কিন্তু রুই-কাতলার মত কঠিনাস্থির নয়, এরা তরুণাস্থির। মাছেদের মধ্যে এই যে প্রকারভেদ আর তাদের চেহারার যে পার্থক্য এটা আমাকে সবসময়ই ভাবিয়ে তুলত। সেই পার্থক্যবোধ থেকে আলোচ্য প্রোজেক্টটি বা প্রকল্পটি হাতে নিয়েছি।

মাছেদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে যে রকমারি পার্থক্যগুলি দেখতে পাই, তার মধ্যে শারীর বৃত্তীয় গঠনতত্ত্ব সংক্রান্ত পার্থক্যগুলির তুলনামূলক দিকটি আমাকে বেশী ক'রে আকর্ষণ করে এবং সেই উদ্দেশ্যেই তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য মাছের আঁশকেই বেছে নিয়েছি। মাছ আকর্ষণীয় দেখতে। মাছের আঁশের গঠনগত বৈশিষ্ট্যও আকর্ষণীয়। বহিঃত্বকের সঙ্গে আঁশগুলি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় আলগাভাবে লেগে থাকে। এই জন্য এদের বিচিত্র ধরণের গঠনগত কলাকৌশল আছে। আঁশের এই বৈশিষ্ট্য আমাকে খুবই আকর্ষণ করে তাই বর্তমান পর্যবেক্ষণে মাছের আঁশের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পার্থক্য আলোচনা ক'রলাম।

পরীক্ষা ও পদ্ধতি

উল্লিখিত প্রকল্পটির রূপায়ণে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞানাগারে সম্পন্ন করা হ'য়েছে। এই পরীক্ষার জন্য স্থানীয় বাজার থেকে রুই, বেলে, ল্যাটা এবং কই মাছ সংগ্রহ ক'রে তাদের ছবি তোলা হ'য়েছে। এরপর সরল মাইক্রোস্কোপে তাদের ত্বক পর্যবেক্ষণ ক'রে ছবি আঁকা হ'য়েছে। এইভাবে ত্বকে আঁশগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং বহিঃত্বকে আঁশগুলির লেগে থাকা ও সাজানো রীতি পর্যবেক্ষণ ক'রেছি এবং তাদের ছবি এঁকেছি (চিত্র ৩ক)। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার থেকে হাঙর সংগ্রহ ক'রে তারও একইভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রেছি।

বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণের পর কই, রুই, ল্যাটা ইত্যাদি মাছের আঁশ আলাদা-আলাদা ভাবে সংগ্রহ ও চিহ্নিত ক'রে পরীক্ষানলে ১% কষ্টিক পটাশের দ্রবণে আঁশগুলি পরিষ্কার ক'রে নিয়েছি। এই ভাবে আঁশের গা থেকে পেশী ও ত্বকের অংশ এবং অন্যান্য যাবতীয় ময়লা পরিষ্কার ক'রে

নেওয়ার পর পরিষ্কার জল দিয়ে ভালোভাবে কয়েকবার ধুয়ে নিয়েছি। এই ধুয়ে নেওয়া আঁশগুলি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মাত্রায় কোহলে (৩০ %—৫০%—৭০%) ২ ঘণ্টা মত রেখে ২-১ বার ৭০ % কোহল পাল্টে আঁশগুলি কোহলে (৭০%) দ্রবীভূত ইয়োসিন রঙের সাহায্যে ৫ মিনিট কাল রঙ ক'রেছি। বাড়তি রঙ৭০ %কোহলের সাহায্যে আঁশের গা থেকে ধুয়ে ফেলে যথাক্রমে ৯০ % ও১০০ % কোহলের মাধ্যমে উক্ত পন্থায় আঁশগুলির গা থেকে জল বিদুরিত করা হ'য়েছে। এই অবস্থায় আঁশগুলিকে আরও স্বচ্ছ ক'রে দেখার জন্য ক্লোভ অয়েল-এ কয়েক ঘণ্টা রেখে জাইলিন-এ দেওয়া হ'য়েছে। এরপর জাইলিন থেকে তুলে ডিপিএক্স দিয়ে স্থায়ীভাবে মাউন্ট ক'রে শুকোতে দিয়েছি।

কয়েকদিন পর স্থায়ী স্লাইডগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ ক'রে নিম্নলিখিত ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ ক'রেছি।

পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল

ত্বকের গঠন

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মতই মাছের ত্বকও দেহের আবরণ সৃষ্টি ক'রে, প্রথম সারির আত্মরক্ষা অঙ্গ হিসাবে রোগ প্রতিরোধের কাজ করে। এমনকি পরিবেশের যে সমস্ত শর্ত মাছের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে, ত্বকে সংবেদনশীল গ্রাহক থাকার ফলে সেগুলিকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এছাড়াও ত্বক শ্বসনে, রেচনে এবং অভিস্রবন বা আস্রাবন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এতদ্‌ব্যতীত ত্বকে রঞ্জক পদার্থ, বিভিন্ন গ্রন্থি, ইলেকট্রিক অঙ্গ ইত্যাদিও অবস্থান করে।

মাছের ত্বক দুটি স্তরে বিভক্ত যথা, বাইরের স্তর বা এপিডারমিস এবং অন্তঃস্তর বা ডারমিস বা কোরিয়াম। এই স্তরটি মানুষের মুখগহ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। স্তরটি সিক্ত এবং চ্যাপটা আঁইসাকৃতি কোষ দ্বারা নির্মিত। (চিত্র ৩গ)

চিত্র ৩. পার্শ্বরেখার নিকটস্থ দেহপ্রাচীরের কাটা অংশ (এপিডারমিস, আঁশ ও পেশীর সম্পর্ক)।

এপিডারমিসের ঠিক নীচেই একটি বেসমেণ্ট পর্দা থাকে। এই পর্দার ঠিক নীচেই ডারমিস অবস্থিত (চিত্র ৩গ)।

ত্বকের ডারমাল স্তরটি রক্তবাহিকা, স্নায়ু, ত্বকের ইন্দ্রিয় সকল ও সংযোগ কলা দ্বারা গঠিত।

এই ডারমাল স্তরটিই আঁশ সৃষ্টিতে এবং যাবতীয় বহিরাবরণীয় বিভিন্ন অঙ্গ গঠনে মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। এপিডারমিসের এই চ্যাপ্টাকৃতি কোষগুলির মধ্যে-মধ্যে অসংখ্য মিউকাস গ্রন্থির ছিদ্র উন্মুক্ত হয় এবং নলাকৃতি বা কুঁজাকৃতি গ্রন্থিগুলি ডারমাল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই গ্রন্থিগুলির মিউকাস নিঃসরণের ফলে মাছের দেহ ভীষণ পিচ্ছিল হয় এবং মাছের দেহ থেকে যে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় তা মিউকাসের জন্যই। এই স্তরে ক্রোমাটোফোর নামক কিছু রঞ্জক কোষ থাকার ফলে দেহের বর্ণ সৃষ্টি হয়।

ত্বকের আবরণ বা বহিঃকঙ্কাল

সিলুরিয়ান যুগের শেষ ভাগে পৃথিবীতে মৎস্য জাতীয় পূর্ব পুরুষদের দেখা যায়। এদের একটি গোষ্ঠী ছিল প্ল্যাকোডার্ম। এই মাছগুলির মাথা এবং দেহের সামনের দিকের বেশ কিছু অংশ প্লেট দিয়ে ঢাকা ছিল। বর্মের মত এই আচ্ছাদন অন্যান্য প্রাণীদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার সহায়ক ছিল। পরবর্তী কালে উন্নততর মাছের উদ্ভবের ফলে এই প্ল্যাকোডার্ম গোষ্ঠীর বিলুপ্তি ঘটে। প্ল্যাকোডার্মের ভারী শক্ত আবরণ তাদের দ্রুত গতিতে বাধা সৃষ্টি ক'রত। বিবর্তনের মাধ্যমে চোয়ালযুক্ত মাছের খাবারের সঙ্গে-সঙ্গে মাছের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে; গতি বৃদ্ধি পায় এবং শক্ত খোলাগুলি অকেজো হ'য়ে পড়ে। খোলার পরিবর্তে মাছের বহিঃত্বকের আবরণ হিসাবে হাল্কা ছোট ছোট আঁশের উদ্ভব হয়।

অতএব মাছের দেহাবরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল ত্বক উপাঙ্গ। এই ত্বক উপাঙ্গগুলির অন্যতম হ'ল আঁইশ বা আঁশ (scale)। বিভিন্ন মাছে এই আঁশ বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত। অবশ্য বেশ কিছু প্রজাতির মাছের ত্বক বা দেহাবরণ অনাবৃত। যেমন, মাগুর (**ক্ল্যারিয়াস বাট্রাকাস**), শিঙি (**হেটেরপ্নিউয়স্তিস ফসিলিস্**), আড় (**মিস্টাস্ এওর**), বান্ (**ইল্**) ইত্যাদি দেশী মিঠে জলের মাছ। আবার এমন অনেক বিদেশী মাছ আছে যাদের সমগ্র দেহই অনাবৃত কিন্তু গলা, বক্ষপাখনা এবং লেজের কাছে অল্প আঁশ দেখা যায়। যেমন উত্তর আমেরিকার প্যাড্‌ল ফিস্ বা পলিওড্‌ন। এক প্রকার মিঠা জলের মাছের (**সাইপ্রিনার্স কার্পিও**) দেহে তুলনামূলক ভাবে কিছু বড় আঁশ থাকায় দেহের বেশ কিছুটা অংশ তিনভাগে বিভক্ত। আবার অনেক মিঠে জলের বান্ মাছের (**অ্যাঙ্গুইলা**) ত্বকে এত ছোট আঁশ আছে যে আপাতদৃষ্টিতে তা অনাবৃত ব'লে মনে হয় কারণ আঁশগুলি ত্বকের অতি গভীরে প্রোথিত।

মাছের আঁশের আদর্শ গঠন প্রধানত মাছের ভ্রূণ অবস্থার কশেরুকা ও মায়োমিয়ার এবং তার খণ্ডকের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মাছের ত্বকে আঁশগুলি বাড়ীর ছাদের টালির মত একটির ওপর আর একটি সাজান থাকে ফলে মুক্ত কিনারাগুলি লেজের দিকে থাকে (চিত্র ৩ক) এজন্য সাঁতারের সময় জলের ঘর্ষণজনিত বাধা অনেক ক'মে যায়।

এই ধরনের বিন্যাসের বিপরীত বিন্যাস দেখা গেলেও তা দু-একটি প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনও-কোনও মাছের ক্ষেত্রে (ইল্, অ্যাঙ্গুইলা) আঁশের সজ্জনরীতি টালির মত না হ'য়ে মোজাইক্ ধরনের হয়।

চিত্র ৪. বিজ্ঞানাগারে আঁশের প্রকারভেদ পর্যবেক্ষণ।

আঁশের আকৃতি

যদিও মাছের আঁশের গঠন মূলত কয়েকপ্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবুও অনেক রূপান্তরিত ধরনও আছে যা কয়েক দল প্রজাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। প্রাচীন কালের অনেক মাছে, কময়েড, রম্বয়েড প্রভৃতি ধরনের আঁশ দেখা গেলেও বর্তমানে অধিকাংশ মাছে প্রধানতঃ তিনপ্রকার আঁশ দেখা যায়।

প্রথমতঃ আমরা মাছের আকৃতি এবং গঠনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ক'রতে পারি (চিত্র ৪ ও ৫)। আকৃতির ভিত্তিতে একটি প্রকার হ'ল প্লেটাকৃতি বা প্ল্যাকয়েড।

প্রতিটি প্লেটে একটি সূচাল চূড়া অবস্থিত। হাঙর জাতীয় মাছ হ'ল এই ধরনের আঁশের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হাঙর, টরপেডো প্রভৃতি তরুণাস্থি মাছের শক্ত খসখসে চামড়ার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ লক্ষ-লক্ষ আঁশ থাকতে পারে। এদের সহজে পৃথক করা যায় না। এপিডারমিসের বহির্ভাগে অবস্থিত অসংখ্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বালিদানার ন্যায় প্ল্যাকয়েড আঁশ এদের বহিঃকঙ্কাল গঠন করে। এগুলি কয়েকটি স্বতন্ত্র সারিতে বিন্যস্ত থাকে। এদের অগ্রভাগ দেহের পশ্চাৎদিকে নির্দেশিত থাকে। একটি প্ল্যাকয়েড আঁশ দুটি অংশ দ্বারা গঠিত। উর্দ্ধভাগে অবস্থিত কণ্টক (spine) এবং নিম্নভাগে অবস্থিত বেসাল প্লেট (চিত্র ৫)। বেসাল প্লেট অংশ ত্বকের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় থাকে, এটি ডারমিসে তন্তু দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। বেসাল প্লেটের অন্তঃস্থ দিকে একটি ছিদ্র থাকে যা একটি পাল্প গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। সজীব অবস্থায় পাল্প গহ্বরটি অসংখ্য ওডোনটোব্লাস্ট, রক্তনালী, স্নায়ু এবং লসিকা নালী দ্বারা পূর্ণ থাকে। কণ্টক অংশটি ত্বকের উপরে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এর অগ্রাংশ তিনটি সূচালো অংশে বিভক্ত থাকে। কণ্টক অংশের বহির্ভাগ মসৃণ নয়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে একে স্তরীভূত দেখায়। কণ্টকের অন্তঃস্থ আবরণটি ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমন্বিত ডেনটিন দ্বারা গঠিত। এটি অসংখ্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শাখান্বিত নালীযুক্ত এবং বহির্ভাগে একটি শক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে ব'লে একে এনামেল বলে (চিত্র ৩খ)।
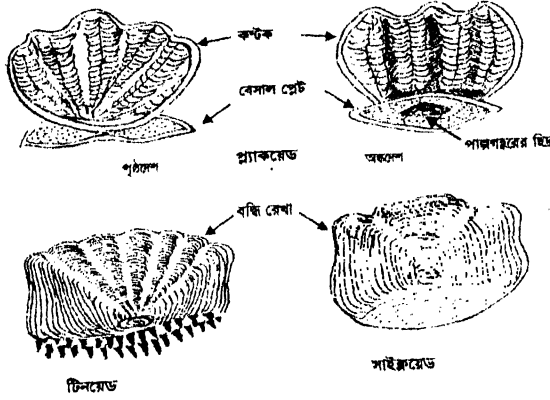
চিত্র ৫. বিভিন্ন প্রকার আঁশের গঠন।

দ্বিতীয় আর একটি প্রকার হ'ল সাইক্লয়েড (চিত্র ৫)। এইরূপ নামকরণের প্রধান কারণ আঁশগুলি ডিস্কের মত পাতলা গোলাকৃতি। রুই, কাতলা, মৃগেল, পুঁটি ইত্যাদি মাছের ত্বকে এই ধরনের আঁশ দেখা যায়। আঁশ এবং ফিন্-রে সামগ্রিক বহিঃকঙ্কাল গঠন করে। আঁশ ডারমিস বা অন্তস্ত্বক থেকে উৎপন্ন হয়। ডিস্ক বা প্লেটের ন্যায় আঁশগুলির কেন্দ্রস্থল স্থূল এবং কিনারার দিক ক্রমশ পাতলা। প্রতিটি আঁশের গায়ে কতকগুলি চক্রাকার রেখা বর্তমান। চক্রাকার রেখাগুলিকে 'বৃদ্ধি-রেখা' (lines of growth) বলে (চিত্র ৫)। মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আঁশের আকার বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বছরের সব ঋতুতে দেহের মত আঁশের বৃদ্ধি সমান হয় না। গ্রীষ্মকালে আঁশের বৃদ্ধি বেশী হয়। কিন্তু শীতকালে বৃদ্ধির হার ক'মে যায়। বৃদ্ধির হারের আনুপাতিক হ্রাস-বৃদ্ধি আঁশের গায়ে চক্রাকার রেখারূপে প্রতিভাত হয়। আঁশের একটি চক্র-রেখার উপস্থিতি একটি বাৎসরিক ঘটনা। সুতরাং চক্র-রেখার সংখ্যা মাছের বয়েস নির্দেশ করে। অর্থাৎ একটি আঁশের গায়ে চক্র-রেখার সাহায্যে সেই মাছের বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব।

তৃতীয় প্রকারটি হ'ল টিনয়েড (চিত্র ৫) যার পশ্চাদপৃষ্ঠ (মুক্ত প্রান্ত) বা কিনারা-তল চিরুনীর মত। কই, বেলে প্রভৃতি মাছ হ'ল এ জাতীয় আঁশের আদর্শ উদাহরণ।

চতুর্থ প্রকারটি হ'ল রম্বয়েড বা ডায়মণ্ড আকৃতির। এই ধরনের আঁশ সচরাচর আমাদের এখানে দেখা যায় না। উত্তর আমেরিকার গার, নাইলের রীড্ এবং আমেরিকান প্যাডেল (পলিওডন) প্রভৃতি মাছের ল্যাজের দিকে এই ধরনের আঁশ দেখতে পাওয়া পাওয়া যায়।

গঠনগত প্রকারভেদ

প্রকৃতপক্ষে গঠনগত বিচারে আঁশকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; একটি হ'ল প্ল্যাকয়েড, অপরটি হ'ল নন-প্ল্যাকয়েড। নন-প্ল্যাকয়েড আঁশ প্রাথমিক ভাবে তিনপ্রকার, যথা কসময়েড, গ্যানোয়েড

এবং বোনি রীজ্। এছাড়াও কঠিনাস্থি মাছে সূক্ষ্ম কাঁটার মত থেকে শুরু ক'রে কঠিন বর্মের আকারে আঁশের আকারে বহু প্রকার রূপান্তর দেখা যায়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণগুলি আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে মাছের আঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। সীমিত সময়ের মধ্যে যে পরীক্ষা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'য়েছে তা যথেষ্ট নয়। আলোচ্য প্রোজেক্টটির সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহকালে গ্রন্থপঞ্জী আলোচনা ক'রে বুঝতে পারি যে বিষয়টির ব্যাপ্তি বিশাল, ফলে এই স্বল্প সময়ে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাও সম্ভব নয়। উপস্থিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টিকে তাই সংক্ষিপ্ত সীমার মধ্যেই আলোচনা করা হ'ল।

প্রাণীজগতের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মৎস্য রাজ্য। আর পাঁচটি প্রাণীর মতই মাছের ত্বকও প্রধানতঃ দেহের অন্তরযন্ত্ররক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিশেষত্ব হ'ল এই যে এদের ত্বক শ্রেণী বা প্রজাতি ভেদে কোথাও আঁশ দ্বারা আবৃত, কোথাও বা একেবারেই অনাবৃত। আঁশদ্বারা আবৃত ত্বক সরীসৃপ জাতীয় কিছু প্রাণীদের মধ্যে দেখা গেলেও মাছেদের বেলায় বিশেষত্ব এই যে আঁশের প্রকারভেদ (প্ল্যাকয়েড, টিনয়েড, সাইক্লয়েড, গ্যানয়েড, কসময়েড ইত্যাদি) কেবলমাত্র মাছেদেরই একান্ত ব্যক্তিগত, আর কারও নয়। এছাড়া গঠনশৈলীতে মাছেদের আঁশ ডেন্টাইন, এনামেল, পাল্প ইত্যাদি স্তর থাকার ফলে তা মানুষের দাঁতের সঙ্গে তুলনীয়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আর কোনও প্রাণীর বেলায় দেখা যায় না।

মৎস্যবিদ্যায় আঁশ নামক ত্বকের এই উপাঙ্গটি একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে এমনকি মাছই এক দিকে আধুনিক মানুষের পূর্বসূরী, এ তত্ত্বও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মাছের আঁশের গঠন, আকৃতি এবং প্রকারভেদ সংক্রান্ত আধুনিক তথ্যাদি মাছের বয়েস নির্ধারণে (অ্যানুলির দ্বারা) এবং শ্রেণী ও প্রজাতি বিচারে এক উল্লেখযোগ্য দিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে-কোনও এক খুনের ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছিল এই মাছের আঁশের সাহায্যেই।

এতদ্‌ভিন্ন ঘর সাজানোর শিল্পের বা শিল্পের নানা উপকরণে, সার হিসেবে, 'ফিস্-গ্লু' নামক আঠা তৈরির কাজে মাছের আঁশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে বিগত কয়েক বছরে (১৯৯০-১৯৯৮) মৎস্য সংক্রান্ত যে সমস্ত গবেষণামূলক পরীক্ষার বা প্রোজেক্টের কাজের হিসাব আমাদের স্কুলে (শিক্ষাসত্রে) পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে উপস্থিত আলোচ্য বিষয়টি স্থান পায় নি। সেদিক থেকে বিষয়টি নতুনত্বের দাবী রাখে। সময় সংক্ষেপ এবং সীমিত সুযোগের জন্য কাজটি অসমাপ্ত র'য়ে গেল। আলোচ্য কাজটি ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজের দিক্‌নির্দেশ ক'রবে ব'লে ম'নে করি।

অতএব উপস্থিত কাজের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মাছের আঁশ প্রজাতিভেদে বিভিন্ন হ'লেও, ভিন্নতার মধ্যে যে একতা লক্ষ করা যায় তা হ'ল বেশীর ভাগ মাছের ত্বক বা চর্ম আঁশ দ্বারা আবৃত।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

উপরোক্ত প্রোজেক্টের কাজটি সম্পন্ন করাকালীন বিভিন্ন সময়ে ল্যাবোরেটরী, লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়ায় আমি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের জীবন বিজ্ঞানের শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ ঈপ্সা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বক্ষণ পরামর্শ ও সহায়তা না পেলে এই কাজটি বিজ্ঞানসম্মত হ'ত না। বিজ্ঞানাগারের সহায়ক অসিত গড়াই যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানাগার ব্যবহারের সুযোগ ক'রে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। ডঃ সৌরব্রত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ, কাজটির রূপায়ণে যে সাহায্য ক'রেছেন, ধন্যবাদের দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ্য নয়। পিতামাতার খুঁটিনাটি সাহায্য ছাড়া এ কাজ অসমাপ্ত থেকে যেত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। জীবন বিজ্ঞান (দশম শ্রেণী) - সাঁতরা ও চৌধুরী।
২। প্রাণীবিদ্যা (স্নাতক শ্রেণী) - রণজিৎ বাগ ও আমিনুল ইসলাম।
৩। Ichthiology - Lagler.
৪। Life-Science Project Vol. I 1996, 1998 of Siksha-Satra.
৫। Life-Science Project Vol. II 1991, 1993, 1997 of Siksha-Satra.
৬। সমকালীন প্রাণীবিদ্যা (স্নাতক শ্রেণী) - ডঃ সীমানন্দ অধিকারী ও অরূপ কুমার সিংহ।
৭। General Zoology - Storer/Usinger/Stebbins/Nybakken.
৮। Outlines of Biology - Das & Mukherjee.

বাষ্পমোচনের হার ও পাতার ক্ষেত্রফল : পারস্পরিক সম্পর্ক

বিমলকুমার ঘোষ (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

ছোট থেকেই আমি শুনে আসছি যে গাছ তার মূল দ্বারা শোষিত, সালোক সংশ্লেষের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল, পাতার (পত্ররন্ধ্রের) মাধ্যমে বের ক'রে দেয়। এ-তথ্য বিজ্ঞানীরাও প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন। আমিও পরীক্ষা ক'রে দেখেছি গাছ বাষ্পমোচন করে। নানা বই বা পত্রিকার মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে গাছের বাষ্পমোচনের হার নানা শর্তের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল পাতার আয়তন। স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকার সাহায্যে আমি যে প্রজেক্টটি নিজে হাতে-কলমে ক'রে দেখতে সক্ষম হ'য়েছি তা হ'ল অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে পাতার আয়তনের উপর বাষ্পমোচনের হার নির্ভর করে। সুতরাং আমার এই প্রজেক্টটি করার উদ্দেশ্য হ'ল বাষ্পমোচনের হার পাতার আয়তনের উপর নির্ভর করে কিনা তা দেখা।

উপকরণ ও পদ্ধতি

একটি কচুপাতা, একটি ছোট করবী ডাল, দুটি কনিক্যাল ফ্লাস্ক, জল, সরষের তেল, তুলাযন্ত্র।

একটি বৃন্তযুক্ত বড় কচুপাতা এবং ছোট একটি করবী ডাল ব্লেড দিয়ে কেটে নিলাম। প্রথমে দুটি কনিক্যাল ফ্লাস্ককে সমপরিমাণ জল দ্বারা কিছুটা পূর্ণ করা হ'ল। কনিক্যাল ফ্লাস্কের একটিতে কচুর বৃন্ত ও অপরটিতে করবীর ডাল ডোবান হ'ল। এমনভাবে ডোবান হ'ল যেন কচুপাতা ও করবী পাতাগুলি কনিক্যাল ফ্লাস্কের বাইরে থাকে। এবার জলের উপরে কিছুটা সরষের তেল ঢেলে দিলাম। সরষের তেল না দিলে সূর্যের তাপে জল বাষ্প হ'য়ে বেরিয়ে যাবে, ফলে বাষ্পমোচনের সঠিক পাঠ নেওয়া যাবে না। এই অবস্থায় কনিক্যাল ফ্লাস্কটির তুলাযন্ত্রের সাহায্যে ওজন নেওয়া হ'ল। এবার ফ্লাস্কটিকে রোদ্দুরে পাঁচ দিন রেখে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেকদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এর ওজন নেওয়া হ'ল।
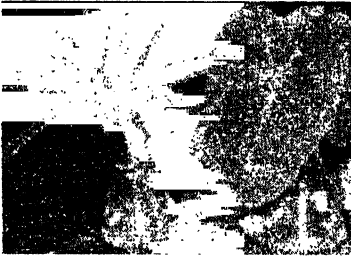
চিত্র. করবী ও কচু পাতার বাষ্পমোচন পরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ

২০-১২-৯৮ তারিখে দুটি ফ্লাস্কসহ অন্যান্য উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করা হ'ল। পরীক্ষা শুরুর পরদিন থেকেই গাছ দুটিকে ও ফ্লাস্ক-এর জলের দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রলাম। লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পারলাম পরীক্ষা শুরুর পরদিন অর্থাৎ (২১-১২-৯৮) তারিখে দুটি ফ্লাস্ক-এর জল কিছুটা ক'রে ক'মেছে। দ্বিতীয় দিন পুনরায় জল ও গাছসহ ফ্লাস্ক দুটিকে ওজন ক'রলাম। দেখা গেল পরীক্ষা শুরুর সময় যা ওজন ছিল দ্বিতীয় দিনে তার থেকে দুটি ফ্লাস্ক-এরই কিছুটা ক'রে ওজন ক'মেছে। ফ্লাস্ক দুটির যা ওজন হ'ল সেই ওজন দুটিও পূর্বের লেখা ওজন দুটির নিচে লেখা হ'ল। এইভাবে পরপর পাঁচদিন গাছ ও জলসহ ফ্লাস্ক দুটিকে পৃথক-পৃথক ভাবে ওজন ক'রে পূর্বের নেওয়া ওজনের নীচে লেখা হ'ল। এই ভাবে পাঁচদিন পর্যবেক্ষণের পর দেখতে পেলাম দিনের পর দিন গাছ ও জলসহ ফ্লাস্ক দুটির ওজন ক্রমশ ক'মে যেতে থাকল। এই ওজনগুলি পরে তালিকার আকারে লিখে রাখা হ'ল ও গ্রাফ পেপারে এই ক্রমহ্রাসমান ওজনের একটি লেখচিত্র অঙ্কিত করা হ'ল। পরীক্ষার শেষ দিন অর্থাৎ ২৫-১২-৯৮ তারিখে পূর্বের ওজনগুলির নীচে লিখে রাখলাম। ফ্লাস্ক দুটিকে ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে পেলাম ফ্লাস্ক দুটির মধ্যে অনেকটা ক'রে জল গাছদুটির পাতার পত্ররন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে বাষ্পীভূত হ'য়েছে।

সীমাবদ্ধতা

(ক) সূর্যের আলো কম বা বেশী হ'লে পরীক্ষার ফল প্রভাবিত হবে। (খ) বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ কম/বেশী হ'লে পরীক্ষার ফল প্রভাবিত হবে। (গ) গাছ দুটির সতেজতার উপর পরীক্ষার ফল নির্ভর ক'রবে।

সিদ্ধান্ত

এইভাবে পাঁচদিন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে উদ্ভিদ তার মূল কিংবা কাণ্ডের কাটা অংশ দিয়ে জল শোষণ করে এবং সেই শোষিত জলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পাতার সাহায্যে বাষ্পাকারে বের হয়। পর্যবেক্ষণের সময় লক্ষ্য ক'রেছিলাম যে একই পরিমাণ মতো জল দুটি ফ্লাস্ক-এ নেওয়া সত্ত্বেও করবী গাছটির তুলনায় কচুগাছটি কিছুটা বেশী জল বাষ্পমোচন ক'রেছে। এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে করবী ডালটিতে যতগুলি পাতা ছিল তার ক্ষেত্রফল কচুপাতাটির ক্ষেত্রফলের তুলনায় কম। তাই যেহেতু কচুগাছটির পাতার ক্ষেত্রফল (২৫.৫ বর্গসেমি) বেশী সেহেতু ঐ ফ্লাস্কের জল বেশী ক'মেছে। অর্থাৎ কচুগাছটির পাতাগুলির দ্বারা জল বেশী বাষ্পীভূত হ'য়েছে এবং ঠিক এর বিপরীত অবস্থা ঘ'টেছে করবী গাছটির ক্ষেত্রে। করবী পাতাটির ক্ষেত্রফল (১৯.১ বর্গসেমি)। এরপর কচুগাছটির পাতাটিকে তুলাযন্ত্রের সাহায্যে ওজন করা হ'ল। ঐ ওজন সমান বিশিষ্ট একটি পিচবোর্ডের সাহায্যে বর্গক্ষেত্র তৈরী করা হ'ল। ক্ষেত্রফল ৮×৮ = ৬৪ বর্গসেমি। যা পাতার ক্ষেত্রফলের সমান। অনুরূপে করবী পাতাটিরও ক্ষেত্রফল বের করা হ'ল। সুতরাং এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি

যে গাছের পাতার ক্ষেত্রফল যত বেশী হয় সেই গাছের বাষ্পমোচনের হারও তত বেশী। বিপরীত পক্ষে যে গাছের পাতার ক্ষেত্রফল যত কম সেই গাছের বাষ্পমোচনও তুলনামূলক ভাবে প্রথমটির তুলনায় কম। অর্থাৎ এক কথায় সিদ্ধান্তটি হ'ল উদ্ভিদের বাষ্পমোচনের হার উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমানুপাতিক। দুটি পাতারই ওজন ও ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ গাণিতিক আকারে নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১৮২৩ মিলিগ্রামের ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গসেমি.

১ " " $\frac{১৬}{১৮২৩}$ বর্গসেমি.

২১৮৬ " " $\frac{১৬ \times ২১৮৬}{১৮২৩}$ = ১৯.১৮ বর্গসেমি

১৮২৩ মিলিগ্রামের ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গসেমি.

১ " " $\frac{১৬}{১৮২৩}$ বর্গসেমি.

২২১৬ " " $\frac{১৬ \times ২২১৬}{১৮২৩}$ = ১৯.৪৪ বর্গসেমি.

তারিখ	জল ও ফ্লাস্কসহ কচুগাছটির ওজন	জল ও ফ্লাস্কসহ করবী গাছের ওজন
২০.১২.৯৮	২৮০ গ্রাম	২৬০ গ্রাম
২১.১২.৯৮	২৭৭ গ্রাম	২৫৮ গ্রাম
২২.১২.৯৮	২৭৪ গ্রাম	২৫৬ গ্রাম
২৩.১২.৯৮	২৭১ গ্রাম	২৫৪ গ্রাম
২৪.১২.৯৮	২৬৮ গ্রাম	২৫২ গ্রাম

উপরোক্ত হিসাবনিকাশ পর্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় যে প্রথম মাপ থেকে দ্বিতীয় মাপ তুলনামূলকভাবে কিছু কম হ'য়েছে এবং কনিক্যাল ফ্লাস্কের জলও কিছু ক'মেছে। কারণ ফ্লাস্কের জলে ডোবানো কচুপাতাটির বৃন্ত দিয়ে ফলকের পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমেই জল বাইরে বেড়িয়ে গেছে।

অতএব দেখা গেল যে কচু পাতার ফ্লাস্কের জল ক'মেছে ২ গ্রাম অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কচুপাতার বেশী বাষ্পমোচন হ'য়েছে। কচুপাতার আয়তন ছিল করবী পাতার আয়তনের থেকে বেশি তাই এর থেকে বোঝা যায় পাতার আয়তন বাড়লে বাষ্পমোচনের হার বাড়ে পাতার আয়তন কমলে বাষ্পমোচনের হার ক'মে। কচি পাতার বাষ্পমোচন কম হয়। বৃদ্ধ পাতায় বাষ্পমোচন বেশী হয় কারণ তাদের পাতার আয়তন কম বেশী হয়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই প্রজেক্টটি করার জন্য আমাকে আমাদের শিক্ষিকা ও শিক্ষক নানা দিক থেকে সাহায্য ক'রেছেন। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

জলদূষণে ভারী ধাতবমৌলের প্রভাব

স্নেহবিন্দু সরকার ও কিংশুক চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলেও এমন কিছু-কিছু জড় পদার্থ আছে, প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষায় যাদের অবদান অপরিহার্য। এদের মধ্যে জল অন্যতম। বর্তমানে মানুষ সভ্যতার পথে পা বাড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে জলের ব্যবহার আরও বাস্তবতা লাভ ক'রেছে। এখন শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়, কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের ব্যবহার সকলেরই জানা। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারতার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের পরিবেশে নূতন এক অধ্যায় খুলে গেছে তার নাম "দূষণ"। সর্বব্যাপী রোগের মতো জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তিন জায়গাতেই এর সমান দাপট।

জল দুই প্রকার। Underground Water এবং Surface Water। Underground Water বা ভৌমজল দূষণের নাগালের বাইরে। দূষিত হ'চ্ছে উপরিতলের জল। এই দূষণের ফলে জলজ প্রাণীর (প্রধানত মাছ) কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা দেখার জন্য আমরা এই প্রোজেক্ট নিয়েছি।

উপকরণ

৩০টি ল্যাটামাছের (*Channa Punctatus*) ওজনের জন্য single pan দাঁড়িপাল্লা, Electronic balance (বিষ মাপার জন্য), ৩টি ছোট এবং বড় অ্যাকুয়ারিয়াম, কাঁচের বিকার, $HgCl_2$ 40 mg. এবং $HgCl_2$ 12.16 gm., pH কাগজ, সেলসিয়স্ থার্মোমিটার ও সেন্টিমিটার স্কেল।

ল্যাটা মাছ (*Channa Punctatus*)

ল্যাটামাছের দেহটি লম্বা নলের মতো। রঙ কালচে সবুজ। সারা দেহে কালো ছোপ থাকে। পিঠের দিকের দাগগুলি পেটের দিকের দাগ অপেক্ষা বড়। পৃষ্ঠ পাখনাতেও দাগ আছে। মুখের দু'ধারে লম্বা দাগ থাকে। মাথা নীচের দিকে চাপা, অনেকটা সাপের মতো তাই এদের 'Snake headed' বলে। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। লেজের পাখনা গোলাকার রুই মাছের মতো বিভক্ত নয়।

ল্যাটা মাছ নিশাচর প্রাণী সেজন্য সন্ধ্যার পর এদের তৎপরতা শুরু হয়। তীর্যকভাবে জল থেকে উঠে বায়ুর অক্সিজেন নেয়। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র বর্তমান। এক জায়গায় দলগতভাবে থাকার প্রবণতা দেখা যায়।

ক্যাডমিয়াম

পর্যায় সারণীর পঞ্চম পর্যায়ের ১২তম মৌল। এর পারমাণবিক গুরুত্ব ১১০.০১ অর্থাৎ এটি একটি ভারী ধাতব মৌল (Heavy Metal)।

মার্কারি

পর্যায় সারণীর ষষ্ঠ পর্যায়ের ১২তম মৌল। পারমাণবিক গুরুত্ব ২০২.৬১ এটিও একটি ভারী ধাতব মৌল (Heavy Metal)।

উপরোক্ত ধাতু দুটিকে আমরা প্রোজেক্ট-এর জন্য বেছে নিয়েছি, কারণ আমরা জানি পালিশ ক'রবার কারখানা থেকে ক্যাডমিয়াম-জাত যৌগ এবং ব্যাটারী কারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে মারকারি (Hg) জলে মেশে যেহেতু ধাতুগুলি সরাসরি জলে দ্রবীভূত হয় না সেজন্য এই ধাতু দুটির ক্লোরাইড যৌগ নিয়ে আমরা কাজ ক'রেছি।

$CdCl_2$ এবং $HgCl_2$ দুটি যৌগকে আলাদাভাবে দুটি অ্যাকুরিয়ামে ৩০ লিটার ক'রে জলে মিশিয়ে, কৃত্রিমভাবে জল দূষিত ক'রে তার মধ্যে ল্যাটা মাছ রেখে, তাদের আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করাই আমাদের এই প্রোজেক্ট-এর উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

প্রাথমিক কার্যবিধি

প্রথমে তিনটি একই মাপের অ্যাকুরিয়াম নিয়ে তাদের পাশাপাশি রাখা হ'ল। আবার প্রত্যেকটিতে ৩০ লিটার ক'রে বিশুদ্ধ জল রাখা হ'ল। পূর্বে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত যে ৩০ লিটার জলে মোটামুটি ৫০ gm. ওজনের ১০টি মাছ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাই প্রত্যেকটিতে ১০টি ক'রে ল্যাটা মাছ দেওয়া হ'ল। যাদের গড় ওজন ৬০ gm. এবং গড় দৈর্ঘ্য ১৭.৫ cm. বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা নিয়ে দেখা গেল ৩০° C এবং pH paper দ্বারা ঐ জলের pH মেপে দেখা গেল 6.5 অর্থাৎ জলটি কিছুটা আম্লিক।

বিষ প্রয়োগের পূর্বে মাছের আচরণবিধি

জল দূষণকারী ধাতব যৌগগুলি মিশ্রিত ক'রবার পূর্বে মাছগুলির মধ্যে দলগতভাবে থাকার প্রবণতা দেখা গেছে। এছাড়া তারা মাঝে-মধ্যে জলতলের উপরে উঠে আসছিল বাতাস গ্রহণের জন্য। ১০টি মাছকে আলাদাভা... অনুশীলন ক'রে দেখা গেল যে ল্যাটা মাছগুলি মোটামুটি ২ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড পরপর জলতলের উপরে উঠে আসছিল বাতাস গ্রহণ করার জন্য। এর মধ্যে তারা ২ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড অ্যাকুয়ারিমের তলদেশে এক জায়গায় স্থির হ'য়ে ছিল এবং মোটামুটি ১০ সেকেণ্ড জলের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রেছিল।

বিষপ্রয়োগ

(Single pan Electronic) তুলাযন্ত্রের সাহায্যে $HgCl_2$ ৪০ মিলিগ্রাম এবং $CdCl_2$ ১২.১৬ গ্রাম ওজন ক'রে দুটি পৃথক-পৃথক বীকারে সংগ্রহ করা হ'ল।

বীকার দুটিতে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে কাঁচদণ্ডের সাহায্যে ধাতব যৌগগুলিকে জলের মধ্যে দ্রবীভূত করা হ'ল। তিনটি অ্যাকুয়ারিমের মধ্যে দুটিকে চিহ্নিত করে তাদের একটিতে

$HgCl_2$ এবং অপরটিতে $CdCl_2$ মিশ্রিত করা হ'ল।

ফলাফল

জলের পরিবর্তন

বিষদুটি অ্যাকুয়ারিয়ামের জলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হবার পর দেখা গেল জল সামান্য ঘোলা হ'য়ে গেল। $HgCl_2$ মিশ্রিত জল অপেক্ষা $CdCl_2$ মিশ্রিত জল অধিক মাত্রায় ঘোলা হ'য়ে গেল। এর সঙ্গে-সঙ্গেই pH এবং উষ্ণতার পরিবর্তন দেখা গেল। যেমন $HgCl_2$ মিশ্রিত জলের pH ৭ (০.৫ বেড়েছে)। অর্থাৎ জলের অম্লতা হ্রাস পেয়েছে ওই জলের উষ্ণতা মেপে দেখা গেল ২৯°C (১° ক'মেছে)। অর্থাৎ জল এবং $HgCl_2$ এর পারস্পরিক বিক্রিয়াটি একটি তাপশোষক বিক্রিয়া। অন্যদিকে $CdCl_2$ মিশ্রিত জলের pH ৬ (০.৫ ক'মেছে)। অর্থাৎ জলের অম্লতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই জলের উষ্ণতা নিয়ে দেখা গেল ৩০°C (১°C বেড়েছে)। অর্থাৎ জল এবং $CdCl_2$'র পারস্পরিক বিক্রিয়াটি একটি তাপোদ্পাদক বিক্রিয়া।

চিত্র. অ্যাকুয়ারিয়ামে কৃত্রিম দূষণের বিভিন্ন মাত্রায় মাছেদের প্রতিক্রিয়া।

বিষপ্রয়োগের পর মাছের তাৎক্ষণিক আচরণবিধি

$HgCl_2$ মিশ্রিত জলপূর্ণ অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছগুলি ছটফট ক'রছিল এবং ঘনঘন (মোটামুটি ৩ সেকেণ্ড অন্তর) জলের উপরিতলে উঠে এসে বাতাস নেবার চেষ্টা ক'রছিল। আরও ১৫ মিনিট পর মাছগুলি নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ল এবং ক্রমে তাদের বিচরণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, জলের তলদেশে পাত্রের গায়ে লেগে থাকার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

$CdCl_2$ মিশ্রিত জলপূর্ণ অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছগুলিও ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়েছিল $HgCl_2$ অপেক্ষা বেশী মাত্রায়। কারণ এই পাত্রের মাছগুলি প্রায় ২৫ মিনিট পর পর অক্সিজেন সংগ্রহ করার জন্য জলের উপরে উঠে আসছিল।

২৪ ঘণ্টা পরে দেখা গেল
$CdCl_2$ মিশ্রিত জলে রাখা ল্যাটা মাছগুলির প্রত্যেকটিরই (১০টিরই) মৃত্যু ঘ'টেছে। কিন্তু $HgCl_2$ মিশ্রিত জলে রাখা মাছগুলি প্রত্যেকটিই (১০টিই) বেঁচে আছে তবে নিস্তেজ অবস্থায়। $CdCl_2$এবং $HgCl_2$এর pH পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে গেছে এবং তাদের উষ্ণতা যথাক্রমে $HgCl_2$এর ৩° C ক'মেছে। এবং $CdCl_2$এর কোন পরিবর্তন হয় নাই।

উপসংহার ও সিদ্ধান্ত

এই প্রোজেক্টের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছি যে, $CdCl_2$ ও $HgCl_2$ এই দুটি ভারী ধাতব যৌগই হ'ল জল দূষণকারী পদার্থ, যা জলে মিশ্রিত হ'য়ে জলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটায় ফলে, জলজ প্রাণীদের মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ধাতব যৌগদুটিকে বিষ হিসাবে জলে প্রয়োগ করা হ'য়েছে তাদের মধ্যে $HgCl_2$ খুবই কম পরিমাণে এবং $CdCl_2$ সে তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হ'য়েছে। কারণ $HgCl_2$ যৌগটির বিষাক্ততা অনেকবেশি।

আমরা এই প্রোজেক্টের জন্য Hg ও Cd-কে বেছে নিয়েছি। কিন্তু এইগুলি ছাড়াও আরও অনেক মৌল আছে যারা প্রতিনিয়ত জলে মিশে জলকে দূষিত ক'রছে। যেমন, ধাতু— সীসা, ক্রোমিয়াম; অধাতু— ফেনল, সায়ানাইড, অ্যামোনিয়া; তেজস্ক্রিয় পদার্থ— স্ট্রনসিয়াম (Sr), সেসিয়াম (Cr) ইত্যাদি। অতএব নিঃসন্দেহে, উপস্থিত প্রোজেক্টের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে, জলপরিবেশ দূষণে উক্ত ধাতব মৌলগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার, একদিন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি ক'রবে। আজ সমগ্র মানবজাতির একমাত্র সংকল্প ও কর্তব্য হওয়া উচিত জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা। কেননা জলের অপর নাম তো 'জীবন'।

গ্রন্থপঞ্জী

১। উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) — গুহ, দাশগুপ্ত, সাঁতরা।
২। উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) — অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী।
৩। শিক্ষাসত্র জীবনবিজ্ঞান প্রোজেক্ট — ১৯৯৫-১৯৯৬; ১৯৯৬-১৯৯৭ ১ম খণ্ড; ২য় খণ্ড।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমাদের এই প্রোজেক্টটি ক'রতে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন অম্বুজদা, শেলীদি, ঈপ্সাদি ও শিক্ষাভবনের অন্যান্য দাদা-দিদিরা। এঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভিন্ন মাটিতে ছোলাগাছের *(Cicer arietinum)* তুলনামূলক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

রামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশালী দাস (১৯৯৮)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

বিশ্বভারতীর স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রমে জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে একটি প্রোজেক্ট ওয়ার্ক অবশ্য করণীয়। "প্রোজেক্ট" কথাটির অর্থ হ'ল পরিকল্পনা। কিন্তু উপস্থিত কাজটি সেরূপ বৃহৎ এবং গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমি শুধু সহজলভ্য উপকরণ এবং আমার সীমিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই এই 'প্রোজেক্টে'র কাজ হাতে নিয়েছি।

স্কুল জীবনের শুরু থেকেই আমরা অর্জন ক'রে চ'লেছি পুঁথিগত বিদ্যা। হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ পেয়ে পুঁথিগত বিদ্যাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ পাওয়ায় আমাদের মনে ঔৎসুক্যের সঞ্চার হ'য়েছে।

উপস্থিত প্রোজেক্টে আমি "বিভিন্ন মাটিতে ছোলাগাছের তুলনামূলক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ" এই শিরোনামে ছোলা গাছের বিভিন্ন মাটিতে কেমন প্রস্থ বা বেড় এবং একটি শাখা থেকে অন্য শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ইত্যাদি উদ্ভিদের নানা বৃদ্ধির দিকগুলি নিয়ে কাজ ক'রেছি।

ছোলা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম **'সাইসার এরিয়েটিনাম'**। ছোলা বর্বজীবী ও বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। মটরের মত ছোলাও একটি রবিশস্য। ছোলা বীজে শতকরা ২৫ ভাগ প্রোটিন ছাড়াও শ্বেতসার ও খনিজ লবণ প্রভৃতি বর্তমান। ছোলা আমাদের দেশে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় চাষ করা হয়। ছোলা মাটিতে ফেলার তিনমাস পর ছোলাগাছে শুঁটি ধরে।

উপকরণ ও কার্যপদ্ধতি

(ক) তিনটি ছয় ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট টব, (খ) কয়েকটি ছোলা বীজ, (গ) তিন রকমের মাটি— যথাক্রমে এঁটেল মাটি, বেলে মাটি এবং দোঁয়াস মাটি, (ঘ) গাছগুলির উচ্চতা মাপার জন্য একটু সুতো ও একটি স্কেল, (ঙ) কিছু পরিমাণ খইল ও ইউরিয়া সার, (চ) জল।

প্রথমে ছয় ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট তিনটি টবে তিন রকমের মাটি ভরা হ'ল। মাটিগুলি যথাক্রমে এঁটেল মাটি, বেলে মাটি এবং দোঁয়াস মাটি। এবার ২৪।১০।৯৭ তারিখে তিনটি টবে তিনটি ছোলা বীজ লাগানোর পর টবগুলির ধারে-ধারে কিছু পরিমাণ ইউরিয়া সার ও খইল মিশিয়ে দিলাম। সাত দিন অন্তর-অন্তর আমরা বীজগুলিকে লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম।

পর্যবেক্ষণ :

৩১।১০।৯৭ তারিখে দেখলাম এঁটেল মাটিযুক্ত টবের গাছটির উচ্চতা ১.৯ সেমি. বৃদ্ধি পেয়েছে। গাছটির কাণ্ডের প্রস্থ (বেড়) হ'য়েছে .৭ সেমি. এবং শাখাগুলির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৬ সেমি. হ'য়েছে।

বেলে মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ৯.৬ সেমি., গাছটির প্রস্থ (বেড়) হ'য়েছে .৩ সেমি. এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার দূরত্ব হ'য়েছে ২.২ সেমি.।

দোঁয়াস মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ১৫ সেমি.। গাছটির প্রস্থ (বেড়) হ'য়েছে ৮ সেমি. এবং গাছটির শাখা থেকে অন্য শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ২.৯ সেমি. হ'য়েছে।

৭।১১।৯৭

আজ তিনটি গাছকে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখলাম এঁটেল মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ১২ সেমি., গাছটির প্রস্থ (বেড়) হ'য়েছে .৭ সেমি. অর্থাৎ আগের মতই প্রস্থ (বেড়) আছে এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ২.১ সেমি. হ'য়েছে।

বেলে মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ১২.৮ সেমি., গাছটির প্রস্থ (বেড়) .৪ সেমি. এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব হ'য়েছে ২.৩ সেমি.।

দোঁয়াস মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ১৯.৫ সেমি.। গাছটির প্রস্থ (বেড়) .৮ সেমি.ই আছে এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার দূরত্ব ৩.৩ সেমি. হ'য়েছে।

১৪।১১।৯৭

টবের তিনটি গাছ আজ পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে পেলাম যে, এঁটেল মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা ১৪.৫ সেমি. হ'য়েছে, গাছটির প্রস্থ (বেড়) .৮ সেমি. হ'য়েছে অর্থাৎ .১ সেমি. বেড়েছে। গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ২.২ সেমি. হ'য়েছে।

বেলে মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ১৪ সেমি., এবং কাণ্ডের প্রস্থ (বেড়) হ'য়েছে .৫ সেমি.। গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব হ'য়েছে ২.৪ সেমি.।

দোঁয়াস মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ২২.৬ সেমি., কাণ্ডের প্রস্থ (বেড়) হ'য়েছে .৯ সেমি. এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব হ'য়েছে ৩.৫ সেমি.।

২১।১১।৯৭

টবের তিনটি মাটিতে আজ দেখলাম এঁটেল মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা ১৭.২ সেমি. হ'য়েছে, গাছটির কাণ্ডের প্রস্থ (বেড়) .৯ সেমি. এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ২.৫ সেমি. হ'য়েছে।

বেলে মাটিযুক্ত টবটিতে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ১৪.৪ সেমি., গাছটির প্রস্থ (বেড়) .৬ সেমি. এবং গাছটির একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার দূরত্ব ২.৫ সেমি. হ'য়েছে।

দোঁয়াস মাটিযুক্ত টবটির ক্ষেত্রে গাছটির উচ্চতা হ'য়েছে ২৬.৬ সেমি., গাছটির কাণ্ডের

প্রস্থ (বেড়) .৯ সেমি.ই আছে, কোন বৃদ্ধি হয় নাই। একটি শাখা থেকে অন্য একটি শাখার মধ্যবর্তী দূরত্ব ৩.৭ সেমি. হ'য়েছে।

সিদ্ধান্ত

এই পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে

১। দোঁয়াস মাটিতে ছোলা গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। তারপর এঁটেল মাটিতে এবং সবশেষে বেলে মাটিতে।

২। বিভিন্ন মাটিতে ছোলা গাছের বৃদ্ধি যেমন কাণ্ডের প্রস্থ (বেড়), কাণ্ডের এক শাখা থেকে অন্য একটি শাখার দূরত্ব ইত্যাদি বৃদ্ধিগুলির পার্থক্য বিভিন্ন এবং তা উল্লেখযোগ্য।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমার এই প্রোজেক্টটি সুসম্পন্ন করার জন্য যাঁদের উৎসাহ, সহযোগিতা এবং মূল্যবান তথ্যের সাহায্য সংগৃহীত হ'য়েছে প্রথমেই তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমাদের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি।

প্রথমেই আমরা উল্লেখ করি ডঃ অম্বুজানন্দ রায় (অধ্যাপক শিক্ষাসত্র) এবং ডঃ ঈপ্সা বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপিকা, শিক্ষাসত্র) এঁদের কথা, যাঁরা আমাদের এই প্রোজেক্ট ক'রতে তাঁদের মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়ে প্রোজেক্টটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ক'রতে সাহায্য ক'রেছেন। আমরা এঁদের কাছে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।

এর পরেই আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীসাক্ষীগোপাল সাহাকে (ল্যাবরেটারিয়ান, শিক্ষাসত্র) যিনি তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়াতে দ্বিধা করেন নি।

অবশেষে আমাদের আন্তরিক ও ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাই পিতা-মাতার প্রতি যাঁদের করুণা ও আর্থিক সহযোগিতা আমরা প্রতিপদে অনুভব ক'রেছি।

ব্যাঙাচির রূপান্তরে থাইরয়েড হরমোনের প্রভাব

সংঘমিত্রা সিংহ (১৯৯৮)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

পিট্যুইটারির অগ্রখণ্ড থেকে যেসব হরমোন উৎপন্ন হয় তাদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা (১) দেহের সাধারণ কলাগুলির উপর প্রভাব বিস্তারকারী হরমোন যেমন- STH
(২) বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির উপর প্রভাব বিস্তারকারী হরমোন যেমন- TSH, ACTH, GTH

থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (Thyroid-stimulating hormone or TSH) বা থাইরোট্রপিক হরমোন বা থাইরোট্রপিন।

কার্য

থাইরয়েড গ্রন্থির যথাযথ গঠন ও ক্ষরণ এই হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তে এই হরমোনের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়া থাইরয়েডগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির (থাইরক্সিন, ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন, থাইরোক্যালসিটানিন-এর) হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ।

থাইরয়েড (Thyroid) অবস্থান

আমাদের গলার শ্বাসনালীর (Trachea) অঙ্কদেশে ও স্বরযন্ত্রের (Larynx) ঠিক নিচে এই গ্রন্থিটি আছে। এটি একটি একক (unpaired) গ্রন্থি। এটি যদিও দুটি খণ্ড নিয়ে গঠিত তবুও খণ্ডদুটি একটি মধ্যবর্তী অংশ দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোন ও তার কাজ

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোন হ'ল থাইরক্সিন বা T_4, ট্রাইআয়োডা থাইরোনিন বা T_3, ও থাইরোক্যালসিটোনিন।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হরমোনগুলির মধ্যে শতকরা 95 ভাগ হ'চ্ছে থাইরক্সিন (T_4) এবং ট্রাইআয়োডোথাইরোনিনের (T_3) পরিমাণ শতকরা 5 ভাগেরও কম। এই দুটি হরমোনের কাজ একই রকমের, তাই এদের একসাথে '**থাইরয়েড হরমোন**' আখ্যা দেওয়া হয়। T_4-এর উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হ'লেও তার ক্রিয়া খুব দ্রুত শুরু হয়। T_4-এর তুলনায় T_3 প্রায় 3 থেকে 5 গুণ বেশী সক্রিয়।

থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন যৌথভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলি করে
(১) দেহের বিপাকীয় কাজের বিশেষত প্রতিটি কোষে শ্বসনের গতি বৃদ্ধি করে।

(২) প্রোটিন সংশ্লেষের মাধ্যমে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।
(৩) পিট্যুইটারি গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন 'বৃদ্ধি হরমোনের' সঙ্গে একত্রে এরা অস্থির বৃদ্ধি ঘটায়।
(৪) গ্লুকোজ শোষণ ও দেহে তার ব্যবহার, গ্লুকোনিওজেনেসিস ইত্যাদির মাধ্যমে এরা কার্বোহাইড্রেটের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।
(৫) এরা গোনাড-এর (ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়) স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়।
(৬) মূত্রের সহিত নাইট্রোজেন ত্যাগ এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
(৭) উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ দশায় রূপান্তর, যথা— ব্যাঙাচির পূর্ণ ব্যাঙে রূপান্তর, এই হরমোনগুলির প্রভাবে সম্পন্ন হয়।
(৮) এই হরমোনগুলির প্রভাবে উভচর, সরীসৃপ ও পক্ষীদের নির্মোচনে বা খোলস ত্যাগ ঘটে।

ব্যাঙের মিষ্টি জলে ভাসমান নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটের আবরণী ফেটে গিয়ে লার্ভা নির্গত হয়। ব্যাঙের লার্ভাকে ট্যাডপোল (tadpole) বা ব্যাঙাচি বলে। সদ্য নির্গত লার্ভার দেহের অংশগুলি হ'ল— মস্তক, দেহকাণ্ড এবং লেজ। মস্তকের দুপাশে তিনজোড়া বহিঃফুলকা থাকে। এই সময় ব্যাঙাচিগুলি কোনও জলজ উদ্ভিদের উপর চোষকের দ্বারা আটকে থাকে এবং বহিঃ ফুলকা দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। লার্ভা থেকে ব্যাঙাচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের রূপান্তর থাইরয়েড হরমোনগুলি প্রভাবে সম্ভব হয়।

উপকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি

এই পরীক্ষাটি ক'রতে পুকুর থেকে ব্যাঙাচি সংগ্রহ ক'রেছিলাম। তিনটি প্লেটে তিরিশটি ক'রে (চিত্র ১) ব্যাঙাচি রেখেছিলাম। ব্যাঙাচিগুলির যাতে আঘাত না লাগে তাই একটি চামচ দিয়ে ধীরে-ধীরে প্লেটে ব্যাঙাচিগুলিকে রেখেছিলাম। তিনটি প্লেটের একটিতে সেই পুকুরের সাধারণ মিষ্টি জল দ্বিতীয়টিতে T_4 এবং তৃতীয়টিতে T_3 দিয়েছিলাম। প্রত্যেক প্লেটে T_4 এবং T_3 এর পরিমাণ 1 mg. ছিল (চিত্র ১)।

তিনদিনের এই পরীক্ষায় প্রতিদিন প্লেটের পুরোনো জল পরিবর্তন ক'রে প্রত্যেক প্লেটে পুকুরের নুতন জল দিতাম। এর ফলে জলে অক্সিজেনের অভাব হ'ত না। ব্যাঙাচিগুলিও স্বাভাবিকভাবে বাঁচবার সুযোগ পেত। জল পরিবর্তনের পরে T_4-এর প্লেটে T_4 হরমোন এবং T_3-এর প্লেটে T_3 হরমোন দিয়ে দিতাম।

দ্বিতীয় দিনে T_4 এবং T_3-এর প্লেটে কয়েকটি পাথরের টুকরো দিয়ে দিলাম। কারণ আমরা জানি ব্যাঙাচি ফুলকার সাহয্যে শ্বাসকার্য চালায় কিন্তু ব্যাঙাচি বৃদ্ধি পেয়ে লেজ খসে গিয়ে পরিণত ব্যাঙ হ'লে তারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। যেহেতু T_4 এবং T_3 হরমোনগুলির প্রভাবে ব্যাঙাচির লেজ তাড়াতাড়ি লুপ্ত হয়, তখন সেগুলি পরিণত ব্যাঙ হ'য়ে সর্বক্ষণ আর জলে থাকতে পারে না। তাই পাথরখণ্ড দেওয়ার ফলে ব্যাঙাচিগুলি পরিণত ব্যাঙ হ'য়ে পাথরের উপর বসতে পারবে (চিত্র ২)।
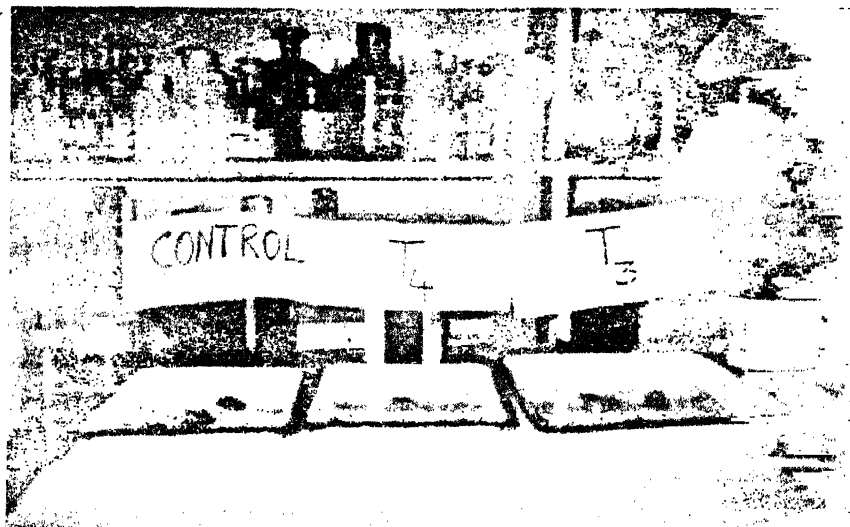
চিত্র ১. থাইরক্সিন প্রয়োগ

চিত্র ২. থাইরক্সিন প্রয়োগে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তর

পর্যবেক্ষণ

তৃতীয় দিনে দেখলাম, 'Control'-এর ব্যাঙাচিগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ'য়েছে এবং সেগুলির লেজ এখনও র'য়েছে। ব্যাঙাচিগুলির পিছনের পা বড় হ'য়েছে এবং সামনের পা বেরিয়েছে।

T_4 -এর ব্যাঙাচিগুলির লেজ খসে গিয়ে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হ'য়েছে।

T_3 -এর ব্যাঙাচিগুলিরও লেজ খসে গিয়ে সেগুলিও পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হ'য়েছে।

ফলাফল

এই পরীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাঙাচির লেজ খসে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হ'তে এই থাইরয়েড হরমোনগুলির বেশ ভূমিকা রয়েছে।

থাইরয়েড হরমোনগুলির মধ্যে T_4 -এর তুলনায় T_3 -বেশী সক্রিয়। কারণ T_4 প্লেটে ব্যাঙাচিগুলির অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয় নি। অন্যদিকে একই সময়ের মধ্যে (তিনদিন) T_3 এর প্লেটের ব্যাঙাচিগুলি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হ'য়েছে।

সময়	১নং প্লেট Control	২নং প্লেট T_4	৩নং প্লেট T_3
দ্বিতীয় দিন ২৯.৮.৯৭	স্বাভাবিক বৃদ্ধি। পিছনের পা অল্প বেড়িয়েছে।	১০টির সামনের পা এবং পিছনের পা বেড়িয়েছে। বাকীদের কেবল পিছনের পা বড় হয়েছে।	২০টির সামনের এবং পিছনের পা বেশ বড় হয়েছে। বাকীদের কেবল সামনের ও পিছনের পা বেড়িয়েছে। লেজ ছোট হয়েছে।
তৃতীয় দিন ৩০.৮.৯৭	স্বাভাবিক বৃদ্ধি। পিছনের পা বড় হয়েছে। সামনের পা অল্প বেড়িয়েছে।	১০টির লেজ ছোট হয়েছে। বাকীদের সামনের ও পিছনের পা বড় হয়েছে।	২০টির পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়েছে। বাকীদের লেজ খুব ছোট হয়ে গেছে এবং সামনের ও পিছনের পা বড় হয়েছে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

সমস্ত পরীক্ষাটি থেকে প্রমাণিত হ'ল থাইরয়েড হরমোনের মধ্যে T_3 -এর সক্রিয়তা T_4 এর থেকে বেশী। কারণ ব্যাঙাচিগুলির বৃদ্ধি T_4 -এর তুলনায় T_3 -তে হ'য়েছে বেশীই।

T_4 -এর কাজ করার ক্ষমতা T_3 -এর থেকে কম একথা জানা আছে। কিন্তু শরীরে T_4 সাতদিন পর্যন্ত থাকে এবং T_3 থাকে মাত্র একদিন। T_3 খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে ও নষ্ট হয়।

এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জী

জীবনবিজ্ঞান পরিচয় (নবম ও দশম শ্রেণী) : চৌধুরী, ভট্টাচার্য, সাঁতরা।
উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা (একাদশ ও দ্বাদশ) : চৌধুরী, চট্টোপাধ্যায়, নন্দী।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই পরীক্ষাটি ক'রতে যাঁদের সাহায্য অপরিসীম তাঁরা হ'লেন, প্রফেসর সমীর ভট্টচাচার্য, মালবিকাদি। এছাড়া প্রফেসর শেলী ভট্টাচার্য এবং অম্বুজদা এই পরীক্ষাটির যথোপযুক্ত ফটোগ্রাফ তুলে দিয়ে আমাকে যথেষ্ট উপকৃত ক'রেছেন। এঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মধুমেহ রোগে পুরুলিয়া আদিবাসীদের ব্যবহৃত ভেষজগুলির যথার্থতা : ইঁদুরের দেহে উক্ত ভেষজগুণের প্রতিক্রিয়া

উৎপল ঘোষ ও অরুণাভ মণ্ডল (১৯৯৯)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি যে পৃথিবীর প্রতি চারজন মানুষের মধ্যে একজনের মধুমেহ রোগ আছে। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধিজনিত রোগকে মধুমেহ বলে। সাধারণতঃ শর্করার পরিমাণ প্রতি ১০০ মিলি.লি. রক্তে ৮০ - ১২০ মিলিগ্রাম। ১২০ মিলিগ্রাম-এর বেশী শর্করা হ'য়ে গেলে সেই অবস্থাকে **হাইপারগ্লাইসেমিয়া** বলে। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কৃত্রিম উপায়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমানো যায়।

আমাদের দেশে অনেক এলাকাতে এখনও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ভেষজ ঔষধ ব্যবহার করা হয়। মধুমেহ এর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভেষজ ওষুধ এর ব্যবহার পুরুষানুক্রমে হ'য়ে আসছে, এরকমই কিছু ভেষজ পদার্থ নিয়ে আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই যে সত্যিই উক্ত ভেষজগুলির ব্যবহারের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে নাকি শুধু জনশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রেই মানুষ এগুলো ব্যবহার করে।

যে সমস্ত গাছ-গাছড়া আমরা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার ক'রেছি সেগুলি হ'ল : (ক) তালমূল (খ) কৃষ্ণকেদার (গ) ভুঁইকুমড়ো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এ সমস্ত ভেষজ পুরুলিয়ার কোনও-কোনও অঞ্চলের আদিবাসীরা ব্যবহার ক'রে থাকেন।

ইনসুলিনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইনসুলিন এক ধরণের প্রোটিন হরমোন। মানুষের ইনসুলিনের গঠন সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন স্যাংগার ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে। ইনসুলিন দুটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (chain) দ্বারা গঠিত। এ দুটি যথাক্রমে শৃঙ্খল A (chain A) এবং শৃঙ্খল B (chain B) নামে পরিচিত। chain A ২১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং chain Bতে ৩০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড বর্তমান (চিত্র ১-২)।

ইনসুলিন ক্ষরিত হয় অগ্ন্যাশয় থেকে। অগ্ন্যাশয়-এর দুইটি অংশ বর্তমান। একটি এক্সোক্রাইন অংশ এবং অপরটি এণ্ডোক্রাইন অংশ। এণ্ডোক্রাইন অংশটি থেকে ইনসুলিন ক্ষরিত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এণ্ডোক্রাইন অংশে তিন রকম কোষ বর্তমান এবং এই তিন রকম কোষ একটি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক অংশে একত্রিত থাকে। আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসে যে তিন রকম কোষ সমষ্টি থাকে সেগুলি হ'ল বিটা সেল (β) আলফা সেল (A) এবং আলফা সেল (B) এর মধ্যে বিটা সেল থেকে ইনসুলিন ক্ষরিত হয়।
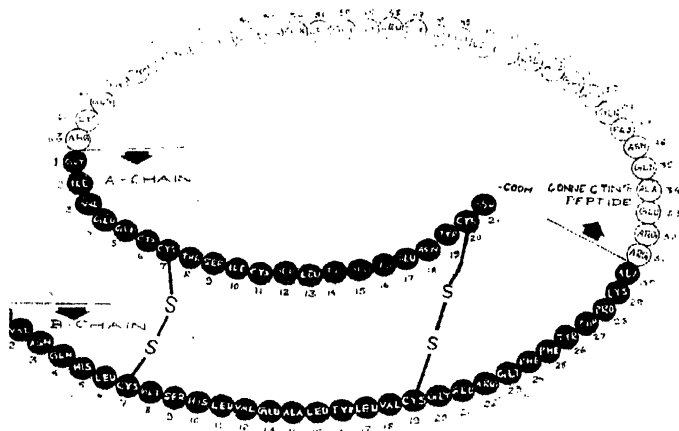
চিত্র ১. প্রোইনসুলিন শৃঙ্খল

ইনসুলিনের কাজ

ইনসুলিন মানবদেহে বিপাক-কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড বিপাকেও ইনসুলিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের অগ্ন্যাশয়-এ প্রায় ২০০ ইউনিট ইনসুলিন উৎপন্ন হয় যার মধ্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে লাগে মাত্র ৪০ - ৬০ ইউনিট। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে এবং ক্ষিদের সময় ইনসুলিন ক্ষরণ ক'মে যায়। গর্ভাবস্থায় অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন ক্ষরণ বেড়ে যায়।
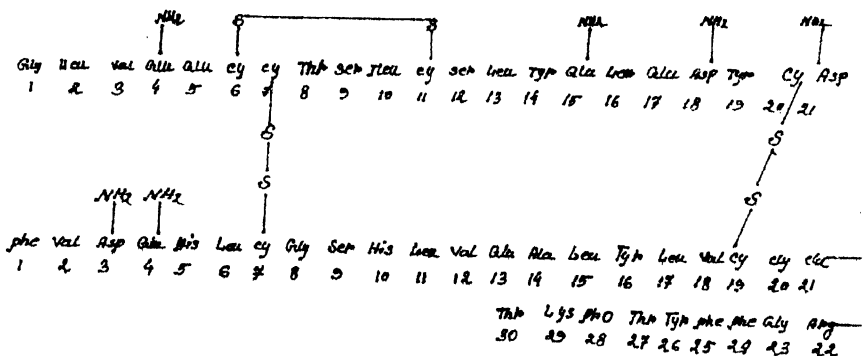
চিত্র ২. পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (ইনসুলিন)

আবিষ্কারের পর থেকে প্রায় ৫০ বৎসর ইনসুলিন নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়ে গেছে কিন্তু এখনও ইনসুলিন-এর কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা র'য়ে গেছে। এ পর্যন্ত জানা ইনসুলিনের কাজ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

(ক) যকৃৎ পেশীতে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় এবং কর্মশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্লুকোজের দহন প্রভাবিত করা ইনসুলিনের অন্যতম প্রধান কাজ।

(খ) সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের প্রতি ১০০ মিলি.লি. রক্তে ৮০ - ১২০ মিলি.গ্রাম গ্লুকোজ থাকে কিন্তু শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যগ্রহণের ফলে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইনসুলিন রক্তস্থিত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে, যকৃতে এবং পেশীকোষে জমা রাখে একে গ্লাইকোজেনেসিস বলে।

(গ) প্রোটিন সংশ্লেষ-এর বৃদ্ধিতে ইনসুলিন সাহায্য করে।

(ঘ) ইনসুলিন হরমোন কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন-এর দহনে সাহায্য করে।

(ঙ) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস করা ইনসুলিন-এর প্রধান কাজ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যা থেকে পরবর্তীকালে ইনসুলিন উৎপন্ন হয় তাকে pro-insulin বলে।

উপকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি

'ডিসেকটিং বক্সে'র বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন কাঁচি, ফরসেপ, স্ক্যালপেল এবং ওয়াচ গ্লাস ইত্যাদি। তাছাড়াও ছিল বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রবণ, ডিস্টিল ওয়াটার, কাঁচের বীকার, ইঁধউৰ, খাঁচা, টিস্যু পেপার, গ্লাভস্, ব্লেড, তুলাযন্ত্র, টেস্টটিউব, কাঁচদণ্ড, সেণ্টিফিউজ করার যন্ত্র, হোমোজিনেটর, রেফ্রিজেরেটর, ইনসুলিন কীটস্, মাইক্রোস্কোপ, বরফ রাখার পাত্র ইত্যাদি। এছাড়াও আরও অনেক ছোট-ছোট উপকরণ আমরা ব্যবহার ক'রেছি। যেমন - লেবেল, প্লাস্টিক-এর ৫ সি.সি. পাত্র ইত্যাদি। সমগ্র প্রোজেক্টটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে পরীক্ষাগুলি চালানো হয়। প্রথমভাগে ভেষজ ঔষধগুলিকে পিযে তাদের নির্যাস বের ক'রে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগে সেগুলিকে চারটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ (inject) করিয়ে পুনরায় তাদের রক্ত এবং অগ্ন্যাশয় বের ক'রে নেওয়া হয়। এবং শেষ বা তৃতীয় পর্যায়ে তাদের রক্তে ইনসুলিন বেড়েছে কিনা তার পরীক্ষা করা হয়।

প্রথম পর্যায়: প্রথমে আমরা প্রত্যেক ভেষজ-এর ১.২৫ গ্রাম ক'রে বিভিন্ন দেহাংশ তিনটি ওয়াচ গ্লাসে নিয়ে তাদের হোমোজিনারে পেষাই করি। তিনটি ভিন্ন টেস্টটিউবে লেবেল লাগিয়ে একটিতে A (কৃষ্ণকেদার) একটিতে B (তালমূল) এবং অপরটিতে C (ভূঁইকুমড়ো) রেখে পেষাই করা ভেষজগুলিতে অল্প ডিস্টিল ওয়াটার যোগ করি। এরপর টেস্টটিউবগুলি centrifuge যন্ত্রে ১০,০০০ (RPM) গতিতে ১০ মিনিট কাল ঘোরানো হয়। পরে ওই টেস্টটিউবগুলি থেকে উপরিতলের দ্রবণটুকু (supernitent) নিয়ে রেফ্রিজেরেটরে রাখা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: আমরা মোট আটটি ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা পর্বগুলি সম্পন্ন ক'রেছিলাম। তাদের মধ্যে দুটি **কন্ট্রোল** এবং ছটি **এক্সপেরিমেন্টাল**। এক্সপেরিমেন্টাল ছয়টি ইঁদুরকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত ভেষজ পদার্থ ইঞ্জেক্ট করা হ'য়েছিল। দুটি ক'রে মোট তিনটি দলে ইঁদুরগুলি ভাগ ক'রে নিয়ে একটিতে কৃষ্ণকেদার, অপর দুইটিতে যথাক্রমে তালমূল ও ভূঁইকুমড়োর নির্যাস ইঞ্জেক্ট করা হ'য়েছিল। প্রত্যেকটি ইঁদুরকে ১০.৫ এম.এল ক'রে নির্যাস ইঞ্জেক্ট করা হয়। এইভাবে মোট দুবার ইঞ্জেকশন দেওয়া হ'য়েছিল। প্রথমবার সকাল ১০টায়, দ্বিতীয়বার বৈকাল ৪টায়। দ্বিতীয়বার

ইঞ্জেকশন দেওয়ার দেড়ঘন্টা পর ইঁদুরগুলিকে মেরে, তাদের রক্ত এবং অগ্ন্যাশয় বের ক'রে পরীক্ষার জন্য রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়। রক্তের নমুনা রাখা হ'য়েছিল ৪ ডিগ্রি উষ্ণতায়।

তৃতীয় পর্যায়: এই পর্যায়ে রক্তের প্রত্যেকটি নমুনার সিরাম নিয়ে (Radio Immuno Assay) পদ্ধতিতে ইনসুলিন পরিমাপ করা হয়। রেডিও-ইমিউনো-অ্যাসে (RIA) পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে ইনসুলিনের ক্ষরণ বেড়েছে কিনা। কণ্ট্রোল দলের সঙ্গে তুলনা ক'রলে এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়।

রেডিও-ইমিউনো-অ্যাসে (RIA) পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে বিশেষ গণকযন্ত্রে বা গামা-কাউন্টারের (γ counter) সাহায্যে তেজস্ক্রিয় মৌলের (যেমন C^{14} বা I^{125} ইত্যাদি) সঙ্গে কোনও রাসায়নিক পদার্থেকে জুড়ে দিয়ে ঐ পদার্থটিকে চিহ্নিত করা হয়। ধরা যাক ইনসুলিনকে I^{125} দিয়ে চিহ্নিত করা হ'ল, এই অবস্থাক বলে 'hot Insulin'. আমরা জানি অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেন জুড়ে যায় বা bind করে।

প্রথমে অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেন দেওয়া হয়। এই অবস্থায় গামা গণকযন্ত্রের (γ counter) সাহায্যে গণনা করলে মিশ্রণে যতগুলি 'hot insulin' থাকে তত পরিমাণ count পাওয়া যায়। এবার আমাদের প্রস্তুত করা নমুনা এই দ্রবণের সঙ্গে মেশালে নমুনার ইনসুলিন 'hot insulin'কে সরিয়ে অ্যান্টিবডির সঙ্গে যুক্ত (bind) হয়। এই অবস্থায় নমুনাটি যদি গামা-কাউন্টারের সাহায্যে count করা যায় তাহলে count কম হবে কারণ গামা কাউন্টারে শুধু 'hot insulin' কাউন্ট করা যায়। এবার প্রথম থেকে দ্বিতীয়বার যত কম count হবে বুঝতে হবে তত ইনসুলিন আমাদের নমুনার মধ্যে ছিল।

ফলাফল

উপরোক্ত রেডিও-ইমিউনো-অ্যাসে (Radio Immuno Assay) পদ্ধতিতে সিরামের নমুনা পরীক্ষা ক'রে এবং কণ্ট্রোল দলের ইঁদুরগুলির সঙ্গে তুলনা ক'রলে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে A দলের ইঁদুরগুলিতে রক্তের প্লাজমায় ইনসুলিনের পরিমাণ কণ্ট্রোলের তুলনায় বেড়েছে এবং দলের ইঁদুরগুলিতে বাড়লেও তা A দলের ইঁদুরগুলির তুলনায় কম। অন্যদিকে কণ্ট্রোলের তুলনায় C দলের ইঁদুরগুলির প্লাজমায় ইনসুলিনের ক্ষরণ বেড়েছে সবচেয়ে বেশী (সারণী ১)

প্যাংক্রিয়াস	insulin (uU)	রক্ত প্লাজমা	insulin (uU)
Control		Control	12.5 (uU)
A -	210 (uU)	A -	140 (uU)
B -	95 (uU)	B -	50 (uU)
C -	460 (uU)	C -	190 (uU)

(uU = micro unit) দেখা যাচ্ছে Control এর তুলনায় অগ্ন্যাশয়েও ইনসুলিন বেড়েছে, Bতে অল্প বেড়েছে এবং Cতে খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।
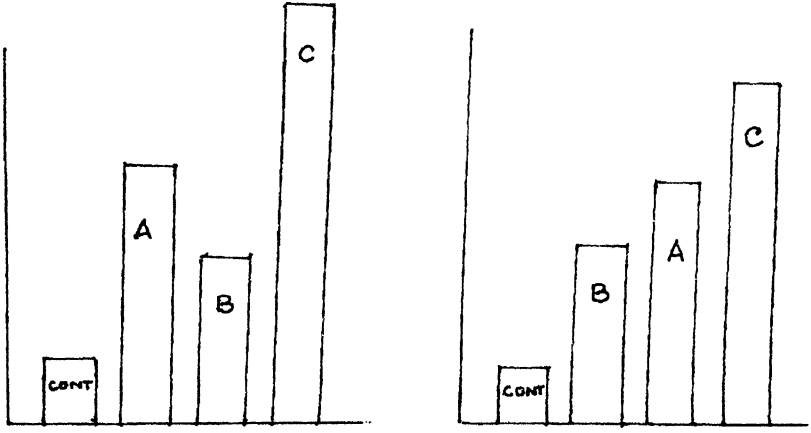
লেখচিত্র ১. ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর রক্তে অবস্থিত মোট ইনসুলিনের অনুপাত

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আমরা জানি যে, ইনসুলিন রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায় যার ফলে ডায়াবেটিস-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইনসুলিন শর্করার বিপাকে সাহায্য করে এবং পেশী কোষে ও যকৃতে শর্করাকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াকে **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে পায় না। ফলে সুস্থ মাত্রায় প্রতি মিলিলিটার রক্তে ৮০ - ১২০ মিলিগ্রাম-এর মধ্যেই থাকে।

সুতরাং এই ওষুধ (ভেষজ) সমূহ যে সমস্ত আদিবাসীরা পুরুলিয়ার নানা অঞ্চলে ব্যবহার করেন সে কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে নয় এর থেকে তারা উপকার পান। তাছাড়া এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করাও ব্যয়সাপেক্ষ নয় এবং এতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ভয়ও কম। সুতরাং সবদিক থেকে বিচার ক'রলে দেখা যায় আমাদের আশেপাশে এমন অনেক ভেষজ আছে যেগুলি ব্যবহার করা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।

উপস্থিত প্রোজেক্টটির জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, যে সমস্ত ভেষজ পদার্থগুলি ইঁদুরগুলির উপর প্রয়োগ করা হ'য়েছিল সেই ইঁদুরগুলিতে প্রকৃতই ইনসুলিনের ক্ষরণ বেড়েছে (সারণী ১ ও লেখচিত্র ১)। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আরও সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তালমূল, ভুঁইকুমড়ো বা কৃষ্ণকেদারের ভেষজগুলি ইনসুলিন ক্ষরণে বৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই আধুনিক যুগেও পুরুলিয়ার আদিবাসীগণ যে উক্ত তিনটি ভেষজ পদার্থ ব্যবহার করেন, তা বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থনযোগ্য। আমাদের মতে আরও ব্যবহারিক সতর্কতা অবলম্বন ক'রলে ফলাফল আরও ভাল হবে।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

প্রোজেক্টের কাজ নির্বাচনকালে ডায়াবেটিস বা মধুমেহ সংক্রান্ত কাজ হাতে নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করায় আমাদের জীবনবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের এণ্ডোক্রিনোলজির গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য, মালবিকাদি ও অন্যান্য গবেষকদের সাহায্যে প্রকল্পটি পরীক্ষায়নের সুযোগ পাই। আমাদের এই কাজে সহৃদয় সাহায্য ও সুযোগ ক'রে দেওয়ার জন্য সকল শিক্ষক ও গবেষকদের আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থপঞ্জী

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যা - ডঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী।

(খ) জীবনবিজ্ঞান পরিচয় - মিত্র, চৌধুরী ও সাঁতরা।

(গ) ফিজিওলজি এ্যান্ড বায়োফিজিক্স - রাচ এ্যাণ্ড পাটন।

জেনেটিক কোড ও প্রোটিন সংশ্লেষ : সমীক্ষা

সন্দীপ মাঝি (১৯৯৮)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর স্কুলসার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রমে জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে একটি অবশ্যই করণীয় একটি বিষয় হ'ল প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (Project work)। 'প্রোজেক্ট' কথাটির অর্থ পরিকল্পনা। উপস্থিত পরিকল্পনায় আমার দীর্ঘদিনের কৌতূহল এই প্রোজেক্টটির মাধ্যমে হাতে-কলমে মেটানোর সুযোগ পেয়েছি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাদের জীবনবিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের কোষ অধ্যায়ে 'জিন' কথাটি পাই। এই বিষয়টি সেদিন বিশেষভাবে বুঝতে পারিনি। কিন্তু যেটুকু বুঝেছিলাম তাতে জিন সম্পর্কে আমার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ে। নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ওই আগ্রহের মাত্রা বেড়েছিল আরও বহুগুণ। কিন্তু 'জিন' বিষয়টি এতই জটিল এবং মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে যে সমস্ত জীবনবিজ্ঞানের বই পাওয়া যায়, সেগুলিতে বিষয়টি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা থাকে না। বিশ্বভারতীর স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠক্রমে জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে একটি প্রোজেক্ট ওয়ার্ক অবশ্য করণীয় জেনে, আমি আমার প্রোজেক্টের বিষয় হিসেবে পুরোনো কৌতূহলটিকেই নির্বাচন করি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে আমার গৃহীত প্রোজেক্টটির কাজ 'জেনেটিক কোড্ ও প্রোটিন সংশ্লেষ' এই শিরোনামে শুরু করি। উক্ত প্রোজেক্ট-এর বিষয় সম্বন্ধে কোনো বাংলা বই পাওয়া না যাওয়ায় দু-একটি ইংরাজী বইয়ের সাহায্য নিতে হ'য়েছে। গ্রন্থপঞ্জীতে তার উল্লেখ রইল।

উপকরণ, পরীক্ষা ও পদ্ধতি

আলোচ্য প্রোজেক্ট-এর বিষয়টি সমাধানের জন্য বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়াও সম্ভব হয় নি। সুতরাং বিষয়টি বই ও বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকার সাহায্যে অনুধাবন করার চেষ্টা ক'রেছি।

১৮৮৫ সালে গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল প্রথম লক্ষ্য করেন যে, সমস্ত জৈব প্রজাতির মধ্যেই কিছু-কিছু বংশগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। দিনেমার জীববিজ্ঞানী উইহেম জোহান দেন এই উপাদানগুলির নামকরণ করেন 'জিন'। কিন্তু তখন একথা জানা যায়নি যে, জিন শুধুমাত্র বংশগতি ধারাকেই বহন করে না, বরং সমগ্র জীবনধারা পরিচালনা করে।

জিনের অবস্থান ক্রোমোজোমের মধ্যে। আবার ক্রোমোজোম থাকে কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে। জিন, ক্রোমোজোম ও নিউক্লিয়াস এক সঙ্গে গঠন করে, 'রহস্যে মোড়া একটা ধাঁধা যার ভিতরেও র'য়েছে আর একটা ধাঁধা'- চার্চিলের বিখ্যাত উক্তি। উপস্থিত প্রকল্পে জিনের 'জেনেটিক কোড ও প্রোটিন সংশ্লেষে'র রহস্য সন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য।

D.N.A.-এর মধ্যেই জেনেটিক ধর্ম নিহিত থাকে, যা বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। কিন্তু

কিভাবে D.N.A. জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা আলোচনা করা যাক।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে জীববিজ্ঞানীরা ধারণা ক'রতে শুরু করেন যে প্রোটিনের গঠন জেনেটিক ধর্ম থেকেই স্থির হয়। যদি এ ঘটনা সত্য হয়, তবে জীবের জৈবিক কার্যগুলি সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রোটিন প্রয়োজন, এতে সন্দেহ নেই।

জর্জ বিড্‌ল (George Beadle) এবং এডওয়ার্ড ট্যাটাম (Edward Tatum) পরীক্ষার সাহায্যে এই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন। যে সমস্ত বেগুনী Bread mold এর মধ্যে মিউটেশান (Mutation) আছে, সেইরকম বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে তারা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পান যে এদের জেনেটিক পদার্থের মধ্যে এক ধরণের বংশগত পরিবর্তন র'য়েছে এবং প্রতিটি Mutant-প্রজাতির এনজাইম তৈরীর ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। সুতরাং এখন এই ঘটনা স্পষ্ট যে, সমস্ত প্রোটিনগুলি বংশগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রনের ফলে উৎপন্ন হয়।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে এই সমস্ত পরীক্ষাগুলি ক'রে বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে জিনই 'বংশগতির ধারক'। অতএব বিজ্ঞানীরা এই অভিমত ব্যক্ত ক'রলেন যে, জিনই D.N.A.-এর মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিওটাইডের (Nelucleotide) বিন্যাস, প্রোটিনের মধ্যে অবস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid)-এর সজ্জারীতি ইত্যাদি নির্দেশ করে।

প্রোটিন সংশ্লেষণে R.N.A. (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কোষ যত তাড়াতাড়ি অসংখ্য প্রোটিন সৃষ্টি করে, ঠিক তত তাড়াতাড়ি R.N.A. উৎপন্ন করে। একটি ইউক্যারিওটিক কোষের D.N.A. সাধারণত নিউক্লিয়াসে থাকে। কিন্তু R.N.A. নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজোম উভয়ের মধ্যেই থাকে। রাইবোজোমগুলি প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়। R.N.A.জেনেটিক ঘটনা সমূহকে D.N.A. থেকে সাইটোপ্লাজমে পৌঁছে দেওয়ার পর রাইবোজোম প্রোটিন তৈরীতে অংশ নেয়। এই ঘটনাকেই জিনপ্রবাহ বলা যেতে পারে। জিনের প্রবাহ বলতে বোঝায় 'কোনও বার্তাকে D.N.A. থেকে R.N.A.তে এবং পর্যায়ক্রমে R.N.A.থেকে প্রোটিনে স্থানান্তরিত করা'।

জিনের সংজ্ঞা দেওয়া বড় কঠিন। তবুও সাধারণভাবে আমরা জিনের সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারি যে, জিন একটি D.N.A.-এর দৈর্ঘ্য বিশেষ, যা একটি কার্যকরী একক হিসাবে কাজ ক'রে থাকে।' সুতরাং জিনের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে 'প্রজাতির যাবতীয় দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রকই হ'ল জিন'।

রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড RNA

D.N.A. এর মতই R.N.A. হ'ল লম্বা, শাখাবিহীন অণু যা নিউক্লিওটাইডের উপএকক দিয়ে গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডের একটি ক'রে শর্করা, নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষারক ও ফসফেট গ্রুপ বর্তমান। যদিও R.N.A. বিভিন্ন দিক থেকে D.N.A.-এর চেয়ে পৃথক। যেমন—

১। R.N.A. কেবলমাত্র একটি শৃঙ্খলযুক্ত অর্থাৎ একতন্ত্রী। এক্ষেত্রে রাইবোজ শর্করার সঙ্গে যে কোনও একটি ক্ষারক থাকতে পারে। কিন্তু D.N.A. দ্বিতন্ত্রী। অর্থাৎ নিউক্লিওটাইড দুটি

শৃঙ্খলযুক্ত অবস্থাতে থাকে।

২। R.N.A. এর পেণ্টোজশর্করা রাইবোজ জাতীয়। কিন্তু D.N.A.-এর পেণ্টোজশর্করা ডি-অক্সি-রাইবোজ জাতীয়।

৩। R.N.A. এর অণুতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন ক্ষারক চারটি। যথাক্রমে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল। কিন্তু D.N.A.-তে ইউরাসিলের বদলে থাইমিন থাকে। অর্থাৎ D.N.A.-এর নাইট্রোজেন বেস চারটি হ'ল যথাক্রমে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন।

৪। সাধারণত R.N.A.বংশগতির ধারক নয়। কিন্তু D.N.A. বংশগতির ধারক ও বাহক।
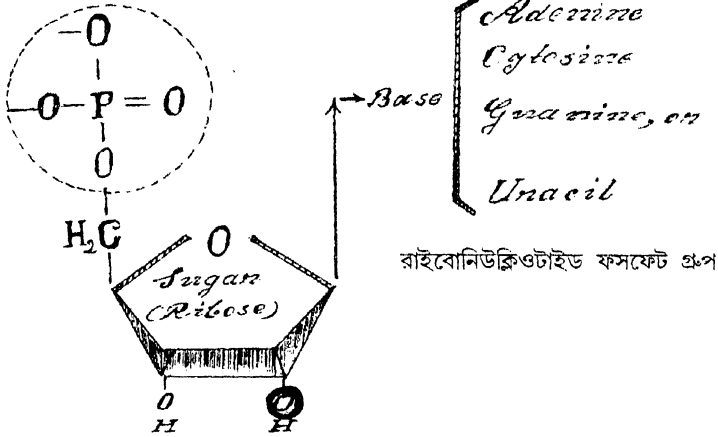
চিত্র ১. RNAর একটি রাইবোনিউক্লিওটাইড মোনোমার

প্রোটিন সংশ্লেষণে যে তিনটি মুখ্য R.N.A. অংশগ্রহণ করে তারা হ'ল :

(ক) মেসেঞ্জার R.N.A.(m–R.N.A.)

এই ধরণের R.N.A.ক্রোমোজোমস্থিত D.N.A.-এর যে কোনও একটি শৃঙ্খল থেকে পরিপূরক বেস সহযোগে উৎপন্ন হয় এবং নিউক্লিয় পর্দা ভেদ ক'রে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। এইভাবে উৎপন্ন R.N.A., D.N.A.-এর বার্তা বহন ক'রে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং Transfer R.N.A.-ও রাইবোজোমের সহায়তায় প্রোটিন সংশ্লেষ করে।

(খ) ট্রান্সফার R.N.A.(t-R.N.A.)

এই জাতীয় R.N A., D.N.A. থেকে উৎপন্ন হ'য়ে, সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। কোষের অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার হ'তে মেসেঞ্জার R.N.A. কর্তৃক নির্দেশিত কোডন (Codon) বা সংকেত বুঝে, সঠিক অ্যামাইনো অ্যাসিড সংগ্রহ ক'রে প্রোটিন সংশ্লেষণ স্থানে অর্থাৎ রাইবোজোমে নিয়ে যায়।

(গ) রাইবোজোমাল R.N.A. (r-R.N.A.)

কোষের সমগ্র R.N.A.-এর শতকরা ৪০ ভাগই রাইবোজোমাল R.N.A. এবং রাইবোজোমেই পাওয়া যায়, যদিও এই প্রকার R.N.A.নিউক্লিয়াসে সংশ্লেষিত হয়। r-R.N.A.প্রত্যক্ষভাবে প্রোটিন সংশ্লেষে সহায়তা করে। এর অণু একতন্ত্রী, অশাখ ও নমনীয়।

R.N.A.-এর মধ্যে D.N.A.-এর প্রতিলিপি গঠন

D.N.A.এর Template থেকে সংবাদ বা বার্তা বা নির্দেশ ব্যবহার ক'রে সমস্ত R.N.A. গঠিত হয়। R.N.A. সংশ্লেষের এই পদ্ধতিকে Transcription বা প্রতিলিপি গঠন বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ও D.N.A.এর সংকেতলিপির প্রেরিত বংশগতির বার্তা, R.N.A.এর অণুর মধ্যে পুনরায় লেখে। প্রত্যেকটি জিনে কেবলমাত্র D.N.A. এর একটি তন্তু, একটি পরিপূরক R.N.A. এর তন্তু তৈরীর জন্য Template হিসাবে কাজ করে। অনেকক্ষেত্রে সংলগ্ন জিনগুলিতে Template তন্তু আলাদা হিসাবে থাকতে পারে।

চিত্র ২. চারটি সাংকেতিক অক্ষর ACGU (কোড)-এর সাহায্যে ১৬টি দ্বিঅক্ষর যুক্ত কোড গঠিত হয়

বংশগতি ও সংকেতলিপি (The Genetic code)

প্রত্যেক গঠনগত জিন, একটি পলিপেপটাইডের জন্য সংকেতলিপি বহন করে। পলিপেপটাইডগুলি হ'ল অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি বড় শৃঙ্খল। D.N.A., R.N.A. ও পলিপেপটাইডগুলি দীর্ঘ ও শাখাহীন অণু। সুতরাং m-R.N.A.তে D.N.A.-এর মধ্যে নিউক্লিওটাইডের যে সজ্জারীতি তা প্রতিলিপিকৃত হ'তে অসুবিধা হয় না। এই সজ্জারীতিই আবার পলিপেপটাইডের অ্যামাইনো অ্যাসিডের সজ্জারীতির সংকেত হিসাবে কাজ করে। এই সংকেতলিপি ব্যবহার করা প্রোটিন সংশ্লেষকে বলা হয় অনুবাদ বা ভাষান্তর (Translation), কারণ বংশগতির নির্দেশ বা সংবাদ D.N.A.এবং R.N.A.এর নিউক্লিওটাইডের ভাষা থেকে প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভাষাতে ভাষান্তরিত হয়।

জীববিদগণ বংশগতীয় নির্দেশ বা সংবাদের ভাষান্তর বা অনুবাদ সম্পর্কে বলেন যে, এ যেন গোপন বার্তার সংকেতলিপির উদ্ধার। বার্তাবহ R.N.A.(m-R.N.A.) চার প্রকার নিউক্লিওটাইড

দিয়ে গঠিত হয় এবং সেইজন্য বংশগতিয় ভাষাকে চার অক্ষরের বর্ণমালা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রোটিনগুলি কুড়ি রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী হয়। অর্থাৎ বংশগতীয় সংকেত লিপিটির মধ্যে কুড়িটি বিভিন্ন শব্দ অবশ্যই থাকা চাই প্রত্যেকটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য। শব্দগুলি কেবলমাত্র একটি নিউক্লিওটাইড 'অক্ষর' হ'তে পারে না, কারণ সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কেবল চারটি সম্ভাব্য সাংকেতিক শব্দ হ'তে হবে এবং প্রোটিনগুলিতে চারটি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকতে হবে। একইভাবে শব্দগুলি কেবলমাত্র দুটি নিউক্লিওটাইডের দৈর্ঘ্য হ'তে পারে না। কারণ চারটি অক্ষরের দুটির দ্বারা সমস্ত সম্ভাব্য বিন্যাস সাজালে কেবল ১৬টি বিভিন্ন রকমের সাংকেতিক শব্দ পাওয়া যায়, অর্থাৎ $(৪)^{২}$ = ১৬।
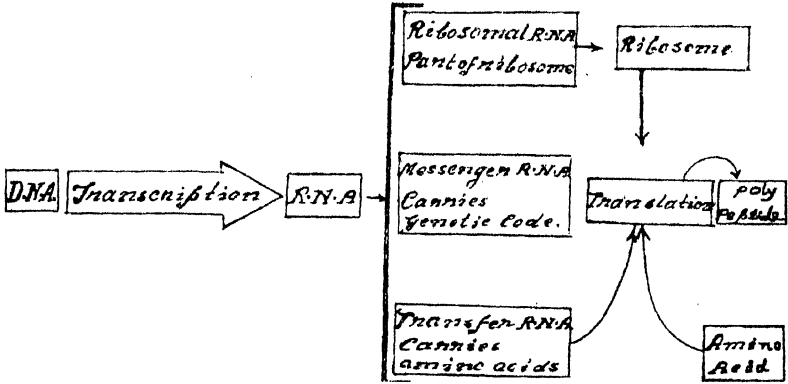
চিত্র ৩. DNA থেকে জিনগত বার্তা, পলিপেপটাইডের অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাসে পরিবহণ।

তবুও কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়। যাইহোক চারটি নিউক্লিওটাইডের তিনটি ক'রে সাজালে ৬৪টি সম্ভাব্য বিভিন্ন শব্দ উৎপন্ন করে [$(৪)^{৩}$ = ৬৪] যা প্রত্যেকটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য প্রয়োজনের থেকে বেশী একটি সাংকেতিক শব্দ উৎপন্ন করে। সুতরাং D.N.A.এর একটি সাংকেতিক শব্দের জন্য, ক্ষুদ্রতম তিনটি নিউক্লিওটাইডের প্রয়োজন হয়।

ফ্রান্সিস ক্রীক ও অন্যান্যরা একটি ব্যাকটেরিও ফাজ D.N.A. এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যার নিউক্লিওটাইড যোগ ক'রে ত্রয়ী সংকেত লিপি সংক্রান্ত তত্ত্ব পরীক্ষা করেন। তাঁরা এইভাবে যুক্তি দেখান যে, সংকেতলিপিটি একটি ত্রয়ী সংকেতলিপি হ'লে কেবল একটি অথবা দুটি নিউক্লিওটাইড জিনের মধ্যবর্তী অংশে ঢুকে, সেই অংশের পরে সম্পূর্ণরূপে আলাদা কোনও সংকেত পরিবর্তন ক'রবে। উদাহরণ হিসাবে যদি একটি বা দুটি গুয়ানিন (G) নিউক্লিওটাইডের সঙ্গে যোগ করা হয়, তাহ'লে ফলাফল হবে নিম্নরূপ।

D.N.A.র বার্তা যদি হয় "CAT - CAT - CAT"
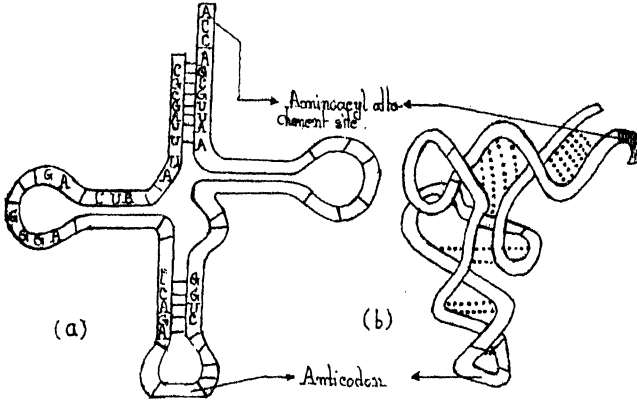
চিত্র ৪. a) t-RNA'র গঠন b) t-RNA'র একটি প্যাঁচানো অণু

'G' যোগ ক'রলে হবে – CAG* - TCA - TCA - T

অথবা CAG* - G*TC - ATC - AT

যেখানে * G = Inserted G.

T, AT হ'ল পরবর্তী অংশের কোড (Code).

যাইহোক তিনটি নিউক্লিওটাইড একটি জিনের মধ্যবর্তী অংশে ঢুকে কেবল সংক্ষিপ্ত ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। এর ফলে বার্তাটি মূল ভাষার মত পড়া যায়।

যেমন CAT - GGG - CAT - CAT

অথবা CAG - GGT - CAT - CAT

অথবা CGG - GAT - CAT - CAT ইত্যাদি

আলোচনা

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি আলোচনা ক'রলে দেখা যায় D.N.A.থেকে m-R.N.A. অণুতে একটি পলিপেপটাইডের জন্য বংশগতিয় সংকেতলিপি নকল হয়। m-R.N.A.টি এই সংকেতলিপি রাইবোজোমে বহন ক'রে নিয়ে যায়, প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য। m-R.N.A.নির্ধারণ করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাসরীতি। m-R.N.A. প্রত্যক্ষভাবে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সনাক্ত ক'রতে পারে না। একটি উপযোজক অণু অর্থাৎ t-R.N.A. প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, m-R.N.A. ও Amino Acid দুটিকে একত্রে আনতে। t-R.N.A. প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে রাইবোজোমে বহন ক'রে তাদের সাংকেতিক জায়গায় যুক্ত করে। m-R.N.A.অণুর জেনেটিক কোডটি রাইবোজোমে 'পঠিত হয়' এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি সেইমত একটির পর একটি যুক্ত হয়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া শেলীদি এই সমীক্ষা ক'রতে আমাকে সবদিক দিয়ে সাহায্য ক'রেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। জীবনবিজ্ঞান পরিচয় (নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য) -
শ্রীসলিলকুমার চৌধুরী, শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীদুলাল সাঁতরা

২। জীববিদ্যা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য) - মিত্র, চৌধুরী, সাঁতরা

৩। জীবনবিজ্ঞান পরিচয় (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য) - ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী

৪। A Journey Into Life by Arms & Camp; 1991

স্ত্রীজাতির মানবকোষে বার্ বডি : পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

মোনালিসা চৌধুরী (১৯৯৮)
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

ভূমিকা

জীবদেহে গঠন সম্পর্কে বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানার আগ্রহ। ফলে যুগ-যুগ ধ'রে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার কথাও জানা যায়। জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত। জীবদেহের গঠনোপযোগী ও কার্যক্ষম একক (Structural and Functional unit of life)-কেই 'সেল' (Cell) বা কোষ বলে। এক কথায় আবরণবেষ্টিত নিউক্লিয়াস যুক্ত প্রোটোপ্লাজমকেই কোষ বলে।

কোষের নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ নিউক্লিওপ্লাজমে অবস্থিত ক্রোমাটিন ফাইবার কোষ বিভাজনের সময় নিরুদিত হ'য়ে যে সুতোর মত স্পষ্ট আকার ধারণ করে, তাদের ক্রোমোজোম বলে। প্রকৃতপক্ষে এই ক্রোমোজোমই বংশগতিতে পরিত্যক্ত হয় অথবা প্রজাতি-বিবর্তনে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

1969 সালে বিজ্ঞানী Barr এবং Bertram আবিষ্কার ক'রেছিলেন যে স্ত্রীজাতির ইণ্টারফেজ নিউক্লিয়াসে একটি ক্ষুদ্র ক্রোমাটিড বডি থাকে যা পুরুষজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না, সেটিকে বলা হয় সেক্স-ক্রোমাটিন (Sex Chromatin) বা বার্-বডি (Barr Body)। 1971 সালের Paris Conference-র পর থেকে একে **এক্স-ক্রোমাটিন** বলা হয়। জীবনবিজ্ঞান প্রোজেক্টের জন্য এই **সেক্স-ক্রোমাটিনই** আমার উপস্থিত সমীক্ষার বিষয়। **সেক্স-ক্রোমাটিন** হ'চ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র ক্রোমাটিন বডি যা থেকে স্ত্রী এবং পুরুষের সনাক্তকরণ সম্ভব। চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমাটিনের সাহায্যে ক্রোমোজোম ঘটিত জন্মগত বা অসামঞ্জস্য রোগের চিকিৎসা করা হয়। বিশেষত এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যেই এই প্রজেক্টটির কাজ হাতে নিয়েছি।

উপকরণ ও পদ্ধতি

১। মুখবিবরের আবরণী কলা (স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের), ২। কভার স্লিপ, ৩। স্লাইড, ৪। অ্যাসিটো-অর্সিন রঙ (Aceto orcein stain)

স্লাইডের সাহায্যে মুখবিবর অর্থাৎ গালের অন্তস্তক থেকে সাবধানে সামান্য পরিমাণে আবরণী কলা চেঁছে নেওয়া হ'ল। পরে অন্য একটি স্লাইডের সমস্ত অংশ জুড়ে ওই আবরণী কলা ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর কভারস্লিপের চারদিকে অল্প ক'রে অ্যাসিটো-অর্সিন রঙ (২%) দেওয়া হ'ল। দুই থেকে তিন মিনিট স্লাইডটিকে শুকনো হ'তে দেবার পর, অল্প পরিমাণ জলে সাবধানে ধুয়ে ফেলা হ'ল, যাতে বাড়তি রঙ না থাকে, তারপর স্লাইডটিকে মাইক্রোস্কোপে স্থাপন করা হ'ল।

এই একই পদ্ধতিতে আমি আলাদা-আলাদা ভাবে মোট আটটি স্লাইড তৈরী ক'রেছিলাম।

যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ নং স্লাইডগুলি মহিলাদের মুখবিবরের আবরণী কলা (স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম) থেকে এবং ৫, ৬, ৭ ও ৮নং স্লাইডগুলি পুরুষদের স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কলা থেকে মোট আটটি স্লাইড, তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত ক'রেছিলাম।
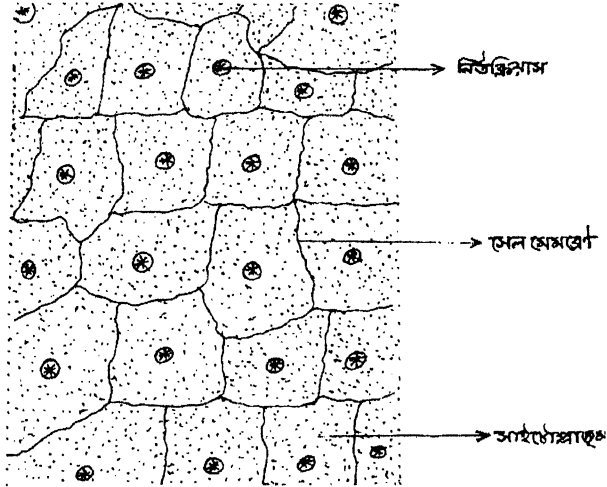
চিত্র ১. স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম
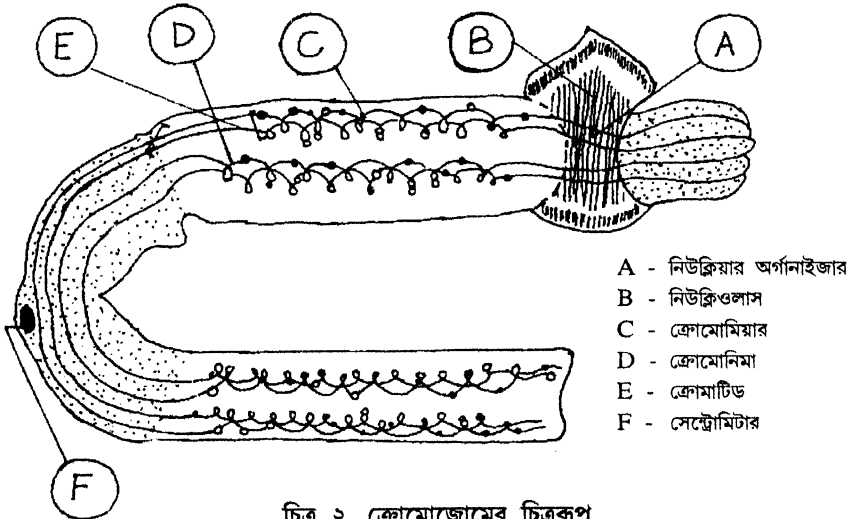
চিত্র ২. ক্রোমোজোমের চিত্ররূপ
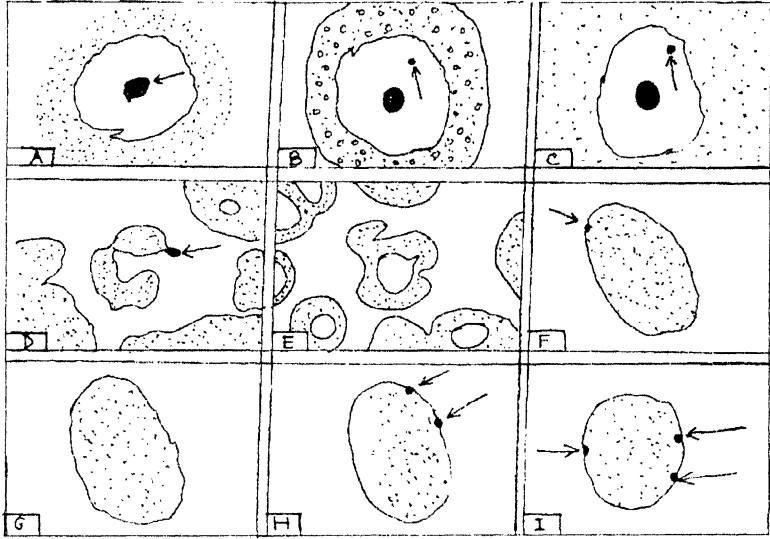
চিত্র ৩. [একটি স্ত্রীলিঙ্গ প্রাণীর স্নায়ুকোষের মধ্যে A. নিউক্লিয়াসের কাছে B. নিউক্লিওপ্লাজমে C. নিউক্লিও পর্দার নীচে D. নিউক্লিয়ার লিউকোসাইটের মধ্যে অ্যাপেনডেজ রূপে E. পুরুষের ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমাটিন নেই F. একটি সেক্স-ক্রোমাটিন G. পুরুষের ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমাটিন নেই H. XXX ক্রোমোজোম যুক্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুটি সেক্স-ক্রোমাটিন I. XXXX ক্রোমোজোম যুক্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিনটি সেক্স-ক্রোমাটিন। → চিহ্ন দ্বারা সেক্স-ক্রোমাটিন (বার্-বডি) চিহ্নিত করা হ'য়েছে।]

আলোচনা

বার্‌বডি সম্পর্কে জানার আগে আমাদের ক্রোমোজোম সম্পর্কিত কিছু তথ্য জানা দরকার। মানবদেহে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। ২২ জোড়া সাধারণ অর্থাৎ অটোজোম (Autosome) আর এক জোড়া যৌন ক্রোমোজোম (Sex Chrosome)। যৌন ক্রোমোজোম দুই প্রকার 'X' এবং 'Y'।

৪৪টি অটোজোম + XY (পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা)

৪৪টি অটোজোম + XX (স্ত্রীর ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা)

এই ক্রোমোজোম সম্পর্কিত তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়েছিল 1956 সালে। 1958 সালে কোষ-প্রজনন বিদ্যার এক নূতন যুগ আরম্ভ হ'য়েছিল Banding Techniques-এর ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে। এর অনেক পরে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশের সনাক্তকরণ ও তাদের সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভবপর হ'য়েছিল। কোষ-প্রজনন বিদ্যার ক্ষেত্রে সমীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে প্রায় 0.5% নবজাতকদের মধ্যে ক্রোমোজোমজনিত রোগ হয়। এই ক্রোমোজোম ঘটিত রোগ বেশীর ভাগ উপস্থিত থাকতে দেখা যায় সেক্স-ক্রোমোজোমে। অবশ্য এই ধরণের রোগ সেক্স-ক্রোমোটিনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতেও হ'তে পারে।

মানুষের ক্রোমোজোমজনিত অস্বাভাবিকতার (Chromosomal Abnormalities) নিম্নলিখিত কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকারভেদগুলি হ'ল—

১. Monosomic

মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৫ টি।

(৪৪ টি অটোজোম + XO)

সেক্স-ক্রোমোটিন অর্থাৎ বার-বডি থাকে না।

এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষদের মধ্যে Turner's Syndrome দেখা যায়। এটি এক ধরণের Gonadial dysgenesis । ৪৬ টি ক্রোমোজোমের জায়গায় ৪৫ টি ক্রোমোজোম থাকে। একটি সেক্স-ক্রোমোজোম থাকে না। সেক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমোজোমের সংখ্যা XO টি।

জন্মগত ভাবে পুরুষ হ'লেও এদের বহিরাকৃতি হয় মহিলার মত। অল্প পরিমাণে চুল থাকে, খর্বাকৃতি হয়, ঘাড় খুব পাতলা চামড়া দ্বারা গঠিত হয় এবং যৌনঅঙ্গ অপরিণত থাকে। ডিম্বানুর বৃদ্ধি ঘটে না। জননকোষ (Germ Cell) সম্পূর্ণরূপে থাকে না। Menstruation ঘটে না এবং গৌন (Secondary Sexual) চরিত্রগুলি প্রকট হয় না।

২. Trisomic

মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৭ টি।

(৪৪ টি অটোজোম + XXY)

সেক্স-ক্রোমাটিন অর্থাৎ বার-বডির সংখ্যা একটি।

এরা Metafemale নামে পরিচিত এবং Klinfelter's Syndrome যুক্ত হয়। এদের অণ্ডকোষ (Testis) ছোট হয়, বক্ষদেশ অধিক বৃদ্ধি পায়, লম্বা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, সেকেণ্ডারী সেক্স চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনেক সময় প্রকট হয় না। স্পারমাটোজেনেসিস ঘটে না।

৩. Tetrasomic

মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৮ টি।

(৪৪ টি অটোজোম + XXXY)

সেক্স-ক্রোমাটিন অর্থাৎ বার-বডি ২ টি।

এদের ক্ষেত্রে Klinfelter's syndrome দেখা যায়। এরা মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। অনেক সময় এদের মানসিক ক্রিয়া বন্ধও হ'য়ে যায়।

৪. Pentasomic

মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৯ টি।

(৪৪ টি অটোজোম +XXXXY)

সেক্স-ক্রোমাটিন অর্থাৎ বার-বডি তিনটি।

এই ধরণের পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের বাহ্যিক গঠনে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। বংশগত রোগের প্রকট খুব বেশী হ'য়ে থাকে এবং এরা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

৫. **Syndrome**

যে পুরুষরা দুটি (Y) ক্রেমোজোম যুক্ত হয় তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকে। আধুনিক যুগে সমীক্ষায় দেখা গেছে ৬৫০ জনের মধ্যে ১ জনের এইরূপ হয়।

সেক্স-ক্রোমাটিন ও সেক্স-ক্রোমোজোমের মধ্যে সম্পর্ক

স্ত্রীলিঙ্গ প্রাণীদের স্বাভাবিকভাবে দুটি সেক্স-ক্রোমোজোম থাকে একটি সক্রিয় ও অপরটি নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয় সেক্স-ক্রোমোজোমটিই ইণ্টারফেজে **বার-বডিতে** রূপান্তরিত হয়।

সিদ্ধান্ত

বার-বডি অর্থাৎ সেক্স-ক্রোমাটিন বা এক্স-ক্রোমাটিন স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি সেক্স-ক্রোমোজোম থাকে (XX)। কোষবিভাজনের সময় একটি সক্রিয় হয় এবং অপরটি থাকে নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয় সেক্স-ক্রোমোজোমটিই ইণ্টারফেজে একটি কালো বিন্দুতে পরিণত হয় এবং নিউক্লিয়াসের গায়ে এই আণুবীক্ষণিক ক্রোমাটিন বডিটি থাকে। একেই বার-বডি/সেক্স-ক্রোমাটিন/এক্স-ক্রোমাটিন বলে।

পুরুষদের মধ্যে যদি ক্রোমোজোমজনিত অস্বাভাবিকতা থাকে তবেই তাদের ক্ষেত্রে বার-বডি থাকতে পারে। দেহের অভ্যন্তরে বার-বডির কোনও ক্রিয়া নেই। কিন্তু ক্রোমোজোমজনিত অস্বাভাবিকতা ও বংশগত রোগ নির্ণয়ে বার-বডির সাহায্য নেওয়া হয়।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

সেক্স-ক্রোমাটিনের সম্বন্ধে সমীক্ষা ক'রতে আমাকে উৎসাহ দেন আমাদের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অম্বুজদা। আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া ঈপ্সাদি। শিক্ষাসত্র পরীক্ষাগারে সাক্ষীদার কাছে প্রোজেক্টটি সম্পন্ন ক'রতে অনেক সাহায্য পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি বিশ্বভারতীর প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া শেলীদি এই সমীক্ষা ক'রতে আমাকে সবদিক দিয়ে সাহায্য ক'রেছেন এবং ঐ বিভাগের গবেষিকা রাখীদি, সুতপাদি ও শাঁওলীদিদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য এই সমীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রতে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছে। এঁদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। মাধ্যমিক জীববিদ্যা - ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্ত্তী
২। Dictionary of Zoology Dr. S.C. Shukla and Dr. Dhamo K. Bhutani
৩। Cell and Molecular Biology E.D.P. De Robertes, E.M.F. De Robertis, JR.

৫

প্রসঙ্গ : রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিজ্ঞান সভার পুরস্কৃত তিনটি প্রবন্ধ
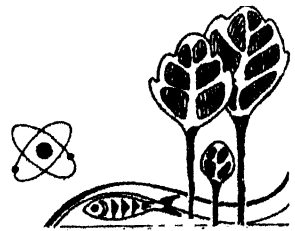
রাস্তার আলোয় ব্যবহৃত তড়িৎশক্তির অপচয়

উৎপল ঘোষ, দেবর্ষি মিত্র, অনুরাগ চট্টোপাধ্যায়, সৌগত মুখোপাধ্যায়, কিংশুক মণ্ডল
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

বর্তমানে, ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপক শক্তি সংকটের সম্মুখীন। শক্তি সংকট ও তার সমাধান নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ক'রছেন। কারণটা সবারই জানা, শক্তি (Power) -এর উপরই নির্ভর করে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব। মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শক্তির চাহিদা। আজকে যে-কোনও উন্নয়নের মাপকাঠি হ'চ্ছে উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত শক্তি। উন্নতির অর্থনৈতিক পরিমাপক সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Domestic Product বা GDP) এর সঙ্গে শক্তির ব্যবহার সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য শক্তি সরবরাহ অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শক্তির যোগানের জন্য প্রচলিত উৎস সমূহের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। যে হারে চাহিদা বাড়ছে এবং পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ কয়লা, গ্যাস ও খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে তা দিয়ে বড়জোর এক'শ বা দেড়'শ বছর চালান যেতে পারে। বর্তমানে, ভারতবর্ষের অসংখ্য বিজ্ঞানী বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধানের গবেষণায় ব্যস্ত।

কিন্তু, এতসব সতর্কবাণী সত্বেও, আমাদের অনেকেরই এখনও চেতনার অভাব। শক্তি উৎপন্নের সঙ্গে-সঙ্গে বহুক্ষেত্রে শক্তির অপচয়ও হ'চ্ছে, গণসচেতনতার অভাবে বা কর্মে গাফিলতির জন্য। যতদিন না বিকল্প শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় আমাদের ততদিন প্রচলিত পদ্ধতিতেই শক্তি (Power) উৎপন্ন ক'রতে হবে। সুতরাং উৎপাদিত শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়েই শক্তি সংকটের অনেকখানি মোকাবিলা ক'রতে হবে।

আমরা কয়েকজন ছাত্র মিলে এক সমীক্ষা চালিয়ে জানতে চেয়েছিলাম যে, কত পরিমাণ শক্তি (Power)-র প্রতিনিয়ত অপচয় হ'চ্ছে। আমরা নয় বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে, রাস্তার বৈদ্যুতিক বাতিগুলিকে নিয়ে সমীক্ষা চালাই।
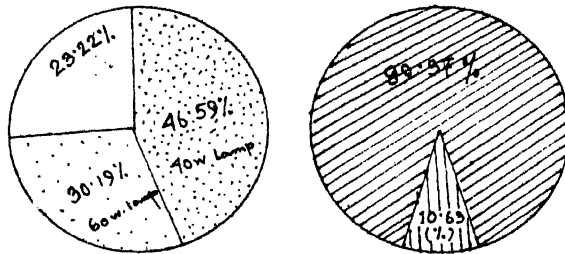
চিত্র ১. ব্যবহৃত বিভিন্ন ওয়াটের ল্যাম্প ও তাদের অপচয়ের পরিমাণ

আমাদের পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল থেকে লক্ষ্য করলাম যে, প্রকৃত সন্ধ্যার আগেই রাস্তার আলোগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং সকালে সূর্যোদয়ের পরেও আলোগুলি জ্বলে থাকে। এর ফলে প্রতিদিন প্রায় ৮০ - ৯০ মিনিট সময় ধ'রে শক্তির অপচয় হয় (চিত্র ১-২)। এই যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নষ্ট হয়, তা দিয়েছোটোখাটো কারখানা চালান যেতে পারে, যার থেকে বেশ কিছু বেকার যুবকের কর্মসংস্থান ক'রে দেওয়াও সম্ভব। এছাড়া গ্রামে ছোট শিল্প বা কৃষিকার্যে ঐ শক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি এই বিনিয়োগের ফলে ভারত তার অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব ঘোচাতে পারে, হাসি ফুটতে পারে অসংখ্য দরিদ্র ভারতবাসীর মুখে, গড়ে উঠতে পারে আমাদের স্বপ্নের ভারত।

আমাদের এই সমীক্ষার ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত ক'রে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ ক'রছি।

প্রতিকারের পদ্ধতি :

ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমাদের এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল অবহিত করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা এই অপচয় রোধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রতে পারেন।

খ) স্বয়ংক্রিয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যার দ্বারা আলোগুলিকে সঠিক সময়ে জ্বালানো এবং নেভানো যায়।

গ) এলাকার জনসাধারণকে এই অপচয় সম্বন্ধে অবহিত ক'রলে তারাও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এই অপচয় রোধে সচেষ্ট হ'তে পারেন।

ঘ) ৬০ ওয়াট বাল্বের পরিবর্তে ৪০ ওয়াট ফ্লুরোসেণ্ট টিউব লাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, প্রতিটি বাল্ব, প্রতিটি ফ্লুরোসেণ্ট টিউব লাইট অপেক্ষা ২০ ওয়াট অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করে, কিন্তু সে তুলনায় আলো কম হয়।
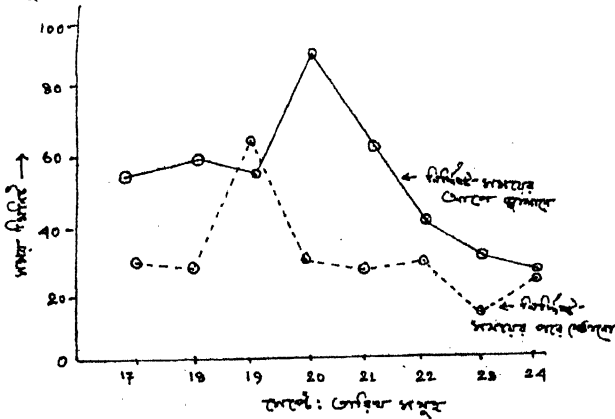
চিত্র ২. দৈনিক অপচয়ের পরিমাণ

অনুসন্ধানের এলাকা	আলোর বিবরণ	আলোর সংখ্যা	মোট ওয়াট	তারিখ	প্রকৃত সন্ধ্যা *(pm)	আলো জ্বালানোর সময় (pm)	প্রকৃত ভোর *(am)	আলো নেভানোর সময় (am)	প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় (মিনিট)	প্রতিদিনের অতিরিক্ত সময়ের গড় (মিনিট)	প্রতিদিনের শক্তির অপচয়	বৎসরের প্রতি বর্গ কি.মি.তে মোট শক্তির অপচয়
বোলপুর, শ্রীনিকেতন,	৬০ ওয়াট	১৩০	৭৮০০	১৭.৯.৯৬	৫-৫৮	৫-৩০	৫-০৫	৫-৫৭	২৮+৫২=৮০			
শান্তিনিকেতন ও	বাল্ব		ওয়াট	১৮.৯.৯৬	৫-৫৭	৫-৩০	৫-০৫	৬-১০	২৫+৫৫=৮০			
কাছাকাছি অন্যান্য	৪০ ওয়াট	৩০১	১২০৪০	১৯.৯.৯৬	৫-৫৬	৪-৫৫	৫-০৫	৫-৫৬	৬১+৫১=১১২			
এলাকা	টিউব লাইট		ওয়াট									
অনুসন্ধানের এলাকার	১৫০ ওয়াট	৪০	৬০০০	২০.৯.৯৬	৫-৫৫	৫-২৭	৫-০৫	৬-১০	২৮+৮৫=১১৩	৭৭.৪৫	৩৩.৪৮ কিলো ওয়াট/ঘন্টা	১৩৫৭.৮০ কিলো ওয়াট/ঘন্টা
আয়তন	ভেপার ল্যাম্প		ওয়াট									
= ৯ বর্গ কিলোমিটার			২৫৮৪০	২১.৯.৯৬	৫-৫৪	৫-২৭	৫-০৫	৬-০২	২৪+৬৩=৮৭			
			ওয়াট	২২.৯.৯৬	৫-৫৩	৫-২৭	৫-০৬	৫-৪৫	২৬+৩৯=৬৫			
				২৩.৯.৯৬	৫-৫২	৫-৪০	৫-০২	৫-৩০	১২+২৮=৪০			
				২৪.৯.৯৬	৫-৫১	৫-৩০	৫-০৬	৫-৩০	২১+২৪=৪৫			

প্রকৃত সন্ধ্যা : সূর্যাস্তের পর ২০ মি: ধরা হয়েছে।

প্রকৃত ভোর : সূর্যোদয়ের পূর্বে ২০ মি: ধরা হয়েছে।

একটি ৫ হর্সপাওয়ার মোট দ্বারা ৯ ঘন্টায় গৃহীত শক্তি = $\frac{৫\times৭৪৬\times৯}{১০০০}$ কিলোওয়াট/ঘন্টা = ৩৩.৫৭ কিলোওয়াট/ঘন্টা

সারণী ১

প্রতিদিন বর্গকিলোমিটার স্থানের অপচয় শক্তির মূল্য টাকায়	১টি ৬০ ওয়াট + ১টি ৪০ওয়াট আলো প্রতিদিন ৫ ঘন্টা হিসাবে যতগুলি ঘরে দেওয়া যায়	১টি ৬০ ওয়াট-এর আলো প্রতিদিন ৫ ঘন্টা হিসাবে যতগুলি ঘরে দেওয়া যায়	১টি ৫ হর্সপাওয়ার মোট প্রতিদিন প্রায় ৯ ঘন্টা হিসাবে যতগুলি চালানো যায়
১২,২২০=০০	৬৭টি	১১৩টি	১টি

সারণী ২

৬) আমাদের সমীক্ষা (সারণী ১ ও ২)থেকে দেখা গেছে যে, ৯ বর্গকিমি. পরিমিত এলাকায়, রাস্তায় আলো জ্বালানোর জন্য প্রতিনিয়ত যে শক্তি অপচয় হয় তার পরিমাণ 33.48 Kwt/day. আর্থিক দিক থেকে হিসাব ক'রলে এর পরিমাণ বৎসরে ১২,২২০ টাকা দাঁড়ায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে এই পরিমাণ শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ক'রলে বিনা খরচায় নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে :

i) প্রতি বাড়িতে একটি ৬০ ওয়াট এবং একটি ৪০ ওয়াট-এর বৈদ্যুতিক বাতি, ৬৭টি ঘরে দৈনিক ৫ ঘণ্টা ক'রে জ্বালানো যেতে পারে।

ii) 'লোকদীপ প্রকল্প' যেখানে একটি ৬০ ওয়াট-এর বৈদ্যুতিক বাতি যদি প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা ক'রে জ্বালানো যায়, তবে প্রায় ১১৪টি বাড়িতে জ্বালানো সম্ভব।

iii) স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি ৫ এইচ পি. একটি মোটর ব্যবহার করেন তবে প্রতিদিন প্রায় ৯ ঘণ্টা বিনা খরচায় ব্যবহার করে স্বনির্ভর হ'তে পারেন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালে 'কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস'-এ পঠিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ছয় মিনিটের প্রতিযোগিতামূলক বক্তৃতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

জৈব প্রযুক্তিতে বিপ্লব : সুবিধা ও অসুবিধা

মেঘমিত্রা মাহাতো
নবম শ্রেণী, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

মাননীয় অতিথিবৃন্দ, পরিচালক মণ্ডলী, শ্রদ্ধেয় বিচারকগণ এবং সুধী বন্ধুগণ,

আজকের এই সভায় 'জৈব প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও তার সুবিধা ও অসুবিধা' সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ ক'রতে সুযোগ পাওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। চিরাচরিত নিয়মের বাইরে থেকে দ্রুতলয়ে আসা যখন কোন বস্তু বা ঘটনা তার স্বপারিপার্শ্বিক স্থিতাবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটায় তখনই তাকে বলে 'বিপ্লব'। এমনই এক যুগ-বিপ্লব ঘটিয়েছে জীববিদ্যা, জৈবরসায়ন ও প্রযুক্তিবিদ্যার মিশ্ররূপ 'জৈবপ্রযুক্তি'। ১ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে কি কি জিনিষ আমরা চাই (ছবি গাছের ফল) আর কি কি আমাদের আছে (ছবি **শিকড়**) জৈবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায়। এখন যা আছে আর

চিত্র ১. জৈব-প্রযুক্তির কাল্পনিক বৃক্ষ

যা আমাদের চাহিদা তার মাঝে সংযোজক হিসাবে 'জৈবপ্রযুক্তিকে' বসালে আমরা আমাদের চাহিদাগুলিকে পূরণ ক'রতে পারি এই বৃক্ষের ফলস্বরূপ।

জৈবপ্রযুক্তির এই বিভিন্ন শাখায় বর্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলি হ'ল (চিত্র ২) জ্বালানী, রোগনিরাময়ক এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (যার মাধ্যমে বদলে দেওয়া যায় জীবের আঙ্গিক গঠনের মানচিত্র) ইত্যাদি।

চিত্র ২. মানুষের জিন ভেড়ায় প্রতিস্থাপন (ট্রান্সজেনিক ভেড়া)

এই চার্টের (চিত্র ৩ ও ২) প্রথমার্ধে এণ্ডোনিউক্লিয়াসিস ও লিগেসিস-এর মত এনজাইমের সাহায্যে দুটি DNA-এর মধ্যে জিন স্থানান্তকরণ করার পদ্ধতি দেখানা হ'য়েছে। এখানে জিনের বাহক হ'ল প্লাজমিড। দ্বিতীয়ার্ধে, 'gene transfication'-এর মাধ্যমে নতুন 'transgenic'- জীব তৈরীর উদাহরণ দেওয়া হ'য়েছে। মানবজিন α-I antitripsin-ভেড়ার DNA-তে সংযোজন করা হয় যাতে তা তার 'transgenic' শাবকের মধ্যে পাওয়া যায়। একই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয় B-C factor IX। বর্তমানে এই সব প্রাণীদের জীবন্ত 'bio-reactor' হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়াস চ'লছে। তাই এই প্রাণীদের থেকে নতুন ওষুধ তৈরী করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যাকে বলা হয় 'molecular pharming' বর্তমানে সবক্ষেত্রেই সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় হ'ল 'ক্লোনিং' (cloning) যার প্রারম্ভ ১৯৯৭ সালের স্কটল্যাণ্ডের রসলিনে 'Animal Breeding Station'-এ,
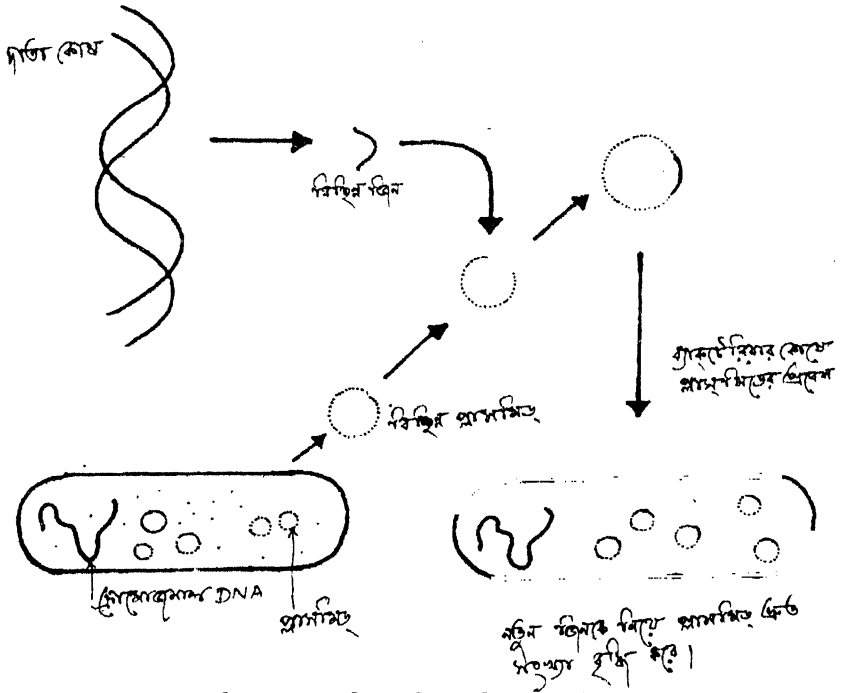
চিত্র ৩. ব্যাক্টেরিয়ায় জিন্ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া

এবং যার সর্বশেষ নমুনা হ'ল চীনের বিজ্ঞানী য়ু চাং মিং-এর স্বহস্ত ক্লোনিং। আর এই সমস্ত কাজের পথ প্রশস্ত করেছেন স্যার জন ক্রেগ ভেণ্টার যিনি জিন মানচিত্রের অর্থোদ্ধারের মতো এক যুগান্তকারী কাজ ক'রেছেন। তাই আজ বলা সম্ভব যে কোন 'জিন' কোন জৈব রাসায়নিক কাজ ক'রতে সমর্থ। যদিও জিন সজ্জার সমস্ত অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

খাদ্যের এই ব্যাপক চাহিদা আজ বিশ্বব্যাপী। এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হ'য়েছে কৃষিক্ষেত্রে, জৈবপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন কীটনাশক, সার, বিভিন্ন transgenic উদ্ভিদ (জিন প্রতিস্থাপিত) — যেমন আলু, টম্যাটো, তামাক ইত্যাদি আজ কৃষি সমস্যা মোকাবিলার মূল হাতিয়ার স্বরূপ। বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিক যেমন Ryfamicin, Actinomycin D, Streptomycin ইত্যাদি হ'ল মানবসমাজের কাছে জৈব প্রযুক্তির এক অত্যাশ্চর্য উপহার। এছাড়া monoclonal antibody (চিত্র ৪), interferons, vaccines প্রভৃতি রোগনিরাময়ক ও মানবজাতির কাছে এসেছে আশীর্বাদ হ'য়ে।

এই চার্টে (চিত্র ৪) আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি (monoclonal antibody) তৈরী হয়। ইঁদুরের প্লীহার শ্বেত রক্তকণিকা থেকে মায়লেমা কোষের সঙ্গে সংযোজন ঘটিয়ে এই কাজ করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক যেমন— theraputic products,
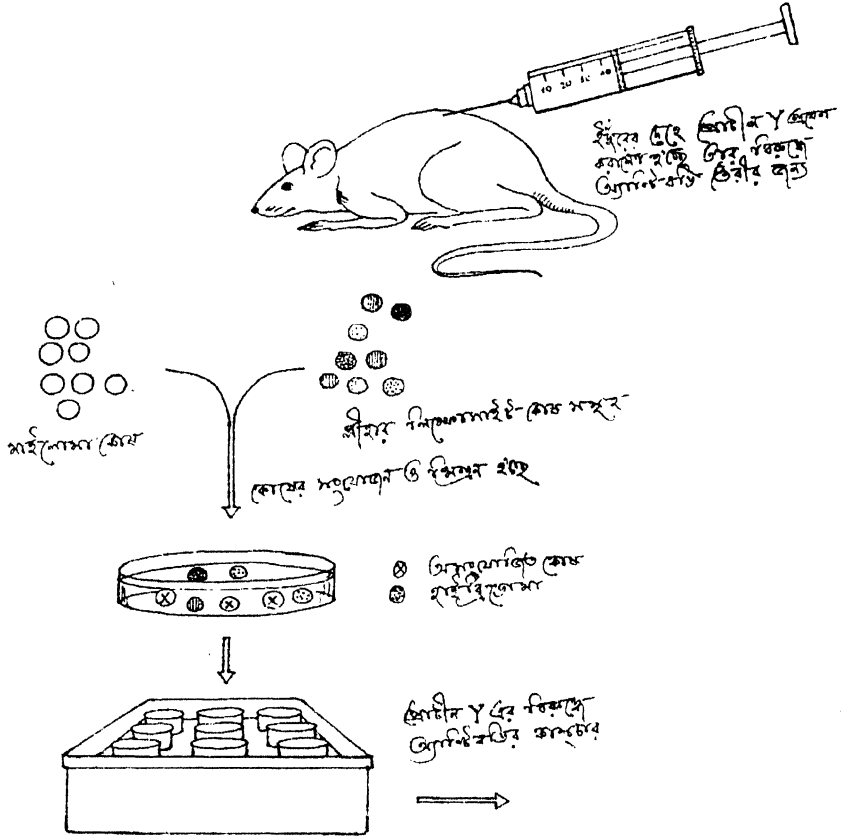
চিত্র ৪. মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি প্রস্তুত পদ্ধতি

prenantal diagonasis, for disease idenfication, immunodiagonastic and DNA probes for disease identification, genetic Engineering বা Genetic therapy ইত্যাদি আজ জৈবপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। Insulin বা Somatostatin যা কিনা Escherichia coli বা অন্য transgenic প্রাণী থেকে তৈরী, তার চাহিদাও আজ আকাশ ছোঁয়া।

Micro-organisms-এর মাধ্যমে bio-remediation আজ দ্রুতলয়ে এগিয়ে চ'লেছে। তামা, দস্তার মতো ধাতু ও আমরা নিম্নমানের খনি থেকেও উত্তোলন ক'রতে পারি microbial mining-এর মাধ্যমে। খনিজ জ্বালানী 'ক্ষয়ের হার সৃষ্টির থেকে ১০,০০০ গুণ বেশী'। তাই সৌরশক্তি ও ভূতাপ শক্তির পাশাপাশি biogas ও biomass এই দুইই আজ অপরিহার্য।

চিত্র ৫ চার্টে দেখানো হয়েছে যে জৈবপ্রযুক্তি কিভাবে বিভিন্ন পার্থিব বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে
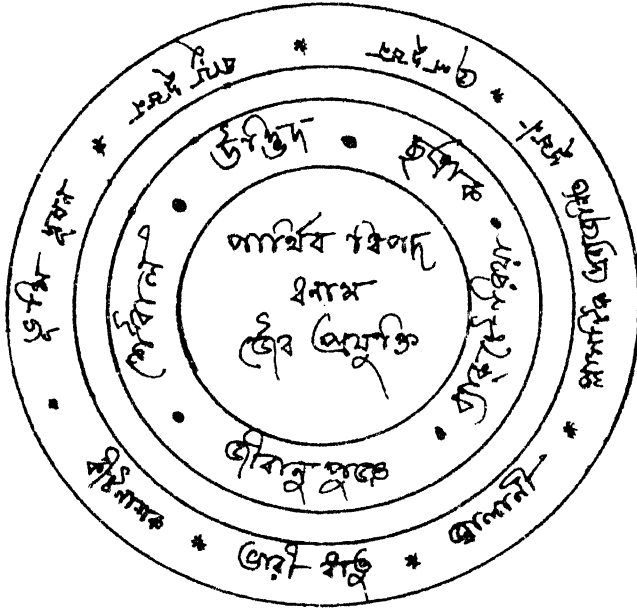
চিত্র ৫. জৈবপ্রযুক্তির বিপদ ও সমাধান সূত্র

ল'ড়তে সাহায্য করে। বিভিন্ন ফান্‌গি (ছত্রাক), অ্যালগি (শৈবাল) বা ব্যাক্টেরিয়া যেমন Alcaligen eutrophics ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা যায়, প্রায় অবিভাজ্য প্লাস্টিককে ভেঙে ফেলা যায় সরল উপাদানে।

এবার আসা যাক জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগে উদ্ভূত কিছু সম্ভাব্য বিপদের (চিত্র ৫) কথায়। অন্য যে কোনও বিপ্লবের মতোই জৈবপ্রযুক্তিগত বিপ্লবও বেশকিছু শুভ সম্ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে বহন ক'রে এনেছে কিছু বিপদের আশঙ্কা। সামান্য কিছু উদাহরণই বোধহয় যথেষ্ট হবে এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। ক্লোনিং শুধু সামাজিক বা নৈতিক কারণেই বিতর্কিত নয় এটা আমাদের নৈতিক সমস্যা। জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগে সমৃদ্ধ জীবের ব্যবসাও আজ ভয়াবহ আকার ধারণ ক'রেছে। Monsanto-র মতো কিছু অতীব ধনী এবং উন্নত সংস্থা, উন্নয়নশীল দেশে জনগণের ওপর আধিপত্য গ'ড়ে তুলেছে, যার অদূরবর্তী ফল সাধারণ মানুষের মৃত্যু। Intellectual Property Rights-কে হাতিয়ার ক'রে উন্নত দেশগুলি আধিপত্য বাড়াচ্ছে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরে। হয়ত এর থেকেই জন্ম নেবে কোনও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংঘর্ষ। 'জৈবপ্রযুক্তি'র গুণসম্পন্ন অস্ত্রাদি ব্যবহার হ'ল এর বিপদ-সূচনার এক অন্যতম দিক।

এই বিপদ-এর সম্ভাবনা দ্রুত বিস্তারলাভ ক'রবে যদি না আমরা দ্রুত এর কোন সমাধান বের ক'রতে পারি। বিজ্ঞানীর একার পক্ষে এর সমাধান করা অসম্ভব যদি না সমস্ত ক্ষেত্রের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনা না হ'য়ে ওঠেন।

তবে যাই হোক না কেন আমরা সকলে আশা ক'রব জৈবপ্রযুক্তির এক কালিমামুক্ত, অনির্বচনীয় সুন্দর ভবিষ্যত। ধন্যবাদ।

২০০২ সালে কোলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামে (BITM) অনুষ্ঠিত রাজ্য যুব বিজ্ঞান সেমিনারে বিশেষ পুরস্কৃত।

জাতীয় উন্নয়নে দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োগ : সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

রাজদীপ কোণার
দশম শ্রেণী, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী

সম্মানীয় সুধীবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল "জাতীয় উন্নয়নে দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং তার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা"।

প্রথমেই জেনে নিই দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কি? এর প্রকৃত কাজ হ'ল, পৃথিবী থেকে দূরে স্থাপিত কোন কৃত্রিম উপগ্রহ বা আকাশ-যান থেকে প্রযুক্তিগত কৌশলের মাধ্যমে, কোনও লক্ষ্যবস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য চাক্ষুষভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা। জাতীয় উন্নয়নে এটি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নানা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগও সম্ভব হ'য়েছে। পৃথিবী ও তার পরিবেশকে সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা এবং তার উপযুক্ত দেখভাল করাই এর কাজ। এই প্রযুক্তি আমাদের তৃতীয় নেত্রের অধিকারী ক'রেছে এবং আমাদের সীমিত শক্তি ও ক্ষমতাকে জয় ক'রতে সাহায্য ক'রেছে। তথ্য সংগ্রহে গতি আনা ও নিখুঁত পরিমাণ নির্ধারণ করা এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

দূর সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তিতে তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীর বিভিন্ন সীমা-পরিসরের বৈজ্ঞানিক নীতিকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যবস্তুর তথ্য নিরূপণ করা হয়। প্রধানতঃ তিনটি ভাগে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রথম ভাগের কাজ তথ্য সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগে তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় ভাগের কাজ প্রাপ্তফল নথীভূক্তকরণ এবং তা ব্যবহারের সুবিধার্থে উপযুক্তভাবে রেখ ও লেখচিত্র সহযোগে সুপারিশ।

দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ প্রণালীতে একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ (Elcctro-Magnetic Radiation) শক্তির উৎস বা আধারের অবশ্যই প্রয়োজন। সূর্যকে EMRএর উৎস হিসাবে ব্যবহার ক'রলে পরোক্ষ (Passive) এবং স্বয়ংক্রিয় (Self-emmission) উৎসকে প্রত্যক্ষ (Active) উৎস বলা হয়। উক্ত যে কোন পদ্ধতিতে প্রাপ্ত EMR, পৃথিবীর ওপর অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুতে প্রেরণ করা হয়। EMR লক্ষ্যববস্তুর এবং আবহাওয়ার সাথে ক্রিয়া করে। অতঃপর সেই বিক্রিয়ালব্ধ EMR দূর-সংবেদকে সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট পন্থায় তথ্য উৎপন্ন হয়। এই তথ্য যথাস্থানে প্রেরিত হয় ও computer-এর সাহায্যে পর্যায়ক্রমে বোধগম্য ও দৃষ্টিগোচর করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে অকুস্থলে পর্যবেক্ষণ ক'রে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং

এই দুই ধরণের তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে লক্ষ্যবস্তুর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য নানা চেহারায় নিরূপিত হয়।
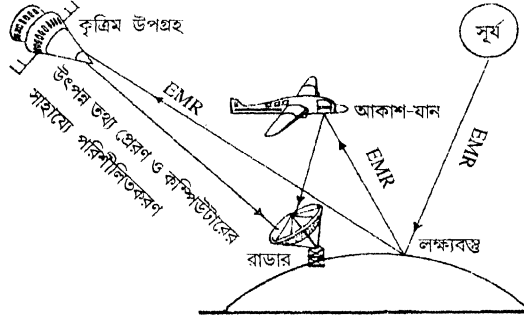
চিত্র ১. দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ প্রণালী
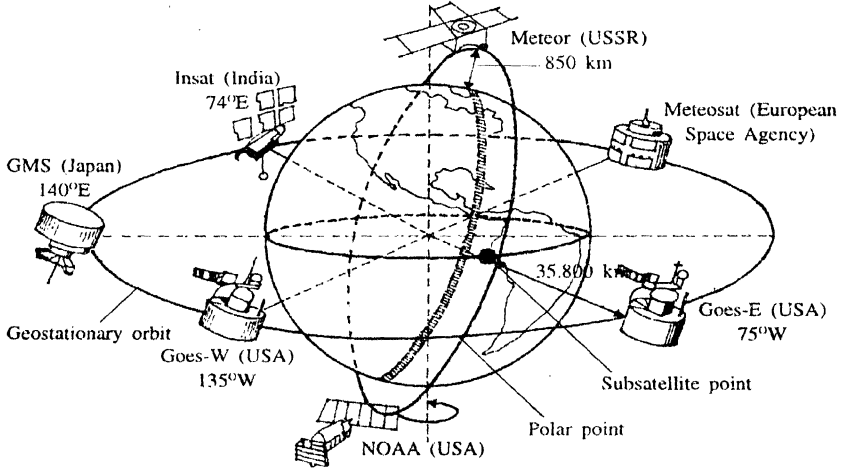
চিত্র ২. পোলার অরবিটার ও জিও-স্টেশনারি উপগ্রহের কক্ষপথে পর্যবেক্ষণ

মহাকাশে স্থাপিত দূর-সংবেদনশীল যন্ত্রাদি পৃথিবীর উপরিতলকে মূলতঃ দুই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ক'রে। (ক) মেরু কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহকে পোলার অরবিটার এবং (খ) পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থেকে তার কোন বিশেষ অঞ্চলের পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহকে জিও-স্টেশনারি উপগ্রহ বলে। এই দুই ধরণের কয়েকটি ভারতীয় উপগ্রহ আমাদের দেশকে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ ক'রে চ'লেছে।

প্রয়োগ

দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি পৃথিবী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করার এক নব দিগন্ত উন্মোচিত ক'রেছে। জাতীয় অগ্রগতির সম্ভাবনার মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রেছে। দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উন্নতিকল্পে সর্বাধিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা রচনা ক'রতে এবং আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলকে রক্ষা ক'রতে এই প্রক্রিয়া সাহায্য ক'রে চ'লেছে। মূলতঃ চারটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়।

১। পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ :— যেমন পরিবেশ পরিকল্পনা, পরিবেশ মনস্কতা, বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন দিক, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বিপর্যয় নির্বাহ (Disaster Management) ইত্যাদি।

২। প্রযুক্তি ও পরিসেবা মূলক ক্ষেত্রসমূহ : যেমন বাস্তুবিদ্যা, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, জলসরবরাহ, জল-নিষ্কাশন, পরিবহন, বর্জ্যপদার্থ নির্বাহ ইত্যাদি।

৩। প্রতিরক্ষা ও সামরিক ক্ষেত্রসমূহ।

৪। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার : আমরা জানি যে জীব-জগতের পরিমণ্ডলে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ক্রমশঃ হয় দুষ্প্রাপ্য বা ব্যবহারের অযোগ্য হ'য়ে উঠছে। আমাদের প্রয়োজনকে বিচার-বুদ্ধি সহযোগে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে। সমগ্র ক্রমহ্রাসমান ও পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদগুলিকে সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক সুবিধা আদায় ক'রে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ এই ক্ষেত্রে আমাদের এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি দান ক'রেছে। এই প্রযুক্তি প্রকৃতির সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ও নির্ভরতা সম্বন্ধে নানা বিস্ময়কর তথ্য সরবরাহ ক'রে চ'লেছে। এর সম্ভাবনাময় বিস্তারিত দিকগুলি হ'ল—

(ক) ভূ-তত্ত্ব : খনিজ সম্পদ-অঞ্চল নির্ধারণ, ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক পরিবর্তনের পূর্বাভাস, ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।

(খ) জলসেচ : জলসম্পদ পরিকল্পনা, মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ণয় প্রভৃতি।

(গ) অরণ্য সম্পদ : অঞ্চল চিহ্নিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বন-সৃজন প্রভৃতি।

(ঘ) কৃষিকাজ : অঞ্চল চিহ্নিতকরণ, ফলন পূর্বাভাস, ভূ-পৃষ্ঠের ব্যবহারিক পরিমাপ (Land-use survey) চারাগাছ ও আবাদি উদ্ভিদ সংরক্ষণ প্রভৃতি।

এখন চারাগাছ সংরক্ষণ ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। দেখা যাক— কেমন ক'রে দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ নীতিকে কাজে লাগিয়ে এই কাজ অতি দ্রুত ও সহজে করা যায়। চারাগাছের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হ'লে তার canopy'র তাপমাত্রা ও জ্যামিতিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে

এবং সঙ্গে-সঙ্গে এর রঞ্জক-পদার্থ সমূহের আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে বর্ণালী-পরিসর ও তার প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটে। দূর-সংবেদকে তা গৃহীত হয়। সেই তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রতিবন্ধকতা

আমার বক্তব্যের শেষে বলি প্রতিটি প্রযুক্তিরই যেমন একটি অন্ধকার দিক আছে তেমনি দূর-সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণও এর ব্যতিক্রম নয়। এই প্রযুক্তি শত্রুপক্ষ বা বিরোধী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার ক'রে মানুষ সম্পদ, ঘর-বাড়ী, এমনকি সভ্যতা ধ্বংস করার চেষ্টা চ'লছে।

এছাড়া, এই প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রচুর অর্থ-বিনিয়োগের প্রয়োজন। দরিদ্র এমনকি ধনী দেশের মানুষদের ওপর এই প্রযুক্তি এক বিশাল অর্থনৈতিক বোঝা স্বরূপ। অতএব, আমাদের অবশ্যই সুনিশ্চিত হ'তে হ'বে যেন এই প্রযুক্তি সর্বদা মানুষের কল্যাণে ও সেবার কাজে লাগে। যাতে ভবিষ্যতে আমরা এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে, পৃথিবী ও তার পরিবেশকে সকলের বাসযোগ্য ক'রে গ'ড়ে তুলে, সকলে মিলেমিশে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারি।

২০০২ সালে কোলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামে (BITM) অনুষ্ঠিত রাজ্য যুব বিজ্ঞান সেমিনারে দ্বিতীয় পুরস্কার বিজেতা।

আমাদের সাহিত্যের কাজের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে শ্রীনিকেতন
এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে
পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। অনুমান হিন্দী তাঁদের শেখানো নয় —
গোড়া থেকেই বিশ্বের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান — বিশেষত
ফলিত বিজ্ঞান। তাছাড়া নিজ আমাদের ইলেকট্রিসিটি ও
কল তৈরির কথা আছে, এই কল ঘরের কাজে ছেলেদের
হাত পাকাতে হবে। আমাদের ওখানে যে তাঁত-ঘর
আছে তাতেও আমার মতে ছেলেদের শিক্ষানবিশি করা
উচিত, এর দ্বারা মেয়েদের কাজ — শুধু শাড়ি বোনা নয়,
ও বস্তুতন্ত্র। কলের দ্বারা যত সব কিছুতে আমাদের
ছেলেদের হাত দুটো থাকে আড়ষ্ট, সবদিক থেকে নাড়াচাড়া
করে এইটে শেখানো চাই।...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

In our mission to transform India into a developed country, a crucial role will be played by the young generation of India. I am sure that your journal will ignite minds and satisfy their quest for knowledge.

(A.P.J. Abdul Kalam)